# শিক্ষা পরিদর্শন ও রূপায়ণ দর্পণ



আশিসবরণ সামন্ত

209 / Gift

পরম শ্রদ্ধেয়
ডঃ রবীন্দ্রনাথ দে
অধিকর্তা
এস. সি. ই. আর. টি
পশ্চিমবঙ্গ
মহাশয়কে

অভিজিৎবরণ সামন্ত
১৪/২/০৬
সহকারী প্রকল্প আধিকারিক
সর্ব শিক্ষা মিশন
বর্ধমান
৯৪৩৪৩৬২০৬০

বাড়ির ঠিকানা-
কৃষ্ণসায়র পল্লী
ইউ. সি. আই. লেন
আলমগঞ্জ
বর্ধমান
৩৬২১১-২৫৫৮৮৩

NO-. 111

# শিক্ষা পরিদর্শন ও রূপায়ণ দর্পণ

# শিক্ষা পরিদর্শন ও রূপায়ণ দর্পণ

আশিসবরণ সামন্ত



গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

SIKSHA PARIDARSHAN O RUPAYAN DARPAN

*A Collection of Essays on Education and Inspection*

By

Ashisbaran Samanta

First Published
Book Fair, 2006

ISBN : 81-7572-199-9

Price : Rs. 90/- only



প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, ২০০৬

দাম
৯০ টাকা

গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে এস. বি. নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

বিশিষ্ট সমাজসেবী

স্বর্গত ডা. প্রকৃষ্টচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের

পুণ্য স্মৃতি সামনে রেখে শিক্ষা আন্দোলনের প্রতিটি সংগ্রামী সাথি-কে

## লেখকের অন্যান্য বই

- শিশু-কিশোর পাঠ্য
  - গল্প কুসুম
  - মনীষীদের অমর কথা
- প্রবন্ধ
  - প্রবন্ধ প্রসূন
  - মাটি ও তার মানুষ
- ছোটোগল্প
  - জীবন সন্ধানে
- উপন্যাস
  - নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু
- গান
  - স্বরমালিকা — প্রথম খণ্ড
  - স্বরমালিকা — দ্বিতীয় খণ্ড
  - স্বরমালিকা — তৃতীয় খণ্ড
- সম্পাদিত গ্রন্থ
  - সমাজ সংস্কারক রামমোহন
  - ভয়ংকর সব ভূতের গল্প
  - শতাব্দীর সেরা হাসির গল্প

## লেখকের কথা

দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল 'শিক্ষা পরিদর্শন ও রূপায়ণ দর্পণ'-এর প্রারম্ভিক কথা লিখতে গিয়ে প্রথমেই আমার 'স্মরণ' কবিতা দিয়ে শুরু করি। 'তাঁকে প্রণাম করি/যিনি 'অ' অক্ষরটি চিনিয়েছিলেন/তাঁকে শ্রদ্ধা করি/যিনি প্রথম 'অ' অক্ষরটি লিখিয়েছিলেন/তাঁকে স্মরণ করি/যিনি হৃদয়ভরে 'মা' বলতে শিখিয়েছিলেন/তাঁকে হৃদয়ে রাখি/যিনি আলো দেখিয়েছিলেন।'

সবের মূলে শিক্ষা। শিক্ষাই চলার পথটিকে মসৃণ করে। কর্মজীবন শুরু করেছিলাম শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে। পরপর ছ'টি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে যখন শিক্ষার জন্যে কিছু করার স্বপ্ন আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল ঠিক তখনই হঠাৎ করে 'বিদ্যালয় পরিদর্শক' পদটিকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে ফেলেছি।

গ্রামের খুব সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মে দুঃখ, কস্ট ও দারিদ্র্য-কে সঙ্গী করে কেবলমাত্র নিজের উদ্যোগে বিদ্যালয় জীবন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন পার হয়ে মাথা উঁচু করে কর্মজীবনে প্রবেশ এবং এখনও সেই গতিকে সমানভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করে চলেছি মাত্র।

সমাজের কথা ভেবে, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাসচেতন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে তাকিয়ে, শিক্ষার্থী থেকে বিদ্যালয় পরিদর্শক, অভিভাবক থেকে গবেষক, আরও সহজ করে বললে 'শিশু থেকে শেষ বয়সি' প্রতিটি মানুষের চাহিদার দিকে তাকিয়েই এই গ্রন্থখানি। শিক্ষা বিষয়ে কে কী ভাবছেন, কে কী চাইছেন, কী আছে কী নেই, কীভাবে বর্তমান পরিকাঠামোতেই শিক্ষাকে সহজে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় গ্রন্থটির মাধ্যমে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয় পরিচালন কর্তৃপক্ষ, বিদ্যালয় পরিদর্শক, এমন কী গবেষক পর্যন্ত প্রত্যেকের মনের কথা বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ্রন্থখানিতে লিপিবদ্ধ করা খুবই জরুরি ভেবে করেছি।

প্রবন্ধগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই রাজ্য পর্যায়ের পত্রপত্রিকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিদ্যালয় পত্রিকাতেও ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা তাদের উপযোগী রচনাগুলি পড়ে অনেকখানি উপকৃত হয়েছে জেনে প্রেরণা পেয়েছি। শিক্ষক-অভিভাবক সমাজও রচনাগুলি পড়ে একসঙ্গে পাবার আশা প্রকাশ করেছেন। তাই, কোনো ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই গ্রন্থখানি রচনা করিনি, করেছি কেবলমাত্র সমাজ সেবার কথা ভেবে, নিজের দায়বদ্ধতার কথা উপলব্ধি করে।

যাঁদের প্রেরণা আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে তাঁদের পৃথকভাবে নামোল্লেখ না করে প্রত্যেককে জানাই যথাযোগ্য সম্মান। আরামবাগ গীতিনন্দন (গভঃ রেজিঃ নম্বর - এস

৯৪৯৪১) কর্তৃপক্ষ আমার সমস্ত রচনা প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। এই গ্রন্থটির দায়িত্বও তাঁরা নিয়েছেন এবং বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থই শিক্ষা, সংগীতচর্চা ও গবেষণার জন্য ব্যয় করবেন এজন্য তাঁদেরও বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ হরপ্রসাদ সমাদ্দার মহাশয় যেভাবে প্রেরণা দিয়েছেন তা তুলে ধরতেই হয়। তাঁরই প্রচেষ্টায় শিক্ষা আন্দোলনের প্রতিটি সাথি আমার গবেষণার বিষয় নিয়ে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও নেতাজি গবেষক অগ্রজতুল্য অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং আমার সহধর্মিণী সুষমার তাগিদ আমাকে গ্রন্থরচনার কাজ তড়িৎগতিতে সমাধা করতে বাধ্য করেছে।

গ্রন্থতীর্থ-র মাননীয় সন্দীপ নায়ক মহাশয়কে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁরও প্রেরণা আমাকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে এসেছে। গ্রন্থখানি আমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রাণপ্রতিম শিক্ষার্থী বন্ধুদের, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের, সাথি বিদ্যালয় পরিদর্শকবৃন্দের এককথায় সমস্ত স্তরের উৎসাহী পাঠকবৃন্দের সামান্যতম উপকারে লাগলে জানব আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। পাঠকবৃন্দের যে কোনো গঠনমূলক পরামর্শ আমার আগামীদিনের পাথেয় হবে।

বইমেলা, ২০০৬

অভিমন্যুবরণ সামন্ত

## প্রকাশকের নিবেদন

আশিসবরণ সামন্ত শুধু একজন সাহিত্যিক বা আকাশবাণীর গীতিকারই নন, দক্ষ প্রশাসক, একনিষ্ঠ বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং সর্বোপরি নিষ্ঠাবান শিক্ষা ও পরিদর্শন গবেষক। শিক্ষা ও পরিদর্শন বিষয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছেন তিনি। তাঁর গবেষণামূলক রচনাগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ওই প্রবন্ধগুলি একযোগে একটি গ্রন্থে প্রকাশের প্রস্তাব দিলে তিনি নিঃশর্তে এবং নিঃস্বার্থভাবেই শিক্ষার স্বার্থে তা প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন।

শিক্ষার্থী থেকে পরিদর্শক, শিক্ষক থেকে অভিভাবক, সাধারণ মানুষ থেকে গবেষক প্রত্যেকের হাতের কাছে রাখার মতো এই গ্রন্থখানি পাঠকপাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা ধন্য। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে জানাই হার্দিক অভিনন্দন।

বইমেলা, ২০০৬ প্রকাশক

# সূচিপত্র

# ক. শিক্ষা

## শিশু ও তার শৈশব

শিশুদের সামনে রেখে অনেকে অনেক কথাই বলি। উদাহরণ দিই ভবিষ্যৎ এরা। তাই, এদের গড়ে তুলতে যত্নবান হই। কিন্তু, এত সব কথার ফুলঝুরির মাঝে বিরাট একটা যে অন্তসারশূন্যতা থেকে যাচ্ছে আমরা তা খেয়াল করিনি। একটু থেমে সেটুকু খেয়াল করার মতো সময়-ই বা কই? থামলে তো পিছিয়ে যাব। না, থামার কোনো প্রশ্ন নেই। কোলে মোরগ লড়াই-এর মোরগ নিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে আলোর পরিবর্তে অন্ধকারের দিকে পা বাড়ানোর দিন। একথা কি কেউ একবারও আমরা ভেবে দেখেছি? না ভাববারও অবসর নেই।

শিশুদের বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের সরকার নির্দিষ্ট বয়স ছিল ছ'বছর পূর্ণ হওয়ার পর থেকে। আন্দোলনের পর আন্দোলন করে তাকে পাঁচ বছরে নামিয়ে আনা হয়েছে। এর পিছনে প্রাথমিক শিক্ষক সমাজই বেশি যুক্তি দেখিয়েছেন। কেননা, দাদা-দিদিদের সঙ্গে স্কুলের পথে পা বাড়ানো কচি কাঁচাদের যারা শিশু শ্রেণিতে আছে বলে এতদিন দেখানো হচ্ছিল তাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। এর পিছনে শিশুদের শেখানো অপেক্ষা যে যুক্তিটি অন্তরালে কাজ করছিল ছাত্রসংখ্যা বেশি দেখিয়ে আরও একজন বাড়তি শিক্ষক অনুমোদন করিয়ে নিয়ে কাজের ভার লাঘব করা। তাও সার্থক হল। কিন্তু, শিশুরা কী পেল? নাথিং, কিছু না। বরং তারা ওই পাঁচ বছর পূর্ণ হলে বা তারও আগে চার বছর ন-মাস বয়সেই প্রথম শ্রেণিতে পড়তে পড়তে বাধ্য হয়ে এক বছর শৈশবের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলল। যদি আমরা এই বয়সটিকেই আন্তরিকতার সঙ্গে নেব তাহলে এখনও কেন শিক্ষিত সমাজে তাদের শিশুটির বয়স সাত বছর হলে পাঁচ বছর বয়স ঘোষণা করে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি অনেকেই করতে আসছেন? যেহেতু, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির সময় পিতামাতার ঘোষিত বয়সকে শিশুদের প্রকৃত বয়স বলে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ এখনও প্রচলিত আছে। এ ছাড়াও পিছনের দরজা দিয়ে শিশুর দ্বিতীয় বার্থ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘোষিত বয়সকে মজবুত করা হচ্ছে।

এবার বাড়িতে শিশুরা কীভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে তা একবার ভেবে দেখা প্রয়োজন।

শিশুরা ওই বয়সে ব্ল্যাঙ্ক পেপার হিসেবে স্কুলে আসবে। তাদের মনে কোথাও কোনো কালির দাগ থাকবে না। অথচ, তার অনেক আগে থেকেই তাদের মনে আঁকিবুকি কেটে তাদের মনটাকে হিজিবিজি করে তোলা হচ্ছে। আরও স্পষ্ট করে বললে সেই শিশুকে একটু পাকাপোক্ত করে স্কুলে পাঠাতে গিয়ে তাকে আমরা ইঁচড়ে পাকা করে তুলছি। ওই চার বছর ন-মাস বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই তাকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিতে, বুঝিয়ে দিতে, অনেকের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে দিতে 'মোরগ লড়াই' এর মোরগ করে তুলি।

কথা ফুটলেই শিশুদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছি বই-খাতা-কলম। ধরিয়ে দিচ্ছি ছবি আঁকার জন্যে রং, তুলি, ক্যানভাস। হারমোনিয়ামের পর্দায় হাত কুলোয়নি। অথচ, গানের মাস্টার মশাই বা দিদিমণি নিয়োগ করে তালিম দিচ্ছি। মেয়েছেলে হলে তো কথাই নেই, পাঠিয়ে দিচ্ছি নাচের স্কুলে। আরও? হ্যাঁ, শেখাচ্ছি আবৃত্তি। আর সবার অজান্তে শেখাচ্ছি তুমি নিজেকে ছাড়া আর কাওকে জেনো না। তাই নয় কি? কেননা, আজকালকার প্রায় একটু শিক্ষিত চাকরিজীবী ছোট্ট পরিবারের কর্মকর্তারা যৌথ পরিবারের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে পায়রার খোপে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে শিখেছে। তাদের ওই শিশু ছেলেমেয়েদের 'কাকা' কাকে বলে জিজ্ঞেস করলে বলে-'কাক দাকে (ডাকে) কা-কা'। এর বেশি তারা আর কী বলবে?

আমরা এক গাদা অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রতিযোগিতায় ঠেলে দিচ্ছি আমাদের শিশুদের। তাদের শৈশব যে কী তারা জানতে পারছে না। তারা চিনছে না কাকাকাকিমা, জ্যেঠু-জেঠিমা, দাদু-ঠাকুমা-পিসিমণিদের। তারা সময় পাচ্ছে না মায়ের কাছে থাকার। তার পরিবর্তে চিনছে মাসি ( কাজের মেয়ে )-কে । কেননা, ওই মাসির কাছেই তাকে অনেকটা সময় কাটাতে হচ্ছে। মা যে বাড়ির বাইরে। চাকরি করেন, বাবাও তো। তাদের তো বাঁচতে হবে। বাঁচার জন্যে টাকা চাই পয়সা চাই। সবক্ষেত্রে আবার টাকা নয়। সময় কাটানো চাই। মায়েরা কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফেরার জন্য মত্ত। না-না ছেলের টানে নয়। মাসিকে সকাল করে ছেড়ে দিতে হবে। তাকে যে আংশিক সময়ের জন্যেই নিয়োগ করা হয়েছে। এবার বলুনতো সেই শিশুরা যদি এখন থেকেই স্বপ্ন দেখে যে তাদের বাবা-মা ওষধি (যে গাছ একবার ফল দান করেই মারা যায়) ছাড়া আর কিছু নয় তা হলে দোষ কী?

এই শিশুরা বড়ো হয়। অনেক কিছু শিখলেও তা তারা মানসিক বয়সের সঙ্গে সমতা না রেখেই শিখে ফেলে। ফল হয় অতিরিক্ত চাপ। ব্যাহত হয় প্রকৃত শিক্ষা। ব্যাহত হয়-প্রাণ খোলা হয়ে খেলাধুলা করা, স্বাধীনভাবে শৈশব উপভোগ করা। এরা বড়ো হয়, এরা লেখাপড়া শেখে, এরা চাকরিও করে। কিন্তু, অনেকেই মানুষ হয় না। যান্ত্রিক নিয়মে থেকে যন্ত্র হয়ে ওঠে। আগেকার দিনে শৈশব উপভোগ করতে গিয়ে অনেকেই মানুষ হতে পারত। এখন ঠিক তার বিপরীত। অনেকেই অমানুষ হয়ে ওঠে। কেউ কেউ মানুষ হয়। মানুষ মানেই তো আর উচ্চ-শিক্ষিত কিছু উচ্চ চাকরিজীবী নয়।

এত সব কুফল সত্ত্বেও অনেক শিক্ষিত মানুষ আলো থেকে অন্ধকারের পথে পা বাড়াচ্ছেন। ভাবছেন এইভাবেই বুঝি সমাজটাকে মানুষে মানুষে ছয়লাপ করে দেওয়া যাবে। কিন্তু না। যা ভাবছেন তা এত সহজ নয়।

এই মানসিকতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শিশুদের শৈশব ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক যোগ স্থাপনের সময় করে দিতে হবে। পরিবারের কিংবা সমাজের আর পাঁচজন সদস্যের সঙ্গে একাত্মতা গড়ে তোলার সময় ও সুযোগ করে দিতে হবে।

বর্তমানে এই মানব-যান্ত্রিক যুগে মা-বাবা হয়তো বা শিশুদের বেশি সময় দিতে পারেন না। তাই যারা ঠকে শিখে বুঝতে শিখেছেন বা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তারা শিশুর

শৈশবটা কাটানোর ভার কিছু কিছু শিশু সংগঠনের হাতে তুলে দিতে চান। যৌথভাবে আঁতুড় পুকুরে মাছের চারাপোনা বড়ো করার মতো বড়ো করতে থাকেন। তারা বয়সের সঙ্গে সমতা রেখে শিশুদের শৈশব ফিরিয়ে দিতে চান। এইখানেই শেষ নয়। শিশুদের মা-বাবার সান্নিধ্য এবং সেই সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য পাঁচজনের সান্নিধ্যও বড়ো সান্নিধ্য। এই ভাড়াটে পরিবেশে শিশুরা সেই অভাবটার আংশিক পুষিয়ে নিতে পারছে এইটাই এখন একমাত্র সান্ত্বনা।

আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। নিজে কী করছি তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। মন মুখ এক করা প্রয়োজন। মন মুখ এক করার কথা তো বহু আগেই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলে গেছেন। মুখে বলছি এক, বাস্তবে করছি অন্য। এটা কিন্তু কাম্য নয়। ওই রকম বলারও কোনো অর্থ থাকে না। এই প্রসঙ্গে নিজের একটা কথা বলার সুযোগ বা অধিকার এসে গেল। বলার মতো অধিকার আছে মনে করেই বলছি। আমি নিজে এখনও যৌথ পরিবারের সদস্য। আমি নিজে একজন চাকরিজীবী মহিলার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবন্ধ হতে পারতাম, কিন্তু হইনি। ঘৃণা করেও নয়, আবার টাকাপয়সা চাইনা বলেও নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেবলমাত্র একজন রুজি-রোজগার করুক-এই মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে শিশুর সঙ্গে তার মাবাবার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার তাগিদে। আবার, আমার ছেলেমেয়েদের শৈশব অতিবাহিত হয়েছে যৌথ পরিবারে। ভাবতে পারেন আমার বাবা এবং দুই কাকা যাঁদের বয়স ৭০-৮০ এর মধ্যে তাঁরা এখনও যৌথ পরিবারে বাস করেন। তাঁদের ছেলে-মেয়েরা, নাতি-নাতনিরা এখনও একই হাঁড়িতে রান্না করা ভাত খায় অর্থাৎ নির্ভেজাল যৌথ পরিবারের সদস্য। পারিবারিক দায়বদ্ধতার কথা আমরা কোনো ভাই বোনই ভুলিনি। এই পরিবারের সদস্যরা যথেষ্টই সমাজ-সচেতন, যথেষ্টই পারিবারিক। পরবর্তী জীবনে পড়াশোনাতে এবং কর্মজীবনে কেউই পিছিয়ে নেই।

সামাজিক পরিবেশ, পারিবারিক পরিবেশ এখন আর অনেক ক্ষেত্রেই অক্ষত নেই। নানান কারণ অবশ্যই আছে। তার মধ্যে প্রথম নম্বরে পড়ে রাজনীতি। দ্বিতীয় নম্বরে পড়ে একলাফে অত্যাধুনিক হয়ে ওঠার জন্যে প্রতিযোগিতা এবং অনুকরণপ্রিয়তা। সমানে এই অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা দূরদর্শনের পর্দার মাধ্যমে গাঁয়ে -গঞ্জে খুব সামান্য খরচেই পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। যাতে পশ্চিমী দুনিয়ার সভ্যতা যা সেই মাটির উপযোগী তাকে বলপ্রয়োগে ভারতবর্ষের মাটিতে এনে পুঁতে দিয়ে গাছ বাঁচানোর চেস্টা হচ্ছে। আমরা তো অন্ধভাবে অনুকরণ করতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছি। ভারতবর্ষের সুস্থ সংস্কৃতিকে বিনস্ট করছি। এর রূপকার কিন্তু তরুণ সমাজ। আমরা তরুণ সমাজের মনকে ওইদিকে ভিড়িয়ে দিয়ে আরও কিছুকাল বেঁচে থাকতে চাইছি। কেননা, ওরা ভোটার, আমাদের মধ্যে অনেকেই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র। তাই, ওদের বাধা দিলেই তো ওরা পথে বসাবে।

সবসময় আমাদের চারদিকে সমস্যা ছড়িয়ে আছে। মাছ যেমন জলে বাস করে, মানুষ যেমন বাতাসের সমুদ্রে বাস করে ঠিক তেমনি, বর্তমান যুগের মানুষ সমস্যার সমুদ্রে বাস করছে। এই হাজারো সমস্যার যুগে প্রকৃতই কিছু করা যায় কী না সে বিষয়ে আসুন, একটু ভেবে নিই।

# শাসন, সোহাগ ও শিক্ষাক্ষেত্র

সোহাগ এবং শাসন এই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুটি শব্দ পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মনে হয় যেন একটিকে বাদ দিলে অপরটির অস্তিত্ব থাকে না। অথচ, এই দুটি শব্দের অস্তিত্বই আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ভাবিয়ে তুলেছে। ঝড় তুলেছে শিক্ষিত সমাজে। শিক্ষার গতি নিয়ন্ত্রণে এই শব্দদুটির প্রভাব বিস্তার লক্ষণীয়।

সমাজে বিভিন্নক্ষেত্রে এই শব্দদুটির ব্যাপক প্রয়োগ এবং সার্থকতা আছে। সেই সব ক্ষেত্রে ওই শব্দদুটি নিজ নিজ জগতে যথার্থই সার্থক। কিন্তু, প্রশ্ন হল শিক্ষাক্ষেত্রে ? এইখানেই যত আলোচনা, ঝড়, বাধা-বিপত্তি। স্বাভাবিকভাবে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দার্শনিক, বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁদের বক্তব্যের পিছনে তাঁরা নানান যুক্তি দেখিয়ে আসছেন। কোনো যুক্তিই উপেক্ষনীয় নয়। তবুও তো আমাদের একটি লক্ষ্যে একটি স্থির বিন্দুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই হবে।

প্রাচীনকালে আশ্রমিক পরিকাঠামোয় গুরুগৃহে গুরুর ইচ্ছায়; শিক্ষার পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত হত। তখন শিক্ষার্থীরা ছিলেন সেই গুরুর আপনজন। তাঁরা ক্রমে ক্রমে গুরুর নিজ পরিবারভুক্ত সদস্যরূপে পরিগণিত হতেন। তাতে ছিল গুরু-শিষ্যর আত্মিক সম্পর্ক। এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে শিষ্যরা গুরুআজ্ঞা পালন করতে গিয়ে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করতেও বদ্ধপরিকর ছিলেন। কোনো প্রতিবাদ-এর কথা চিন্তাই করা যেত না বা গুরুবাক্য লঙ্ঘন করার কথা কখনোই কল্পনা করতে পারতেন না তাঁরা। তাই, 'শাসন'-এর এত আধুনিক এবং আক্ষরিক প্রয়োগও প্রয়োজন ছিল না। সবটাই যে সোহাগে হত তা ও নয়, হত ভক্তিতে, হত শ্রদ্ধায় এবং আজ্ঞা পালন করার ক্ষমতা অর্জনের মধ্য দিয়ে। এর সৃষ্টি কিন্তু, শিক্ষক তথা শিক্ষাগুরুর আপন ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের মাধ্যমে। এককথায় গুরু বা শিক্ষকের উদাহরণযোগ্য চরিত্র ও ব্যক্তিত্বই ছিল শিক্ষার্থী তথা শিষ্যের কাছে অনুকরণযোগ্য আদর্শ। পরে পরে সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ যতই এগিয়ে যেতে শুরু করল, যতই শিক্ষার পরিবেশের-পরিকাঠামোর পরিবর্তন হতে লাগলো ততই দেখা দিল যান্ত্রিকতা। সেই যান্ত্রিকতা বাসা বাঁধল শিক্ষার্থীর মনে। শিক্ষার গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন হল। শিক্ষার্থী হারাতে শুরু করল বিশ্বাস ও ভক্তি। গুরু তথা শিক্ষকেরাও পারলেন না শিক্ষার্থীদের সেই আনুগত্য ধরে রাখতে। কেননা, জীবনযাপনের প্রয়োজনে এবং চাহিদা মেটাতে তাঁরা যতই যান্ত্রিক হতে শুরু করলেন, আদর্শ হতে বিচ্যুত হলেন ততই শিক্ষার্থী শিক্ষকের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে শুরু করল। এল অনিয়ম, এল উচ্ছৃঙ্খলতা। চারদিকেই শুরু হল অনাস্থার ঝড়। ফল হল হতাশা। এই পরিবেশেই শিক্ষক তাঁর আধিপত্য বজায় রাখতে শুরু করলেন—শাসন। ফল পাওয়া গেল যৎসামান্য এবং তাৎক্ষণিক। তারপর তাও

একসময় সেই 'ক্রমহ্রাসমান' উৎপন্ন বিধির আওতায় পড়ে শূন্যের দিকে এগিয়ে গেল। তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে শাসনের প্রয়োজন হল কখন? যখন একজন শিক্ষক তাঁর নিজের পথ থেকে বিচ্যুত হলেন। শিক্ষার্থীর অপরাধ কোথায়? বাস্তবে তো অনেক সময় আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই—একজন আদর্শ এবং জাতশিক্ষকের কাছে একজন শিক্ষার্থী সদা বিনম্র এবং অনুগতপ্রাণ। তিনি শাসন এবং সোহাগ কোনোটারই প্রয়োজন অনুভব করেন না। নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে, চরিত্র দিয়ে এবং সর্বোপরি অনুকরণযোগ্য ব্যবহার দিয়ে আকৃষ্ট করতে পারেন শিক্ষার্থী সমাজকে। এর হাজারো উদাহরণ আছে।

পরিবেশগত পরিকাঠামোকে তো আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারাও বেশ কষ্টকর। তাই, যখনই একজন শিক্ষক আদর্শচ্যুত হলেন তখনই শিক্ষার্থীর আস্থা হারিয়ে গেল। সেই আস্থা অর্জনের জন্য প্রয়োজন হল সোহাগ। তারপর সেই সোহাগেও যখন বাগ মানানো গেল না তখন শাসন। এবার গুরুত্ব কেবল সেই বহু পরিচিত বাক্যটির 'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে।' আলোচনায় দেখা যাচ্ছে শাসন এবং সোহাগ কোনোটাই শিক্ষাক্ষেত্রে কাম্য নয়। কাম্য হল শিক্ষকের উজ্জ্বল চরিত্র, মহান ব্যক্তিত্ব, অনুকরণযোগ্য ব্যবহার। যার রূপকার একজন চরিত্রবান জাতশিক্ষক নিজেই। আদর্শভ্রষ্ট হওয়া থেকে সচেতন থেকে প্রকৃত শিক্ষাদানে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেকে প্রকৃত শিক্ষক করে তুলতে পারলে প্রকৃত ছাত্রের অভাব হবে না। অত্যন্ত দুরন্ত ছাত্রও তখন বাধ্য সন্তানের ভূমিকা পালন করবে।

এটাই হওয়া উচিত এবং স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে অনেক শিক্ষকই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকতা থেকে দূরে সরে গেছেন। তাঁরা অনেকেই 'চাকরি' করছেন শিক্ষকতা নয়। তাই, চাকরি করতে এসে 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' পাব একথা কল্পনা করাটাই অপরাধের বিষয়। পাবার মতো না পেলেই শিক্ষার্থী সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয়। তখনই সেই অবাধ্য শিক্ষার্থীদের বলপূর্বক বাধ্য করতে প্রয়োজন হয় শাসন। আসলে আমরা 'উৎস' সম্বন্ধে সচেতন না থেকে শিক্ষার্থীর বিপথগামিতার কারণ না খুঁজে হতাশার দিকে যাচ্ছি। প্রয়োজন অনুভব করছি শাসনের।

সমাজ যে পথে চলছে তাতে রাতারাতি পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব। প্রয়োজন দীর্ঘ অনুশীলনের। তাই, বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে আদর্শ শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা অর্জনে অবিচল থাকতে হবে। যতদিন পর্যন্ত না নিজেকে সেইভাবে তৈরি করে নিতে পারা যাবে ততদিন পর্যন্ত শাসন এবং সোহাগ অর্থাৎ তিরস্কার এবং পুরস্কার-এর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে। এইভাবে চলতে শুরু করলে এমন একদিন আসবে যেদিন আদর্শ শিক্ষকের পাল্লা ভারী হবে, হাল্কা হবে শাসন এবং সোহাগের পাল্লা। ধীরে ধীরে একসময় আদর্শ শিক্ষকই জয়ী হবেন।

তাই, বাস্তবে কোনো কোনো সময়ে শাসনের প্রয়োজন হতেই পারে। এক্ষেত্রে শাসনকে উপেক্ষা করলে চলবে না। ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজন আছে। তবে, দেখতে হবে তা যেন এমন পর্যায়ে না পৌঁছয় যেখান থেকে সামাজিক পরিকাঠামোয় ধস নামতে পারে।

শিক্ষকের ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়ে যখন প্রকৃতপক্ষে একজন অবাধ্য শিক্ষার্থীকে বশে আনতে শাসনের প্রয়োজন দেখা দেবে তখন মনে রাখতে হবে নিরুপায় হয়েই এর প্রয়োজন স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে তাতে যেন বিপরীত ফল না হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে যেন এই প্রক্রিয়া না চলে। অভিভাবকদেরও একথা মেনে নিতে হবে এবং অনুরূপ অবস্থায় শিক্ষক সম্প্রদায়ের ওপর আস্থা রাখতেই হবে।

ব্যক্তিগত প্রয়োগ কৌশল থেকে সামান্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এই বিষয়টিকে আমি ব্যক্তিগত জীবনে গবেষণার বিষয়রূপে চিহ্নিত করে পর পর ছ'টি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছি। কোনোদিনের জন্য কোনোও শিক্ষার্থীকে বেত্রাঘাত না করেও আশাতীত ভালো ফল পেয়েছি। গর্বের সঙ্গো বলতে পারি একজন শিক্ষার্থীকেও আমার বিষয়ে নিরাশ হতে দেখিনি।

এদিকে, পুরস্কৃত করতে গিয়ে, সোহাগ বা আদর করতে গিয়ে আরও চিন্তা করা প্রয়োজন যে, কোনো শিক্ষার্থী অতিরিক্ত আদরেরমাধ্যমে যেন বাঁদরে পরিণত না হয়। হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই, দুটিকেই এড়িয়ে চলতে হবে। উদাহরণ খাড়া করতে হবে নিজের উদাহরণযোগ্য চরিত্রকে, আদর্শকে।

আলোচনাকে আরও ব্যাপকতার দিকে নিয়ে গিয়ে বলা যায়—বর্তমান প্রেক্ষাপটে একজন শিক্ষার্থী বিদ্যালয় পরিবেশের চেয়ে গৃহ পরিবেশে থাকে কমবেশি তিন চতুর্থাংশ সময়। মাত্র এক চতুর্থাংশ সময় বিদ্যালয় পরিবেশে থাকে। তাই শাস্তিপ্রদান বা শাসন সোহাগের বিষয়টি শিক্ষক-শিক্ষিকার ওপর ছেড়ে দিয়ে তাঁদের দোষারোপ করলেই চলবে না। একজন অভিভাবকের দায়-দায়িত্বও কম নয়। অভিভাবক সচেতন না হলে সব বিফলে যাবে। অভিভাবক সচেতন না হলে শিক্ষার্থীকে সামান্যতম শাসনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে শিক্ষক সম্প্রদায় অসহায় বোধ করবেন। তাই, শিক্ষার পরিবেশকে কলুষমুক্ত করে অভিভাবক সচেতনতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলে এবং শিক্ষক সমাজ কায়মনোবাক্যে 'শিক্ষকতা' করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে শিক্ষাক্ষেত্রে শাসন-সোহাগ বা তিরস্কার-পুরস্কার কোনোটারই প্রয়োজন হবে না। যদিও কাজটা বাস্তবে পরিণত করা খুবই কঠিন কিন্তু মোটেই অবাস্তব বা অসম্ভব নয়। বরং এটাই সত্য এবং পরীক্ষিত।

## লেখাপড়ার কিছু সোপান

ছোটোদের দেখলেই বড়োদের মন অপত্যস্নেহে নয়তো বা জৈবিক টানে আশীর্বাদ করার জন্যে আনচান করতে থাকে। প্রায় সকলেই বলে-ভালো করে লেখাপড়া শিখে ভালো চাকরি বাকরি করো। কিন্তু, লক্ষণীয় যা তা হল-লেখাপড়া শেখা কি তাহলে কেবলমাত্র চাকরি পাবার জন্যেই ? চাকরি না পেলে কি লেখাপড়া শেখার কোনা মূল্যই থাকে না ? সবাই নানান ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চাকরি পাবার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আশীর্বাদ করে। কিন্তু কজন আর 'মানুষ' হওয়ার স্বপ্ন দেখে বা 'মানুষ' হবার পরামর্শ দিয়ে আশীর্বাদ করে ? প্রকৃত মানুষ হতে গেলে লেখাপড়ার যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনি প্রয়োজন মানসিকতার, স্বচ্ছন্দ পরিবেশের এবং উদার মনোভাবাপন্ন মানুষের। নানান দিক থেকে লেখাপড়ারই প্রাসঙ্গিকতা এসে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সঠিক পথ দেখানোর চিন্তাভাবনা অনেকেই করেন না। যাঁরা করেন, তাঁদের চিন্তাভাবনাতেও স্বচ্ছতার অনেকখানি অভাব। প্রসঙ্গান্তরে না গিয়ে এখন কীভাবে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করবে এবং বড়োরা পরামর্শ দেবেন বা নজর রাখবেন তা দেখা যাক।

প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আসে বিভিন্ন পরিবেশ থেকে, বিভিন্ন মানসিকতার পরিবার থেকে। যে যেখান থেকেই আসুক না কেন সবার লক্ষ্য যদি লেখাপড়া শেখাই হয় তাহলে সকলের জন্য কীভাবে একটি গ্রহণযোগ্য ও অনুসরণযোগ্য ব্যবস্থাপত্র দেওয়া যায় তা খুঁজে বের করতে হবে। কোনো শিক্ষার্থীর পারিবারিক আয় দারিদ্র্যসীমার অনেক অনেক নীচে, কারও বা দারিদ্র্যসীমায়, কারও মাঝারি এবং কারও বা অনেক বেশি। সবাই কিন্তু বিদ্যালয়ে এসে এক পরিবারভুক্ত। পাশাপাশি বসে। একই সঙ্গে পাঠগ্রহণ করে। এখানে তারা এক এবং অভিন্ন। তাই এক অভিন্নগোষ্ঠীর জন্য এক অভিন্ন ব্যবস্থাপত্রের খোঁজ করতেই হবে।

(১) প্রথমেই একজন শিক্ষার্থীর প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(২) যে বইগুলি নিয়ে তার প্রতিদিনের পথ চলা তার যত্ন করার অভ্যাস করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি বই-খাতা যাতে ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায় তার জন্য অবশ্যই মলাট দিতে হবে।

(৩) বই-এর তালিকা অনুসারে বইপত্রগুলি সংগ্রহ করে নিজে নিজে পড়ার অভ্যাস করতে হবে। মনে রাখতে হবে লেখাপড়ার জগতে প্রথম এবং প্রধান শক্তি একজন শিক্ষার্থী নিজে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সাহায্যকারী মাত্র।

(৪) যেহেতু পড়ার উদ্যোগ নিজের সেহেতু শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্য গ্রহণের আগে কেবলমাত্র নিজের উদ্যোগে প্রতিদিনের পড়া পড়ে নিতে হবে। মোটামুটি একটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণা থাকলে শ্রেণিকক্ষে বুঝে নিতে সুবিধা হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা যখন শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করবেন তখন বুঝতে না পারলে সবিনয়ে প্রশ্ন করে জেনে নেবার অভ্যাস অবশ্যই

গড়তে হবে। এতেও যদি কিছু দুর্বোধ্য থেকে যায় তা বাড়িতে গিয়ে বারবার অভ্যাস করতে হবে। তখনও না হলে বাড়ির বড়োদের যদি সাহায্য করার ক্ষমতা থাকে সেখানে বুঝে নিতে হবে। বাড়িতে বুঝে নেবার সুযোগ না থাকলে তখন প্রাইভেট টিউটরের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তবে, কখনই তার পাঠ যেন প্রাইভেট টিউটর নির্ভর না হয় তা দেখতে হবে। বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের পাঠ শিক্ষার্থীকে আয়ত্ত করিয়ে দেওয়াই একজন প্রাইভেট টিউটরের কাজ। বিদ্যালয়ের সমান্তরাল একটি বিদ্যালয় তৈরি করে নিজেদের মতো পাঠদান কোনোমতেই কাম্য নয়। মনে রাখতে হবে শিক্ষাজগতে শিক্ষার্থী প্রথম শক্তি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বিতীয় শক্তি এবং বাড়ির গুরুজনেরা অথবা প্রাইভেট টিউটররা তৃতীয় শক্তি।

(৫) প্রাইভেট টিউশন একটি বির্তকিত প্রশ্ন। এই প্রাইভেট টিউশন রবীন্দ্রনাথের সময় ছিল, রবীন্দ্রোত্তর যুগেও ছিল, এখনও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে। কেননা, একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেশি জানার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। প্রতিদিনকার বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে প্রদত্ত পাঠদানকে শিক্ষার্থীর বোধগম্য করিয়ে দেওয়ার পর বেশি শেখাতে বা শিখতে কারও আপত্তি করার কথা নয়।

(৬) বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের পাঠ বাড়িতে প্রতিদিন অভ্যাস করতে হবে। কোনো প্রাইভেট টিউশনে পাঠ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না, অপরদিকে পিছিয়ে থাকাও চলবে না। সবার আগে মনে রাখতে হবে সব শিক্ষার্থীই অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন নয়। তাই, মনে রাখতে হবে বিদ্যালয় শিক্ষকের পাঠদান, শিক্ষার্থীর অনুশীলন এবং গৃহ-শিক্ষকের সহযোগিতা যেন সবসময় একই বিন্দুতে অবস্থান করে। তা না হলে মাঝারি মাপের এবং অতি সাধারণ শিক্ষার্থীর ভীষণ ক্ষতি হবে এবং বাস্তবে তা ভীষণভাবে হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে এবং সেই সঙ্গে বাড়ির বড়োদের দায়িত্বই হল শিক্ষার্থীদের সজাগ করে দেওয়া।

আরও মনে রাখতে হবে, প্রাইভেট টিউশন কখনই বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিকল্প হবে না, হবে পরিপূরক।

(৭) প্রতিটি বিষয়ের জন্য এক একজন শিক্ষার্থীকে পৃথক পৃথক খাতা করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক কাজের জন্য একটি রাফ খাতা থাকবে। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে নিয়মিত বিদ্যালয় থেকে দেওয়া লিখিত হোম-টাস্ক করতেই হবে। বর্তমানে শিক্ষার্থীরা এমন একটি জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে তারা পড়ে কম এবং লিখে আদৌ না। যেভাবে লেখাপড়া শব্দটির জন্ম হয়েছে তা একটু ভেবে দেখা দরকার। লেখা এবং পড়া দুটি পদের অর্থই সমান গুরুত্ব সহকারে প্রতীয়মান হয়ে 'লেখা ও পড়া' এইরূপ ব্যাসবাক্য করে দ্বন্দ্ব সমাস করা হয়েছে। দুটি শব্দেরই এখানে সমান প্রাধান্য। তাই লিখতেও হবে পড়তেও হবে। বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা মাত্রাতিরিক্ত শিক্ষার্থীর জন্য প্রত্যেকের খাতা দেখার সময়ের স্বল্পতা এবং অকারণ এক ঝামেলা ভেবে এই ঝামেলা এড়াতে লিখিত হোম-টাস্ক দেওয়া বন্ধ করেই দিয়েছেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরই বেশি সজাগ থাকতে হবে। তারাই এগিয়ে এসে বলবে—স্যার বা ম্যাডাম, পড়া তৈরি করতে দিলেন কিন্তু বাড়িতে কী লিখব? তখন শিক্ষক-শিক্ষিকারা কিছু না হলেও সেদিনের পড়াটিই ভালো করে লিখে আনতে বলবেন।

পরের দিন প্রত্যেকে লিখিত হোম-টাস্ক করে এনেছে কি না তা দেখবেন এবং সাধ্যমতো খাতাগুলি দেখে সংশোধন করে দেবেন।

(৮) অনেক শিক্ষার্থীকে বাড়িতে এমন কি আর্থিক দুরবস্থার জন্য অন্যের বাড়িতে কাজ করে বা বাবা-মাকে সাহায্য করে, রুজি-রোজগারের ধান্দা করে, তারপর লেখাপড়া করতে হয়। আবার অনেকে অবসর সময় বা বাড়তি সময় ঘুমিয়ে কাটায়, মনে রাখতে হবে একজন সুস্থ মানুষের ছ'ঘন্টার বেশি ঘুমের প্রয়োজন হয় না। তাই, যারা বেশি সময় ঘুমায় তাদের ওই সময় থেকে আরও পড়ার সময় বের করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে—পড়া তৈরির উপযুক্ত সময় হল—ভোরবেলা। সংগীতচর্চা আমাদের দেশে সুপ্রাচীন কাল থেকেই আছে। সংগীত শিক্ষকরা ভোরবেলা উঠে রেওয়াজ করতে বলেন। সারারাত বিশ্রামের পর মানসিক প্রফুল্লতা ও শান্তি পড়াশোনার অনেক সহায়ক হবে। শিক্ষার্থীরা ভোরবেলা প্রতিদিন উঠে ৪-টে থেকে ৬-টা পর্যন্ত ২ ঘন্টা করে পড়লে অনেক বেশি লাভবান হবে। বাড়ির কাজের পাশাপাশি লেখাপড়ার এই অভ্যাস একজন শিক্ষার্থীকে আরও বড়ো হতে সাহায্য করবে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিদিন ভোরবেলা উঠে পড়াশোনা তৈরি করতেন। তখন এলার্ম দেওয়া ঘড়ির এত প্রচলন ছিল না। এজন্য তিনি পায়ে দড়ি বেঁধে জানলায় বেঁধে রাখতেন। পায়ে টান পড়লেই ঘুম ভেঙে যেত এবং উঠে তিনি লেখাপড়া করতেন। এখন এলার্ম দেওয়া নানান উন্নত প্রযুক্তির ঘড়ি অনেকের সহায়ক হবে। গ্রাম্য এলাকার অনেক দুস্থ পরিবারের পড়ুয়াদের মুরগির ডাক শুনে জেগে গিয়ে লেখাপড়া করতে দেখা যায়। তাছাড়া গ্রাম-শহরে সাধারণ-অসাধারণ প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই খাবার পর বেশি করে জল খেয়ে নিলে ভোরবেলা প্রাকৃতিক কারণেই ঘুম ভেঙে যাবে। তখন মুখহাত ধুয়ে পড়তে শুরু করলে অভাবনীয় ফল পাওয়া যাবে।

(৯) প্রতি কাজের একটি লক্ষ্য থাকে। বল খেলার মাঠে খেলাই হত না যদি লক্ষ্য হিসাবে গোল-পোস্ট না থাকতো। গোল-এ বলটি পৌঁছে দেওয়াই খেলোয়াড়দের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য আছে বলেই বলখেলা সার্থক। লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও সেই লক্ষ্য থাকা অবশ্যক। খুব সহজেই সেই লক্ষ্যে যাওয়া যায়। এরজন্য কোনো অতিরিক্ত পরিশ্রম বা ঝুঁকি নিতে হয় না। অলক্ষ্যে একটা মানসিক শক্তির জন্ম হবে এবং সেই শক্তি তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তখন কোনো পরিশ্রমই পরিশ্রম বলে মনে হয় না। একজন শিক্ষার্থীর এক্ষেত্রে করণীয় হল—বিগত পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে যে নম্বর পেয়েছে তা একটি কাগজে লিখে রেখে এবং আগামী পরীক্ষায় কত নম্বর তাকে পেতে হবে যা কোনোক্রমেই পাসমার্কের নীচে হবে না এবং বর্তমান প্রাপ্ত নম্বর এর থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশি হবে। এই সম্ভাব্য প্রাপ্ত নম্বর ডানদিকে লিখে রেখে প্রতিদিন একবার করে দেখে মনে মনে ঐ স্থানে যাবার চিন্তা যদি কেউ করে তাহলে সে অবশ্যই কম বেশি নম্বর পেয়ে এগিয়ে যাবে। এই মানসিক শক্তি জোগানো পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের প্রায় ১০০ শতাংশকেই সফল হতে দেখা গেছে।

জীবনে সফল হবার লক্ষ্যে একইসঙ্গে সমানভাবে এই বিষয়গুলিতে যত্নশীল হলে শিক্ষার্থীরা যে সফল হবেই হবে একথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। ছোটোরা যেমন অভ্যাস করবে বড়োরা সেইরকম অনুপ্রাণিত করবে। শিক্ষার হারিয়ে যাওয়া গতি ফিরবেই ফিরবে।

## সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ঃ ঠিক এই মুহূর্তে

সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় বাংলার ইতিহাস সুবিদিত। বিশ্বের দরবারে প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার উজ্জ্বলতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এখনও সেই চর্চা যে নেই তা নয়। তবে, তার যে নিজস্বতা তা যেন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সংস্কৃতির ছাপ পড়তে পড়তে বাংলা তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলছে। আমরা অপরের ভালো অবশ্যই গ্রহণ করব, তবে নিজের সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। দেশের বিভিন্ন সংঘ, সংগঠন সুস্থ সংস্কৃতিকে এখনও বুক দিয়ে আগলে রেখেছে। নিয়মিত চর্চা চালিয়ে যাওয়ার জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে আছে। কী নেই বাংলার! প্রাচীন লোকসংস্কৃতির সঙ্গে রবীন্দ্র-নজরুল চেতনা বাংলায় সুস্থ সংস্কৃতির জোয়ার এনেছে। অনেক বেশি পুষ্ট করেছে। এখন এই চিন্তাচেতনা ও সংস্কৃতিকে বিভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। আরও বেশি অনুশীলন করার সুযোগ করে দিতে হবে। আমরা সহজেই বিদ্যালয়গুলির ওপর অনেকটা নির্ভর করতে পারি, আশা করতে পারি একটা শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব যেমন আমাদের সবারই, ঠিক তেমনি সেই শিশুকে ধরে রাখার দায়িত্বের কথাও আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না। বিদ্যালয়ে ধরে রাখার বিভিন্ন কৃৎকৌশলের মধ্যে সাংকৃতিক অনুষ্ঠান অনেকটাই প্রাণজয়ী। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তর থেকে সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ করে দিতে পারলেই ফল অনেক সুদুরপ্রসারী হবে এবং দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে। আমরা প্রায়ই বলতে শুনি যে, টেলিভিশন ভিডিও প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমগুলো দেশের অগণিত ছেলে-মেয়ের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে। অস্বীকার করার উপায় নেই। ওই, শিশু কিশোর-কিশোরীরা সংস্কৃতি জগতের তথা সমাজের বাইরে নয়। ওরা বিনোদনের জন্যে কিছু চায়। তাই সামনে যা পায় তা-ই গোগ্রাসে গিলতে থাকে। ওরা টিভির কোনো একটি দৃশ্যকে অবিকলভাবে অনুকরণ করতে পারে। ওরা টিভি বা ভিডিও থেকে দেখা কোনো হিন্দি বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনস্বীকার্য চটুল দৃশ্যটি মুহূর্তেই উদরস্থ করে নিতে পাবে। পরক্ষণেই আবার তার সম্পূর্ণটাই মুখে এনে জাবর কাটতে শুরু করে। ওই শিশুরা সামনে যা পায় তাকেই ভালোভাবে গ্রহণ করে। ওদের ভালোমন্দ বিচারবোধ কোথায়? আর বড়োরা এর জন্যে দায়ী নই? আমরা ওদের সামনে কি বিকল্প কিছু তুলে ধরতে পেরেছি? আমরা যদি ওদের সুস্থ সংস্কৃতির চর্চায় মাতিয়ে রাখতে পারতাম অথবা ওদের বেশিমাত্রায় অংশগ্রহণ করার সুযোগে ডুবিয়ে রাখতে পারতাম তাহলে ওরা অপসংস্কৃতির পথে পা বাড়ানোর সময় ও সুযোগ কোথায় পেত? ওরা ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং ভালোমন্দ বিচার করতে শিখে দেশিয় কৃষ্টি কালচারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের অনুশীলনের কাজে ডুবিয়ে রাখতে পারত।

বিদ্যালয়গুলিতে এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিধি আরও বৃদ্ধি করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ বা সরকারের শিক্ষা বিভাগ আইন প্রণয়ন করল বা না করল তা দেখার প্রয়োজন নেই। শিক্ষার্থীর সঠিক উন্নয়নের দায়িত্ব একটি বিদ্যালয়ের বা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। তাই, সেই শিশুটির সঠিক উন্নতির কথা চিন্তা করে আমাদের একটু বেশি দায়িত্ব নিতে, সচেতন হতে এবং প্রয়োজনে ঝুঁকি নিতে বাধা কোথায়? সমাজের মঙ্গলকর কাজের পিছনে মানুষ চিরদিন আছে এবং থাকবেও।

বিদ্যালয়গুলিকে প্রধান আশ্রয়স্থলরূপে চিহ্নিত করে সংস্কৃতি চর্চার পরিধি আরও বৃদ্ধি করতে হবে, আরও ব্যাপক এবং সুদৃঢ় করতে হবে। শিশুমনে একবার সুস্থ সংস্কৃতির ধারণাটি গেঁথে দিতে পারলে তা এমন ব্যাপকতা লাভ করবে যে সে কোনোদিনই বিকল্প চিন্তা করার সুযোগ পাবে না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বিশেষ করে বর্তমানে ব্যক্তিগত জীবনে চাকরি-বাকরির মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার প্রয়োজন অনেক বেশি। প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই এই বিষয়ের ওপর সংগৃহীত নম্বর একজনের স্থানকে মুহূর্তে এগিয়ে দিতে পারে। কেননা, একশো নম্বরের বিষয়মুখী পরীক্ষা হলে পাঁচ নম্বর এই সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে সংগ্রহ করার অবকাশ আমাদের অনেখখানি আশার বাণী শোনাতে পারে। তাই, এই সংস্কৃতিচর্চার প্রসারে আমরা যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গো জড়িত তারা নিজেদের দায়দায়িত্ব কর্তব্যবোধ অস্বীকার করতে পারি না। আমরা চেস্টা করে আর কিছু নাইবা পেলাম মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি অবশ্যই পাব।

বিদ্যালয়গুলিতে পঠন পাঠনের পাশাপাশি নিয়মিত সংস্কৃতি চর্চা করানো যেতে পারে। কর্মশিক্ষা বিষয়ের অন্তর্গত 'বিদ্যালয় কৃত্যালি' বা 'স্কুল পারফরমেন্স' তো আছেই। এই বিষয়টিকে আরও গ্রহণযোগ্য, আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য করে তুলতে আমরা রুটিন মাফিক এগিয়ে যেতে পারি। সংস্কৃতি চর্চার মানে এই নয় যে সবাইকে নাচ, গান করতে হবে। আবৃত্তিও করা যায়। তাছাড়া, নাট্যাভিনয়, মূকাভিনয়, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা, হরবোলা, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজানো প্রভৃতি বিষয়গুলির মধ্যে কোনো না কোনো একটিতে কিশোর-কিশোরী বা শিশু তার প্রতিভার ছাপ রাখতেই পারে। লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে গল্প, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, নাটিকা প্রভৃতির কোনো না কোনো একটির দিকে তার প্রতিভাকে ঘুরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ছবি আঁকার অভ্যাস গড়ে তোলাও একটি কাজ। আর কেউ কিছু না পারুক তার নিজের হাতের লেখাটিতো সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। এও কিন্তু সংস্কৃতিচর্চার অঙ্গ। এইগুলির কিছুই যে পারল না সে কিন্তু সাধারণ শিশু নয়। তার সম্পর্কে আরও সূক্ষ্ম চিন্তা করার অবকাশ এসে যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এসব কী করে সম্ভব? একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তো একজন, দু'জন বা তিনজন শিক্ষক থাকেন আর থাকলেই বা পাঁচ সাতজন দশজন শিক্ষক, তাঁদের পক্ষে তো এককভাবে বা যৌথভাবেও কেউই এতগুলি বিষয়ে পারদর্শী নন। তাঁরা হয়তো বলবেন—এত করতে পারলে তো রবীন্দ্রনাথ হয়ে যেতাম। প্রশ্নটা এখানে নয়। আসল প্রশ্ন

হচ্ছে—মানসিকতা। উৎসাহ দেবার অধিকার এবং যোগ্যতা সকলেরই আছে। কিন্তু, মানসিকতা আছে হাতে গোনা দু'একজনের। নিয়মিত উৎসাহ দিলে এবং নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হবে এবং অভিভাবকরাও একটু চিন্তা করতে শিখবেন। দেখা যাবে একজন শিক্ষকমশাই-এর পাশে তাঁর হাজার বন্ধু উপস্থিত হয়ে তাঁর হাত শক্ত করেছেন।

এভাবে মাসে মাসে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করিয়ে এদের উৎসাহিত করা যায়। দেখা যাবে প্রাথমিক স্তরের খুদে পড়ুয়াদের মধ্যে উৎসাহের এবং উদ্দীপনার জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক সংগঠনগুলিরও দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। আবার এদের প্রত্যেকের পাশে বন্ধু হিসেবে থাকা শিক্ষাবিভাগের তৃণমূল স্তরের প্রতিনিধি একজন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বা এস. আই. অফ স্কুলসও তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। শিক্ষক সংগঠনগুলি যে কেবলমাত্র তাঁদের পাওনা-গণ্ডা সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া নিয়েই আন্দোলন করবে এমন চুক্তিপত্র কোথাও নেই। তাঁদের আন্দোলনকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করে তোলা প্রয়োজন। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে নেই তা নয়। তবে, আরও বেশি সময় ও গুরুত্ব দিতে হবে। জেলায় জেলায় পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতির উদ্যোগও সুস্থ সংস্কৃতির চর্চাকে বহুগুণ এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে।

শিক্ষক সংগঠনগুলির সহযোগিতা নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগী হিসেবে পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতির প্রেরণায় ১৯৮৪ সালে হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া থানায় যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রপাত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে করে পশ্চিমবাংলার বুকে একটা নজির স্থাপন করতে পেরেছিলাম আজও তার সুযোগ মানুষকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে। প্রাথমিক স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ধাঁচে এই সংস্কৃতিচর্চা পরবর্তীকালে শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এবার আসা যাক মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের কাছে। ওই খুদে শিক্ষার্থীরা এবার অনেকখানি পরিণত হতে পেরেছে। এখানে কর্মশিক্ষা পাঠ্যতালিকাভুক্ত হিসেবে থাকায় সহজেই সাংস্কৃতিক চর্চাকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এখানে বহুমুখী প্রতিভার বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকায় এই প্রচেস্টা আরও কার্যকর হয়।

প্রতিমাসে একটি শনিবার ছুটির পর রুটিনমাফিক এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এক এক মাসে বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা এবং কোনো কোনো মাসে নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, হরবোলা, বাদ্যযন্ত্র, পরিবেশন কখনও বা 'বসে আঁকো' বা 'সুন্দর করে লেখা' প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুর অব্যক্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে তুলতে পারা যায়। এসবই শিক্ষার পরিবেশকে আনন্দমুখর করে তুলতে সাহায্য করবে। এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের একঘেঁয়ে জীবনের মাঝে যেমন একটুখানি হলেও খুশির রেশ ফুটে উঠবে ঠিক পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে অভাবনীয় প্রতিভা আছে তা খুঁজে বের করার আনন্দও পৃথকভাবে সবাইকে প্লাবিত করে।

প্রয়োজন হয়তো অনেক কিছুই থাকতে পারে। নিজের বিদ্যালয়ে হয়তো বা সে পরিবেশ নেই। কিন্তু, 'পরিবেশ সৃষ্টি হোক, তারপর শুরু করবো' এরকম চিন্তা-ভাবনা থাকলে কখনোই সে পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। যে পরিবেশ আছে সে পরিবেশেই শুরু করলে কাজের পাশাপাশি প্রয়োজনের পাশাপাশি পরিবেশও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তাই, সবার আগে প্রয়োজন মানসিকতা।

আমরা যারা কোনো না কোনো সংস্থার সঙ্গে কর্মসূত্রে জড়িত তাদের মনে রাখতে হবে বহু প্রতিভাধর এবং যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ কোনো কিছু করার সুযোগ বা পরিবেশ না পেয়ে জীবনযাপন করছেন, বেঁচে আছেন। আর, আমরা ভাগ্যবান কোনো না কোনো কাজের মাধ্যমে অনেকটাই স্বনির্ভর। তাই, এখানে আমাদের কিছু না কিছু করার সুযোগ অবশ্যই আছে। দেখিনা, আমরা আমাদের কাজের পাশাপাশি সামগ্রিক স্বার্থে আরো বেশি কিছু করতে পারি কী না! উপলব্ধি করতে শিখতে হবে—পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে আমরা এসেছি। তারপর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতেই হবে। ঠিক এই মুহূর্তে পৃথিবীকে নবজাতকের বাসযোগ্য করে যাবার জন্য পরিবেশ সৃষ্টিতে আমাদের দায়দায়িত্ব থেকেই যাচ্ছে। কিছু ভালো করলে তার ফল পৃথিবীতে অনেক অনেকদিন ধরেই থাকবে।

এক্ষেত্রে, আমার নিজের আরও উপলব্ধি একটি মহকুমার মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে থেকে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি—আমার মহকুমায় নয় থেকে আঠারো বছর বয়সি বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্যে কিছু করার সুযোগ আমার আছে। ঠিক এই মুহূর্তে কিছু করতে না পারলে নিজেকে বড়ো অপরাধী মনে হয়। মহকুমায় প্রতি ব্লকে এবং পুরসভা এলাকায় বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠনের মাধ্যমে সেই প্রকল্প কার্যকর করার স্বপ্ন অনেকখানি ফলবতী হয়ে উঠেছে।

আসুন না, ঠিক এই মুহূর্তে আমরা সবাই মিলে নিজ নিজ এলাকায় সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে আরও বেশি দায়িত্ববান হই।

# শিক্ষক সমাজ ও আজকের শপথ

মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধই মানুষকে বড়ো করে তোলে এবং অগ্রগতির পথে সঠিকভাবে নিয়ে যায় একথা সর্বজনবিদিত। আবার কোনো কাজই এই মানবসমাজে ছোটো নয়। যার যেমন দক্ষতা, যার যেমন রুচি এবং যার যেমন পরিবেশ সে তেমনই কাজ করে। শিক্ষকতা ব্রত, বৃত্তি নয়। এবং এই কাজটি সমাজের আর পাঁচটা কাজের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রাচীনকালে শিক্ষাদানের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় বাঁধা ছিল না। 'আচার্য' কথাটি থেকেই শিক্ষকের স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। আচরণের মধ্য দিয়ে যিনি শিক্ষা দেন তিনিই আচার্য। প্রকৃত শিক্ষা দিতে হলে প্রতিটি শিক্ষককেই আচার্য হতে হবে। আজ এরই বড়ো অভাব। বাঁচার জন্যে অর্থের প্রয়োজন ঠিকই তবে, তা যেন প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে না যায় বা কামনার দ্বারা ক্রীত হয়ে না যায়। বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকাই নিজেদের সঠিক পথে চালিত করতে না পেরে ব্রতকে বৃত্তিতে রূপান্তরিত করে মুখ থুবড়ে পড়েন। সমাজের আর পাঁচটা সাধারণ মানুষ আঙুল বাড়িয়ে দেখায়। তাই, সবার আগে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজন কিছু করার মানসিকতা গ্রহণ। আর প্রয়োজন নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। আর পাঁচটা সরকারি বেসরকারি কার্যালয়ের কর্মীদের 'ফাইল ওয়ার্ক' এর থেকে এ কাজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শিক্ষক সমাজকে 'জীবন্ত ফাইল' নিয়ে কাজকর্ম করতে হয়। যেভাবে সেই 'ফাইল'-কে তথ্য সমৃদ্ধ করা হবে সেইভাবেই সেই 'ফাইল'-টি পুষ্ট হবে। তাই, চলন-বলনে, আচার-আচরণে একজন শিক্ষক সবসময়ই ওই 'জীবন্ত ফাইল' এর কাছে অনুকরণযোগ্য। সরকারি প্রচেষ্টা এবং অর্থব্যয়কে সফল করে তুলতে হলে শিক্ষাবিভাগের প্রতিটি মানুষকে যেমন সক্রিয় থাকতে হবে, ঠিক তেমনি, শিক্ষক সমাজকেও দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। আর, প্রত্যেকের মিলিত প্রচেষ্টাতেই তো একটি সার্থক শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে উঠবে এবং আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

তাই, আজ কোনোরকমেই হতাশা নয়, শুধুই প্রচেষ্টা আর শুধুই এগিয়ে চলার শপথ গ্রহণ। 'হবে না হবে না নয়', 'পারবো না পারবো না নয়'। আসুন না, সবাই মিলে চেষ্টা করে দেখি। বিশ্বের প্রতিটি মানুষ আজ কিন্তু, কিছু জেনে বা না জেনে সেই পথের দিকেই তাকিয়ে আছেন।

# খ. পরিদর্শন

## পরিদর্শন ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পরিদর্শনের যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে ঠিক তেমনি, শিক্ষা বিভাগেও পরিদর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষাদান শিক্ষা গ্রহণের মতো পরিদর্শন কথাটিও শিক্ষার সঙ্গো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরিদর্শন ভিন্ন কোনো বিভাগেই কাজকর্মের সুষ্ঠু বিকাশ এবং অগ্রগতি সম্ভবপর নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রেও পরিদর্শনের ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য। পরিদর্শন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন গতিতে হতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন কর্মজগতে পরিদর্শনের মাপকাঠিও ভিন্নতর। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিদর্শনের মধ্যে পরিদর্শকের স্বচ্ছ ও উদার মানসিকতা এবং কিছু করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

সুস্থ সমাজের মূল স্তম্ভ হল শিক্ষা। এই শিক্ষার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিটি মানুষের দায়বদ্ধতার কথা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে যাঁরা শিক্ষা বিভাগের সঙ্গো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত তাঁদের কথা সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাহলে, শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শন শাখায় যাঁরা যুক্ত তাঁদের গুরুত্ব কতখানি তা সহজেই অনুমেয়। একটি শিশুর সামগ্রিক বিকাশের দায়দায়িত্ব যেমন বিদ্যালয়ের ঠিক তেমনি, বিদ্যালয়ের সামগ্রিক অগ্রগতির পথ প্রদর্শক বিদ্যালয় পরিদর্শক।

বিদ্যালয় পরিদর্শন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার এক অপরিহার্য অঙ্গা। বিদ্যালয় পরিদর্শন কোনো ফরমায়েশি কাজ হতে পারে না বা জোর করে চাপিয়ে দিয়েও আদায় করা যায় না। পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজন একটি স্বাধীন সার্বভৌম কর্তব্য সম্পাদনের পরিবেশ এবং মানসিকতা। পরিদর্শন কোনো খবরদারি নয়। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয় পরিচালন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসন এবং শিক্ষাপ্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বা মেল বন্ধনের মাধ্যম হল পরিদর্শন এবং এর প্রধান সূত্রধর হলেন বিদ্যালয় পরিদর্শক সমাজ।

একটি বিদ্যালয় বা একটি শিক্ষার্থী সমাজে যে পরিবেশে আছে রাতারাতি তার আমূল পরিবর্তন আমাদের দেশের মতো সীমাবন্ধ অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে সম্ভবপর নয়। পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আছে ধরে নিয়ে এবং পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার সঙ্গো সঙ্গো ওই পরিবেশেই কীভাবে শিক্ষার্থীদের আরও সম্ভাব্য অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া যায় তারই মূল পরামর্শদাতা এবং পথপ্রদর্শক পরিদর্শক সমাজ।

সমাজে প্রচলিত আর পাঁচটা বৃত্তির সদস্যদের থেকে বিদ্যালয় পরিদর্শক সমাজ সম্পূর্ণ আলাদা। বিদ্যালয় পরিদর্শন আসলে কোনো বৃত্তি নয়, ব্রত। বৃত্তি এবং ব্রতকে সমার্থক করে তুলতে গেলেই পদস্খলন এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিদর্শনের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম তেমনি, পরিদর্শকের ব্রতও সীমাহীন এবং হৃদয়প্রসূত। শিক্ষাদান করানো

যেমন আইনের কচকচানি দিয়ে বা বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে সীমাবন্ধ রেখে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না বা অভিপ্রেতও নয় ঠিক তেমনি, বিদ্যালয় পরিদর্শনও অন্তরপ্রসূত ফসল।

বিদ্যালয় পরিদর্শক হলেন শিক্ষাজগতের তত্ত্বাবধায়ক তথা অভিভাবক। এককথায় প্রাণকেন্দ্র। পরিদর্শকের বহুমুখী প্রতিভার ওপর, দায়িত্ব পালনের ওপর, তৎপরতার ওপর, রুচি, আত্মনিয়োগ এবং স্বচ্ছ মানসিকতার ওপর শিক্ষাব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য নির্ভরশীল। যা চলছে তার থেকে আরও ভালো করতে হবে, আরও নতুনত্ব আনতে হবে। একদিনে সর্বাঙ্গসুন্দর করা যাবে না, ক্রমশ এগিয়ে যেতে হবে—এই মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে গেলেই সাফল্য একদিন আসবেই আসবে। বিদ্যালয় পরিদর্শকরা সেই অগ্রগতির পথেরই দুর্বার যাত্রী।

বিদ্যালয় পরিদর্শনের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই, নেই সীমারেখাও। আন্তরিকতাই সময়সীমা বা সীমারেখা নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি। বিদ্যালয় পরিদর্শন কোনো লঘুচিন্তার ফসল নয়, কোনো মামুলি কর্তব্য সম্পাদন বা দায়সারা কাজ নয়। এর মধ্যে আছে প্রাণ, আছে শিক্ষা দর্শনের গূঢ় রহস্য। 'পরিদর্শক'-এর দর্শক শব্দটিকে 'ভিজিটর' অর্থ করলে পরিদর্শক হন অর্থহীন। দর্শক-এর অর্থ 'অবজারভার' করলে তাতেও পরিদর্শক সমাজ অবহেলিত হন। আসলে 'দর্শক' শব্দের আগে 'পরি' উপসর্গটি যোগ করে পরিদর্শক যা কিনা পরি-দৃশ + ণক অর্থাৎ সর্বতোভাবে অবলোকন। যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী ও শিক্ষার পরিবেশকে এবং প্রয়োজনকে সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করে তার প্রতিফলন ঘটানো সহজতর হয়।

অনেকে ভাবেন পরিদর্শনের কোনো গুরুত্ব নেই, বিদ্যালয়ে যা হচ্ছে তা স্বাভাবিক নিয়মেই হচ্ছে, যা হবে তা প্রাকৃতিক নিয়মেই হবে—তা হয় না-হতে পারে না। যদি তাই হত, তাহলে তো সবই প্রকৃতির নিয়মেই চলত। তাই চলে কি ? যাইহোক, তত্ত্বের কথা ও তর্কের কথা বাদ দিলাম। বাস্তবে, পরিদর্শন শেষে ফেরার প্রাক্‌মুহূর্তে যদি বিদ্যালয় পরিদর্শককে প্রধান শিক্ষক, জনসাধারণ, পরিচালক সমিতি ও শিক্ষার্থীরা ঘিরে আবার কবে আসবেন বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে, পঠন-পাঠনের উন্নতি দেখতে এবং বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের উদ্যোগ গ্রহণের কর্মসূচি দেখতে একথা জিজ্ঞেস করে বা যদি তাড়াতাড়ি আরও একবার আসার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয় তাহলে কি ভাবতে পারবেন পরিদর্শক সমাজ অবাঞ্ছিত, অপাঙ্‌ক্তেয় ? আসলে কী, শ্রদ্ধা করার জন্য, শিক্ষার্থীরা আরও আরও বেশি পাওয়ার জন্য, মানুষ হবার জন্য, মর্যাদা দেওয়ার জন্য এবং ভালো কিছু নেওয়ার জন্য সবাই প্রস্তুত। শুধু অন্তরের সঙ্গে অন্তর মিলিয়ে নিজেদেরকে তৈরি করে নিতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

# পরিদর্শনের আলোয় মাধ্যমিক শিক্ষা

বিদ্যালয় পরিদর্শন একজন সার্থক পরিদর্শকের একটি অবিরত কর্মসূচি। হঠাৎ শখ হল, ইচ্ছে হল বা সময় হল বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে চলে যাওয়া হল এমন হয় না। অর্থাৎ নিজের খেয়ালখুশি মতো বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে যাওয়া যায় না। এর জন্য প্রয়োজন একটি সার্থক ও স্বচ্ছ পরিকল্পনা। একজন সার্থক বিদ্যালয় পরিদর্শকই সার্থকতার সঙ্গে বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে সক্ষম হন। এজন্য তাঁকে সূচনা-পর্ব থেকেই সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সার্থক পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। সার্থক পরিদর্শন তখনই সম্ভব হয় যখন শিক্ষা ও পরিদর্শন বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিদর্শনসূচি রচিত হয়। আমাদের দেশে এখনও নিজের মর্জি-মাফিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়। অনেকেই বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কথা না ভেবে নিজের নিজের কথাই বেশি করে ভাবতে শুরু করেন। নিজে সহজে যাতায়াত করতে পারবেন বা গাড়ি যাবে এমন পরিবেশের বা অবস্থানের বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করেন। কিন্তু প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ই পরিদর্শন করা প্রয়োজন এবং তা করতেই হবে। তাই প্রয়োজন একটি সুসংহত কর্মসূচি প্রণয়ন। একটি শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেই বিদ্যালয় পরিদর্শন কর্মসূচি শুরু হবে এবং তা অবিরতভাবে চলবে শিক্ষাবর্ষব্যাপী। এর জন্য চাই সঠিক পরিকল্পনা ও স্বচ্ছ চিন্তাধারা। একটি শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডার হাতে এলেই সারাবছরব্যাপী কর্ম-পরিকল্পনা করে নিতে হয়। ঠিক একজন সার্থক শিক্ষকের পাঠপরিকল্পনা করার মতোই। এরই মধ্যে থাকবে একদিকে কার্যালয়ের কাজের জন্য নির্দিষ্ট দিন, প্রয়োজন হলে ব্যক্তিগত ছুটি বা অন্যান্য কাজ এবং বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য নির্দিষ্ট দিন। কার্যালয়ে কী কী কাজ করতে হবে, ক'জন পরিদর্শক আছেন এবং বিদ্যালয়ের ছুটি, কার্যালয়ের ছুটি বাদ দিয়ে কতগুলি কাজের দিন এবং তার মধ্যে পরিদর্শনের দিনগুলিও বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই পরিদর্শনের জন্য নির্দিষ্ট দিনগুলিকে অন্য কাজে ব্যবহার করা হবে না এরূপ দৃঢ় মনোভাব নিয়ে একজন পরিদর্শককে চলতে হবে। কেননা, সবার আগে মনে রাখতে হবে তিনি পরিদর্শক। বিদ্যালয় পরিদর্শনই তাঁর প্রধান কাজ।

পশ্চিমবঙ্গে পরিদর্শকের অবস্থা এক শোচনীয় স্থানে গিয়ে পৌঁছেছে। শিক্ষার ওপর আমাদের দেশে সুপ্রাচীনকাল থেকেই নানাভাবে গবেষণা চলছে। কিন্তু, যে শিক্ষার সার্থক রূপায়ণে পরিদর্শন অপরিহার্য সেই পরিদর্শন নিয়ে কোনো গবেষণা হচ্ছে না। পরিদর্শনকে শিক্ষার মেরুদণ্ড হিসেবে দেখা এবং শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের জন্য পরিদর্শনের অপরিহার্যতা যদি স্বীকার না করা হয় তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থাও ভেঙে পড়বে। এ রাজ্যে তারই লক্ষণ স্পষ্ট। কেননা, এখানে পরিদর্শন ব্যবস্থা একেবারে

তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। পরিদর্শন শাখার জন্য নিয়োগের সময় একজন পরিদর্শককে অবশ্যই কমপক্ষে অনার্স-ডিগ্রি এবং বি.এড. ডিগ্রিধারী হতেই হবে। সেইসঙ্গো থাকতে হবে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা।

কিন্তু, এই যথেষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন ডিগ্রিধারীদের কেবলমাত্র কার্যালয়ে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ যোগ্যতার করণিকের কাজ দিয়ে আটক করে রাখা হচ্ছে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের চাকরিসংক্রান্ত কাজগুলি তড়িৎগতিতে তুলে দেবার জন্য এদের অকারণ আটক করে রাখায় শিক্ষা ব্যবস্থার ডানা ছাঁটা হয়ে যাচ্ছে। বিদ্যালয় পরিদর্শকদের মনে রাখতে হবে পরিদর্শনের পরিবেশ কেউ তৈরি করে দেবে না, নিজেদেরই তৈরি করতে হবে। কার্যালয়ের কাজগুলি তোলারও যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে ঠিক তেমনি, বৃহত্তর জনস্বার্থে বিদ্যালয় পরিদর্শনেরও অপরিহার্যতার কথা মনে রাখতে হবে। এসব কথা ভেবেই সপ্তাহে পাঁচটি কাজের দিনে অন্তত দুটি দিন বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য রেখে দুটি দিন কার্যালয়ের কাজের জন্য এবং একটি দিন ব্যক্তিগত ছুটি বা অন্যান্য কাজ করার জন্য রেখে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। ৫২ সপ্তাহে গড়ে দুদিন করে ১০৪ দিন বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য রাখলে এবং ওই দিনগুলিতে পরিদর্শন করলে পরিদর্শন জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হবে। সঠিক হবে শিক্ষাসূচি রূপায়ণ। সার্থক হবে শিক্ষা আন্দোলন। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে পরিদর্শন অত্যন্ত জরুরি ও অবশ্যই কাম্য। নিয়মিত অ্যাকাডেমিক ইন্‌সপেকশন শিক্ষার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। তাই, পরিদর্শনের **সর্বপ্রথম পর্ব** হল সারাবছরের জন্য একটি 'মাস্টার প্ল্যান' তৈরি করা। বছরের পরিকল্পনায় পরিদর্শনের জন্য দিনগুলি চিহ্নিত করা হবে। এবং কোন কোন বিদ্যালয় পরিদর্শক কোন কোন বিদ্যালয়ে কোন কোন তারিখে যাবেন তা পরবর্তী মাসিক পরিদর্শন সূচি তৈরির সময় নির্দিষ্ট করা হবে।

**দ্বিতীয় পর্ব**—এই পর্বে থাকবে নিজের নিজের কার্যালয় এলাকার বিদ্যালয়গুলির ব্লক বা পুরসভাভিত্তিক তালিকা তৈরি করে একটি 'পরিদর্শন আয়না' শিরোনামে খাতা তৈরি করা। তাতে থাকবে — (১) ক্রমিক সংখ্যা (২) বিদ্যালয়ের নাম (৩) পরিদর্শনের তারিখ (৪) মোট শিক্ষার্থী (৫) উপস্থিত শিক্ষার্থী (৬) মোট শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী (৭) দূরত্ব।

অন্য একটি খাতায় (১) ক্রমিক সংখ্যা (২) তারিখ (৩) প্রতিদিনের পরিদর্শন করা বিদ্যালয়গুলির নাম (৪) ব্লক/পুরসভা (৫) পরিদর্শকবৃন্দের নাম।

**তৃতীয় পর্ব**—এই পর্বে থাকবে এক একটি মাসের জন্য পরিদর্শনসূচি প্রণয়ন ও তার অনুমোদন। এই পর্বেই বিদ্যালয়গুলিকে পরিদর্শনের জন্য দিনক্ষণ জানিয়ে পত্র দেওয়া প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গো পরিচালন সমিতির পদাধিকারী ব্যক্তিদের এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ করা যেতে পারে। এইভাবে জানিয়ে পরিদর্শন করতে যাওয়াই বিজ্ঞানসম্মত। মনে রাখতে হবে, পরিদর্শক যাচ্ছেন খবরদারি করতে বা ভুলত্রুটি ধরে নাজেহাল করতে নয়, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে। যা, প্রকৃতই যুক্তিসঙ্গত।

**চতুর্থ পর্ব**—পরিদর্শনের জন্য নির্বাচিত বিদ্যালয়গুলি যাতে একটি শিক্ষাবর্ষে অন্তত একবারও পরিদর্শন করা সম্ভব হয় সেদিকে নজর রেখে সূচি করতে হবে এবং সেইমতো

পরিদর্শকদের অন্তর্ভুক্তি করতে হবে। যাতায়াতের সুবিধের জন্য অনেকসময় একই বিদ্যালয় বার বার পরিদর্শন করা হচ্ছে এবং যেখানে যাতায়াতের অসুবিধে সেখানে আদৌ পরিদর্শন করা হয় না এমনটা যেন না হয় সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

**পঞ্চম পর্ব**—একজন পরিদর্শকের অবশ্যই প্রার্থনা সভায় অর্থাৎ বিদ্যালয়ের শুরুতে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন এবং বিদ্যালয়ের শেষ ঘন্টা পর্যন্ত থাকাও জরুরি প্রয়োজন। কেননা, প্রার্থনা সভা হল বিদ্যালয়ের দর্পণ। প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থেকে একজন সার্থক পরিদর্শক বিদ্যালয়ের পুরো চিত্রটি উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থাকলে শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়। তাছাড়া, একজন পরিদর্শকও যে শুধু পরামর্শই দেন না নিজেও করে দেখান তা প্রমাণিত হবে। প্রার্থনা সভায় উপস্থিতির ফলে জাতীয় সংগীত গাওয়া হচ্ছে কি না, বা তা নির্দিষ্ট সময় ৫২ সেকেন্ডে গাওয়া হচ্ছে কি না, প্রতিটি শিক্ষার্থী বিদ্যালয় নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পরে আসছে কি না, মনীষীদের রচনা পাঠ, স্থানীয় সংবাদ পাঠ করা হচ্ছে কিনা, সারিবদ্ধভাবে ছোটো থেকে বড়ো দাঁড়াচ্ছে কি না, নিয়মশৃঙ্খলা কতখানি মানছে তা জানা যাবে। ফলে, এ বিষয়ে যথাসময়ে পরামর্শ দেওয়াও সহজতর হবে। তাছাড়া, এই প্রার্থনাসভাতেই প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা পরিদর্শকবৃন্দের সঙ্গো শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারবেন। যার ফলে শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শনকালে 'এই আগন্তুক ব্যক্তিটি কে' এই অবাঞ্ছিত প্রশ্নের বা কৌতূহলের মুখোমুখি হতে হবে না। তাই, পরিদর্শককে অবশ্যই প্রার্থনাসভায় উপস্থিত থাকতে হবে।

**ষষ্ঠ পর্ব**—শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শনের জন্য একটি সূচি তৈরি করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রতিটি শ্রেণি যেন অবশ্যই পরিদর্শন করা সম্ভব হয়। তা না হলে শিশুমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে যার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া একজন পরিদর্শকের আদৌ কাম্য নয়। একাধিক পরিদর্শক থাকলে কোন পরিদর্শক কোন পিরিয়ডে কোন শ্রেণিতে যাবেন তার একটি সূচি অবশ্যই তৈরি করে নিতে হবে এবং প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সেই মতো বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষে পৌঁছে দেবার কথা জানাতে হবে। তাছাড়া, ওই শ্রেণি পরিদর্শন কালে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা বা পরিচালন সমিতির কোনো পদাধিকারী ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে পরিদর্শকের পক্ষে অনেক সুবিধে হয়।

**সপ্তম পর্ব**—শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন। এই শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল। এখানেই একজন পরিদর্শকের যোগ্যতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বাগ্মিতা এবং দক্ষতা প্রকাশ পাবে। শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করতে গিয়ে অনেকেই পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করতে চান। সেই কারণে শিক্ষার্থীদের নানারকম প্রশ্নে বিভ্রান্ত করতে চান। মনে রাখতে হবে, একজন পরিদর্শক পুরো শিক্ষাদান প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করতে এসেছেন মাত্র, শিক্ষাদান করতে নয়। তিনি দেবেন পরামর্শ। চলবেন শিক্ষকেরা, পূর্ণ হবে শিক্ষার্থীবৃন্দ। এই পরিমাপ প্রক্রিয়াটি একটু বিজ্ঞানসম্পন্ন, যুক্তিসঙ্গাত ও প্রাসঙ্গিক হবে। তাই প্রথমেই একজন পরিদর্শক শিক্ষক শিক্ষিকার পাঠদান এবং শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণ প্রক্রিয়াটি তার অনুসন্ধিৎসু চোখে অনুধাবন করবেন। তারপর শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে সামান্য কিছু সময় চেয়ে নিয়ে পরিদর্শন ও শিক্ষা

বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার একটি পরিমাপ করে নিতে পারবেন। যা আধুনিক পরিদর্শনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। অনেকে পরিদর্শকদের শেষের দিকে চুপচাপ বসে থেকে প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করে পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু, আরও স্বচ্ছ চিন্তার ফসল হিসেবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কিছু কথা বলার প্রয়োজন আছে। তাতে শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধ হবে এবং শিক্ষার প্রকৃত চিত্রটিও তুলে আনা সম্ভব হবে। মনে রাখতে হবে একজন পরিদর্শক প্রকৃতপক্ষে মৌমাছি। এরা মধু সংগ্রহ করে মধু জমা রাখবে এবং অপরের রসনা তৃপ্তিতে সাহায্য করবে। তাই, একজন বিদ্যালয় পরিদর্শক নিম্নরূপভাবে তার অভিজ্ঞতা বিনিময় প্রক্রিয়াটি শুরু করতে পারেন।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এতক্ষণ তোমাদের স্যার বেশ সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন। শুনে খুব ভালো লাগল। আচ্ছা, বলো তো, তোমাদের মধ্যে ভালো ফল করতে কে কে চাও? হাত তোলো। এক্ষেত্রে সবাই হাত তুলবে। তারপর বলতে পারেন ভালো ফল করার জন্যে স্যার তো আলোচনা করলেন—এছাড়াও আরও ভালো ফল করার জন্য কে কে প্রাইভেট টিউশন পড়ছো বলো তো? যারা হাত তুলবে তাদের সংখ্যাটি দেখে নিয়ে যারা হাত তোলে নি তাদের দাঁড়াতে বলে কেন তারা পড়েনি তা জেনে নিতে পারা যায়। এবার সামগ্রিক শ্রেণির পঠন-পাঠন চিত্র সংগ্রহ করতে বলা যায় স্যার তো অঙ্কের ক্লাস নিলেন। বলো তো এর আগের পরীক্ষায় তোমরা অঙ্কে কে কীরকম নম্বর পেয়েছো? সঠিক চিত্র জানার জন্যে তিনি বোর্ডের বাঁদিক ৯০-১০০ লিখে ডানদিকে এরমধ্যে কজন ৮০-৮৯, ৭০-৭৯, ৬০-৬৯, ৫০-৫৯, ৪০-৪৯, ৩০-৩৯, ২০-২৯, ০-১৯ এর মধ্যে কজন সংখ্যাগুলি পরপর লিখে নেবেন। প্রায় সকল বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থীর নম্বর ০ থেকে ৫৯ এর মধ্যে। ২০শতাংশ শিক্ষার্থীর নম্বর ৬০ থেকে ১০০-এর মধ্যে। অথচ, প্রত্যেকেই প্রাইভেট টিউশন পড়ে। এই চিত্রের দিকে দেখিয়ে বলা যেতেই পারে এই শিক্ষক মশাই-এর পাঠদান ছাড়াও তোমরা তো প্রাইভেট টিউশন পড়েছো সেখানে কী পেয়েছো? আবার প্রশ্ন করা যেতে পারে—তোমাদের তো বিদ্যালয়ে দেখলাম ৩-এর প্রশ্নমালা অঙ্ক হচ্ছে। প্রাইভেট টিউশনে কত প্রশ্নমালা হচ্ছে? উত্তর পাওয়া যাবে ৫ থেকে ১২-এর মধ্যে হচ্ছেই। কারও পাঁচ, কারও সাত, কারও বা বারো। কিন্তু, ৩-এর প্রশ্নমালায় স্কুলের অঙ্কই প্রাইভেট টিউশনে হচ্ছে এমন চিত্র একজনও দেবে না। অর্থাৎ দুটি পাশাপাশি বিদ্যালয় চলছে মনে হবে। ঠিক এই সুযোগে শিক্ষার্থীদের একটি প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে। দেখো, সবই তো আমাদের স্কুল। তাই, তোমাদের স্কুলে যেমন ১১ টা থেকে ৪টে পর্যন্ত ক্লাস হচ্ছে আগামীকাল থেকে এখানে তোমরা পড়বে এবং পাশের একটি বিদ্যালয়ের নাম বলে সেখানকারও শিক্ষার্থীরাও পড়বে। আর তোমাদের ওই স্কুলে সকাল ৬টা থেকে বেলা ১০ টা পর্যন্ত যদি পড়ার ব্যবস্থা করে দিই তোমরা কে কে পড়বে? উত্তর আসবে সবাই পড়বে। এবার কীভাবে কখন পড়বে তার একটি চিত্র খাড়া করে দিতে যদি এইভাবে বোর্ডে লেখা যায়—

মানুষের সবার আগে প্রয়োজন ঘুম। তোমাদের ঘুমানোর জন্যে কতক্ষণ সময় লাগবে বলো তো? বলবে ৬ ঘন্টা।

বোর্ডে সেইভাবে লেখা হল —

ঘুমের জন্য — ৬ ঘন্টা

৪ বার খাওয়ার জন্য — ২ ঘন্টা

সাংসারিক কাজ, খেলাধুলা, বেড়ানো ও গল্পগুজবের জন্য — ২ ঘন্টা

নিজের ব্যক্তিগত কাজ — ১ ঘন্টা

বিদ্যালয় যাতায়াত — ১ ঘন্টা

বিদ্যালয়ে থাকার সময় — ৫ ঘন্টা

বিদ্যালয়ে সাতটি পিরিয়ডে পড়া ও লেখা — ৭ ঘন্টা

মোট — ২৪ ঘন্টা

তাহলে, তুমি অন্য স্কুলে লেখাপড়ার জন্যে কখন যাবে? সেখানে ৪ ঘন্টা থাকা, ১ ঘন্টা যাতায়াত এবং ৭ টি পিরিয়ডের পড়া তৈরি করতে আরও ৭ ঘন্টা সময় কখন পাবে? আরও ১২ ঘন্টা প্রয়োজন। সময় নাই। তাই, আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু, বাস্তবে তা তোমরা করছো। প্রাইভেট টিউশন পড়ছো। সময় কোথায় পাচ্ছো? ফল হচ্ছে স্কুলের পড়াও হচ্ছে না, প্রাইভেট টিউশনের পড়াও হচ্ছে না। তোমাদের পরীক্ষার ফল তাই খারাপ হয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে তোমাদের উচিত স্কুলের পড়া ভালোভাবে তৈরি করা। তাহলে আর প্রাইভেট টিউশন পড়ার প্রয়োজনই হবে না। যদি কেউ আরও বেশি করে জানার জন্যে প্রাইভেট টিউশন পড়তে চায় তাদের লক্ষ্যটা এই হোক যে তারা যেন স্কুলের পড়াটি দিনের দিন তৈরি করে নিয়ে তারপর অন্য পড়া তৈরি করে। পরিদর্শক হিসেবে এধরনের পরামর্শ দেওয়া যেতেই পারে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের সঠিক পথ ধরানোর দায় অনেকটাই পরিদর্শককে নিতে হবে।

পঞ্চম শ্রেণি পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পদ্ধতিটা হবে ভিন্নতর। এখানে শিক্ষার্থীদের গল্পচ্ছলে অনেক পরামর্শ দেওয়া যেতেই পারে। এই শ্রেণিতে লক্ষ করা গেছে সরকারি পাঠ্যপুস্তকগুলির যত্ন অনেকেই করে না এবং শিক্ষক মশাইরাও অনেকক্ষেত্রে ছেঁড়া বই নিয়েই পড়াচ্ছেন, ভুল করেও মলাট দিয়ে যত্ন করার কথা বলছেন না। পরিদর্শক হিসেবে সরকারি পাঠ্যপুস্তকগুলি দেখা এবং যত্ন করার পরামর্শ দেওয়ার একটি নৈতিক দায়িত্ব থেকেই যায়। এক্ষেত্রে পরামর্শ দিলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই একশো শতাংশ ভালো ফল পাওয়া যায়।

**অষ্টম পর্ব** — টিফিনের বিরতির সময় শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে। কেননা, অতিরিক্ত কোনো সময় পাওয়া যাবে না।

**নবম পর্ব** — পঞ্চম পিরিয়ড থেকে ছুটির সময় পর্যন্ত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করানো যেতে পারে। সাংস্কৃতিক দক্ষতাও একজন শিক্ষার্থীকে মানুষ করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে এই পরিকল্পনার কথা বলে বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকার মাধ্যমে এবং অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় যদি হলঘর থাকে সেখানে অথবা বারান্দায় অথবা গাছতলায় বা গ্রাউন্ডে একসঙ্গে খোলামেলা বসে শিক্ষার্থীদের পরিচালনায় গান,

আবৃত্তি, নৃত্য, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। এই সভাতে বিশেষ অতিথিরূপে একজন পরিদর্শক তাঁর শিক্ষা বিষয়ক ভাবনাটি এবং সারাদিনের পর্যবেক্ষণের চিত্রটি তুলে ধরতে পারেন এবং সঙ্গো সঙ্গো ঘাটতিগুলি কাটিয়ে ওঠার পরামর্শ দিতেই পারেন।

এই সময় আরও একজন বা দুজন পরিদর্শক বিদ্যালয়ে নথিপত্র দেখে নিয়ে কোনো অসঙ্গতি থাকলে তা দূর করার পরামর্শ দিতে পারেন এবং সঠিকভাবে রক্ষিত হলে ধন্যবাদ জানাতে ভুল করবেন না।

এইভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে পারলে পিছিয়ে পড়া পরিদর্শন ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত সহজেই করা যাবে এবং যারা পরিদর্শন হচ্ছে না বলে চিৎকার করেন তাঁদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া যাবে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মন থেকেও পরিদর্শন-ভীতি দূর করা যাবে। শুধু তাই নয়, পরিদর্শন যে খবরদারি নয়, অত্যন্ত প্রয়োজন তার ইতিবাচক দিকটি তুলে ধরা সম্ভব হবে। সর্বোপরি, শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে পরিচালিত করতে সুবিধে হবে। একজন বিদ্যালয় পরিদর্শকের ওপর ৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি অসংখ্য ছেলেমেয়ের জন্য কিছু করার যে একটা দায়িত্ব অর্পণ করা আছে তা সঠিকভাবে রূপায়িত হবে।

# পরিদর্শনের আলোয় প্রাথমিক শিক্ষা

অধিকাংশ বিদ্যালয় পরিদর্শকের পরিদর্শনের হাতেখড়ি হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে, যে বিদ্যালয়ে সাধারণত শিশুরা অর্থাৎ ৫ থেকে ৯ বছর বয়সি ছাত্র ছাত্রীরা পড়াশোনা করে। তাই, বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গিয়ে যদি তাদের মতো করে বিদ্যালয় পরিদর্শন করা না হয় তাহলে পরিদর্শন করে কী লাভ? বিদ্যালয়ের প্রাণ শিক্ষার্থীরা, আবার শিক্ষার্থীদের জন্যই একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী থেকে শুরু করে শিক্ষামন্ত্রী পর্যন্ত প্রত্যেকেই যে যাঁর কাজ যথাসাধ্য করে থাকেন। তাই, যাদের জন্যে আমরা সবাই সেই শিশু শিক্ষার্থীদের কথা একজন পরিদর্শককেও পরিদর্শনের সময় বিশেষভাবে ভাবতে হবে। পরিদর্শনে গিয়ে সবার আগে শিশুদের সঙ্গো কথা বলে, গল্প করে, তাদের সঙ্গো বন্ধুত্ব করে নিতে হবে। কোনোক্রমেই যেন তারা বহিরাগত বলে ভয়ে ভীত না হয়। তাহলেই শিশুদের মন থেকে পরিদর্শকভীতি দূর করা যাবে। বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে তা অগ্রিম খবর দিয়েই হোক বা আকস্মিকভাবেই পরিদর্শনে যাওয়া হোক না কেন সবার আগে শিশুদের মন জয় করতে হবে। সেজন্য পরিদর্শককেও অবশ্যই শিশুমন-সন্ধানী হতে হবে। প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হয়ে একজন পরিদর্শকও যেমন একসঙ্গো কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে জাতীয় সংগীত গাইবেন, ঠিক তেমনি মন দিয়ে শুনবেন তাদের স্থানীয় সংবাদ পাঠ, বা মনীষীদের রচনা পাঠ, পর্যবেক্ষণ করবেন নিয়মশৃঙ্খলা, সারিবদ্ধভাবে ছোটো থেকে বড়ো—এইভাবে দাঁড়ানোর অভ্যাস কতখানি গড়ে উঠেছে তাও। এই সময়ও তাদের সঙ্গো প্রয়োজনীয় দু একটি কথা বলে আজকে তাঁর এই আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করবেন এবং তিনি যে বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং তিনিও যে শিক্ষকমশাইদের মতো একজন তা বুঝিয়ে দিয়ে সবার কাছে পরিচিত হবেন।

এরপর প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে গিয়ে পৃথকভাবে তাদের সঙ্গো পরিচয় করে নিয়ে সবার আগে সরকারি পাঠ্যপুস্তকগুলি সবাই পেয়েছে কি না এবং সেগুলির কেমন যত্ন করেছে অর্থাৎ মলাট দিয়েছে কি না তার খোঁজ-খবর নেবেন এবং মলাট না দেওয়া থাকলে বা ছিঁড়ে গেলে কীভাবে তার যত্ন করবে সে বিষয়ে পরামর্শ দেবেন। এক্ষেত্রে জামাকাপড় আনা পলিথিনের ক্যারি ব্যাগ যেগুলি বাড়িতে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে থাকে সেগুলি দিয়ে মলাট দেওয়ার পরামর্শ দিলে বিনা পয়সায় মলাট দেওয়ার কাগজ সবাই প্রায় হাতের কাছেই পেয়ে যাবে। এরপর তাদের ছড়া শুনবেন, নিজেদের সুবিধে অসুবিধের কথা শুনবেন, গল্প শুনবেন, তাদের সঙ্গো একাত্ম হয়ে অনুধাবন করবেন শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্তৃক বিদ্যালয়ের পাঠদান পদ্ধতি, লক্ষ করবেন নিয়ম শৃঙ্খলা, সাগ্রহে দেখবেন শিশুদের হাতের কাজ, দলগত পাঠ, একক পাঠ, এবং তাদের উপস্থাপন কৌশল। সুযোগমতো দেখবেন খেলার মাঠে গিয়ে তাদের খেলাধুলা।

শ্রেণিকক্ষে থাকাকালীন যেমন তাদের অনেকেরই নাম জানবেন ঠিক তেমনি, তাদের শিক্ষকমশাইদের নামও তাদের কাছে জানতে চাইবেন। পরিশেষে, নিজের পরিচয় দিয়ে বলবেন তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শক, প্রত্যেকের সঙ্গো বন্ধুত্ব করে তাদের খোঁজ-খবর নেবার জন্যই তাদের

এইবিদ্যালয়ে তার আসা। তাহলে পরিদর্শক সম্বন্ধে শিশুরা পরিচিত হবে এবং একজন পরিদর্শকও পাবেন ওই শিশুদের কাছ থেকে পুনরায় তাদের বিদ্যালয়ে আসার আমন্ত্রণ। তখনই একজন পরিদর্শক বুঝবেন তার বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসা সফল হয়েছে এবং তিনি একজন সফল পরিদর্শক।

বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়েই একজন পরিদর্শককে চেষ্টা করতে হবে কী ভাবে স্থানীয় জনসাধারণ, অভিভাবক এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গো কিছু সময় কাটানো যায়। এজন্য বিদ্যালয়ে পৌঁছেই সবার আগে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকার মাধ্যমে যতজন অভিভাবককে সম্ভব হবে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে অনুরোধ জানানো। তারপর শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের সঙ্গো কিছুটা সময় বসে বিদ্যালয়ের সমস্যা ও সমাধানের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন। বসতে হবে গ্রাম শিক্ষা সংসদের সদস্যদের সঙ্গোও।

একদিনে দু-তিনটি পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করার প্রবণতা কোনো কোনো পরিদর্শকের মধ্যে দেখা যায়। এতে পরিদর্শন হয় না। বিদ্যালয়ে পৌঁছে একটু খোঁজ-খবর নেওয়া যায়। পরিদর্শন হচ্ছে বলে খাতা ভর্তি রিপোর্ট দেওয়া যায়। বাস্তবে ফল হয় শূন্য। তাই, এতদিনের অনুসৃত ভুল পথ পরিহার করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনকে শিক্ষাবিজ্ঞানমুখী করা প্রয়োজন। পরিদর্শনকে খবরদারির মাপকাঠি দিয়ে না পরিমাপ করে সহযোগিতার পর্যায়ে পৌঁছে দিলেই হবে সার্থক পরিদর্শন। তাই কোনো মতেই একটির বেশি বিদ্যালয় একদিনে পরিদর্শন করা উচিত নয় এবং সম্ভবও নয়। একটি কথা বার বার মনে রাখতে হবে—পরিদর্শনে এসে যত বেশি অভিভাবকের সঙ্গো যোগাযোগ করা যাবে, পরিদর্শন-প্রক্রিয়া তত বেশি সার্থক ও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

পরিদর্শন পর্বের এক সময়ে সুযোগমতো দেখবেন শিক্ষার্থীর উপস্থিতি খাতা, শিক্ষার্থী ভর্তি খাতা, মূল্যায়ন খাতা ও অন্যান্য খাতা। আর দেখবেন শিশু তালিকা বা চাইল্ড রেজিস্টার। ফলে, এলাকার শিশুদের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিদর্শকের সামনে পরিস্ফুট হবে।

পরিদর্শন প্রক্রিয়ার শেষ পর্বে হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ওই খুদে পড়ুয়াদের মধ্যে যে কী অভাবনীয় শৈল্পিক চেতনা আছে তা এইরকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন না করলে অনুভবই করা যাবে না। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিলে ওই খুদে পড়ুয়ারাই খুদে উদ্যোক্তা বা পরিচালক হয়ে চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ-সতরঞ্চি বা বসার আসন এনে যেমন মঞ্চ তৈরি করবে ঠিক তেমনি ফুলপাতা দিয়ে মঞ্চ সাজাবে, সংগ্রহ করবে বরণের উপাদান — মালা-চন্দন। বাজাবে শাঁখ। তারপর সাধ্যমতো নাচ, গান, আবৃত্তি, হরবোলা, নাটকের উক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে অনেকক্ষণ সময় নিজেরা মশগুল থাকবে এবং পরিদর্শক মশাইকে যে তাদের দক্ষতা দেখাতে পারছে তার জন্য অমলিন আনন্দ উপভোগ করবে। শুধু তাই নয়, সেই স্মৃতি তারা আজীবন বহন করবে। একজন সন্ধানী পরিদর্শকও এই অনুষ্ঠান থেকে খুঁজে বের করে নিতে পারবেন এক ঝাঁক খুদে শিল্পীর ঠিকানা। উদ্যোগী শিক্ষক-শিক্ষিকারা উৎসাহিত হয়ে তাদের নিয়ে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবেন। অভিভাবকরাও চমৎকৃত হবেন।

এইভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শন করলে 'বিদ্যালয় পরিদর্শন আদৌ হচ্ছে না' বলে যে একটা অভিযোগের তির এখনও অসহায় পরিদর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে তার ছুঁচালো মুখ ভোঁতা করে দেওয়া যাবে। তার থেকেও বড়ো কথা হল—শিশুরা উৎসাহিত হবে, বাড়তি আলো পাবে এবং সমাজ পাবে একজন সহৃদয় বিদ্যালয় পরিদর্শকের আন্তরিক আবেদন।

# প্রাইভেট টিউশন রোধে বিদ্যালয় পরিদর্শকদের ভূমিকা

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে একটি বিষয় খুবই মুখরোচক হয়ে উঠেছে। আলোচ্য বিষয়টিহল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশন পড়ানো বন্ধ করতে সরকার সফল হবেন কি না? অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই বিষয়টি নিয়ে সর্বত্রই চায়ের কাপে তুফান উঠছে। দেশে আইনি মারপ্যাঁচে প্রতিটি মানুষ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। কিছু কাজ করার আগে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সে বিষয়ে যথেস্ট চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন । এই আইনি বাঁধনে থেকেও কীভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ জনস্বার্থে করা যায় তার জন্য নানা পথ ধরতে হয়। প্রাইভেট টিউশন পড়ানো রোধের ক্ষেত্রেও তাই আইনের মারপ্যাঁচের ঊর্ধ্বে থেকে কী ভাবে কী করা যায় তা ভাবতে হবে। সবার আগে যাঁরা জ্ঞানপাপী তাঁদের না বুঝিয়ে যারা সহজ সরল ভাবে অন্যের কথা বিশ্বাস করে বহ্নিশিখার কাছে নিজেদের পতঙ্গ করে তুলছে সেই শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেওয়া প্রয়োজন। রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণই সাফল্যের প্রধান হাতিয়ার। প্রাইভেট টিউশন বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ বিভিন্ন রকম মন্তব্য করছেন, বিভিন্ন পথও নির্দেশ করছেন। এ বিষয়ে সবার আগে জানা প্রয়োজন শিক্ষার্থীরা প্রাইভেট টিউশন পড়তে যাচ্ছে কেন? কেনই বা শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছেই পড়তে যাচ্ছে? উত্তর খুঁজতে গিয়ে বলা যেতে পারে, (১) শিক্ষার্থীরা কীভাবে বেশি নম্বর পেয়ে এই প্রতিযোগিতার যুগে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, (২) কিছু কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভুল বুঝিয়ে নিজের পাঠশালায় যেতে উৎসাহিত করেন। (৩) কোনো কোনো শিক্ষার্থী বিদ্যালয় পঠন-পাঠন কিছু কিছু অশিক্ষিত শিক্ষকের শিক্ষাক্ষেত্রে অনুপ্রবেশে মনোমতো হয় না বলে বিকল্প পথ খুঁজতে এই টিউটোরিয়াল হোমের দিকে ছুটে যায়।

কারও কারও আবার আভিজাত্য বজায় রাখার চেস্টা। একজন অভিভাবক তার পুত্র কন্যার জন্য পাঁচজন প্রাইভেট টিউটর নিয়োগ করলে তারই প্রতিবেশী তাকে টেক্কা দেবার জন্য নিজের পুত্র-কন্যার আরও একজন শিক্ষক বাড়িয়ে দিয়ে আভিজাত্য প্রদর্শন করতে চায়। এরকম হাজারো কারণ আছে, উদাহরণও আছে। একটু বাস্তবে চোখ রাখলে পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায়। যাইহোক, শিক্ষার্থীদের ওই প্রাইভেট টিউটরের কাছে হাজির হওয়ার আগে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ করে শিক্ষক সম্প্রদায়ের অনেক কিছু করার আছে। তা করা অনেক ক্ষেত্রেই হচ্ছে না বলেই শিক্ষার্থীরা দিকভ্রান্ত হয়ে ছুটছে। এভাবে চলতে পারে না। কিন্তু, কেই বা কী করবেন—এই প্রশ্ন নিয়ে সবাই একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছেন। ঠিক এই মুহূর্তে শিক্ষার যাঁরা অভিভাবক, যাঁরা প্রকৃত পথ-প্রদর্শক, যাঁরা হাজার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে থেকেও নিরপেক্ষভাবে কাজ করে শিক্ষার পরিকাঠামোকে অজ্ঞাতেই ধরে রেখেছেন

— সেই বিদ্যালয় পরিদর্শকদের এগিয়ে আসতে হবে। যত আইন কানুনই থাক না কেন শিক্ষক ভিন্ন শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের অধিকার কেবলমাত্র বিদ্যালয় পরিদর্শকদেরই আছে, অন্য কোনো ব্যক্তির বা বৃত্তির মানুষের নেই। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময় থেকে এই নিয়ম চলে আসছে এবং চিরদিন থাকবেও। তাই, এই গৌরবময় অধিকারকে কীভাবে বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের বিপদের দিনে তাদের পাশে দাঁড়ানো যেতে পারে তা নতুন করে বিদ্যালয় পরিদর্শকদের ভাবতে হবে। বিদ্যালয় পরিদর্শকদের প্রধান কাজ হল—বিদ্যালয় পরিদর্শন করে শিক্ষার মানোন্নয়ন করা, ঘাটতি পূরণ করা এবং শিক্ষার্থীর পাশে বন্ধুর মতো দাঁড়ানো। বর্তমানে, বিদ্যালয় পরিদর্শকদের উপর হাজারো সাধারণকর্মীর কাজের বোঝা চাপিয়ে তাঁদের 'ঠুঁটো জগন্নাথ' করে রাখার জন্যে একটা কুচক্র কাজ করে চলেছে। বিদ্যালয় পরিদর্শকরা সংঘবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তবে, প্রতিনিয়ত কাজের মাধ্যমেই তাঁদের নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে।

এখন এই মুহূর্তে বিদ্যালয় পরিদর্শকরা কীভাবে শিক্ষার্থীর পাশে বন্ধু হিসেবে দাঁড়াতে পারেন দেখা যাক। কেননা, একমাত্র নিরপেক্ষভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শকরাই শিক্ষার্থীর চোখ খুলে দিয়ে নতুন পথের সন্ধান দিতে পারেন। সেই সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকমশাই কতটা সফল তার চিত্র কোনো কিছু না মন্তব্য করেই তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরতে পারেন। বর্তমানে শিক্ষার মানোন্নয়নে এবং শিক্ষক প্রদত্ত শিক্ষার উৎকর্ষতা এবং সফলতা নির্ধারণে বিদ্যালয় পরিদর্শকদের নিকট এই পদ্ধতিই প্রধান হাতিয়ার।

বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে অফিসে বসে দুচারটে খাতা দেখে অথবা শ্রেণিকক্ষে গিয়ে দুমদাম করে দুচারটে প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অবৈজ্ঞানিকভাবে নাজেহাল করার দিন ফুরিয়ে গেছে। আবার শ্রেণিকক্ষে গিয়ে পিছনের বেঞ্চে চুপচাপ বসে শিক্ষকমশাই-এর পাঠদান পদ্ধতি দেখে এসে শ্রেণিকক্ষের বাইরে উক্ত বিষয়ে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে বিদ্যালয় থেকে চলে আসার যে পদ্ধতি চলছে তাও নতুন করে ভাবতে হবে। কেননা, শিক্ষকের ভুলত্রুটি বিশ্লেষণ করে তা সংশোধন করার কথা বলে যে ফল পাওয়া যাচ্ছে তার চেয়ে শিক্ষার্থীদের পুরো ছবিটা সবার সামনে তুলে ধরলে শিক্ষার্থী-শিক্ষক সবারই চোখ খুলে যাবে।

এখন, কীভাবে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ধরা যাক, একজন শিক্ষকমশাই নবম শ্রেণিতে 'ইংরেজি'র ক্লাস নিচ্ছেন। একজন পরিদর্শক সেই শ্রেণিতে গিয়েছেন। তিনি প্রথমে শিক্ষকমশাই-এর পঠন-পাঠন পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরদান-এর বিষয়টি অনুধাবন করলেন। তারপর শেষের দিকে শিক্ষকমশাই-এর কাছে খুব অল্প সময় চেয়ে নিয়ে বলতেই পারেন— আমার শিক্ষার্থী বন্ধুগন, এতক্ষণ শিক্ষকমশাই যা পড়ালেন এবং তোমরা যা উত্তর দিলে বেশ ভালো লাগল, তা আরো ভালো ফল করার জন্য কে কে প্রাইভেট টিউশন পড়ো হাত তুলে বলো তো।

শিক্ষার্থীরা তখন তাদের কথা হাত তুলে জানাবে। এর একটা হিসেব বিদ্যালয় পরিদর্শক রাখলেন। পরে তিনি আরও প্রশ্ন করতে পারেন—তোমরা তো কিছুদিন আগেই একটা

পরীক্ষা দিয়েছো। তখন ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হয়েছিল। আমি বোর্ডে একটা শতকরা হিসেব তুলে ধরছি। তোমরা কে কত নম্বর পেয়েছো উঠে দাঁড়িয়ে জানাবে।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৯০ থেকে ১০০ এর মধ্যে কজন আছো? | | | | | | | নেই |
| ৮০ | " | ৮৯ | " | " | " | " | ২ জন |
| ৭০ | " | ৭৯ | " | " | " | " | ৫ জন |
| ৬০ | " | ৬৯ | " | " | " | " | ৫ জন |
| ৫০ | " | ৫৯ | " | " | " | " | ৭ জন |
| ৪০ | " | ৪৯ | " | " | " | " | ২০ জন |
| ৩০ | " | ৩৯ | " | " | " | " | ৩০ জন |
| ২০ | " | ২৯ | " | " | " | " | ১০ জন |
| ০ | " | ১৯ | " | " | " | " | ১ জন |

ধরা যাক, মোট ৮০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত আছে। এই ফল যে খুব একটা সন্তোষজনক নয়—একথা মন্তব্যে বলতেই পারেন। তারা যে টিউশন পড়েও এই ফল করেছে তা তাদের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন। পরক্ষণে বুঝতে না পেরে কজন শিক্ষার্থী শিক্ষকমশাই-এর কাছে শ্রেণিকক্ষে জানতে চেয়েছে তা জেনে দেখলে সেক্ষেত্রেও হয়তো দু-একজন হাত তুলবে। এই সময় শিক্ষার্থীদের বলা যেতেই পারে— তোমাদের শ্রেণিতে যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকমশাই থাকতেও তাঁর কাছ থেকে না জেনে অন্যত্র ছুটছ। আবার ছুটেও এই ফল করেছ। তোমরা যে পথ ধরেছো সে পথ সঠিক নয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে তোমরা সবই উত্তর পাবে, অথচ, অন্যত্র ছুটছো, এখন তোমরাই ঠিক করো তোমাদের করণীয় কী।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার ১২৪টি বিদ্যালয়ে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে সর্বত্রই এই ফল। পরিদর্শনকালে এই পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে অত্যন্ত ভালো সাড়া পাওয়া গেছে এবং তার চিত্রও এই সমীক্ষকের কাছে সংগৃহীত আছে, যা আগামীদিনে প্রকাশ করলে পরিদর্শনজগতে নতুন একটা পথের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে আশা করা যেতে পারে।

# পরিদর্শনের টুকিটাকি

১। এক একজন পরিদর্শক এক একজন বড়ো মাপের শিল্পী।

২। পরিদর্শন একটি শিল্প।

৩। পরিদর্শন খবরদারি নয়, সহযোগিতার সোপান।

৪। পরিদর্শক শিক্ষক কুলের বন্ধু, শিক্ষার্থীর অভিভাবক এবং অভিভাবককুলের মনের মানুষ।

৫। পরিদর্শক আদর্শ, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা এবং সময়ানুবর্তিতার প্রতীক।

৬। পরিদর্শক শিক্ষার্থীদের মানুষ হওয়ার পথ-প্রদর্শক।

৭। পরিদর্শক যেমন শিক্ষাদরদি, শিক্ষার্থীদরদি, শিক্ষকদরদি তেমনি সর্বোপরি মানবদরদি।

## গ. রূপায়ণ

# শিক্ষা ঃ পুরোনো চিন্তা নতুন রূপে

অগ্রগতির মূল সোপান হল শিক্ষা। এই শিক্ষার ধরন-ধারণ ও মান বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিরূপিত হয়। কোন পরিবেশে কীভাবে শিক্ষাকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলা যায় তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে শিক্ষাবিদদের মধ্যে গবেষণার অন্ত নেই। আমাদের দেশেও অনেক অনেক শিক্ষাবিদ তথা মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের মত ও পথকে প্রতিষ্ঠা করতে বিভিন্ন সময়ে নানান শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন মত ও আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার পরিকাঠামো তৈরি করার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। শিক্ষাকে আরও গণমুখী ও সার্বজনীন করে তোলার পিছনে আমাদের রাজ্যও পিছিয়ে নেই। সবার মত ও আদর্শকে সম্মান দিয়ে একটি নিরপেক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মানুষ করে তোলে।

এখন দেখা যাক এই শিক্ষা কী? শিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপণ নিয়েও নানান চিন্তানায়ক তথা শিক্ষাবিদ বা শিক্ষা গবেষক নানান কথা বলেছেন। তাঁদের মতগুলিকে বিশ্লেষণ করলে এবং বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নিলে পাওয়া যায়— প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যে যার যা নিজস্বতা আছে তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটানোর পথ প্রস্তুতই হল শিক্ষা। এ তো গেল সার্বজনীন ব্যাপার। প্রাকৃতিক বিষয়। একটি মনুষ্যেতর প্রাণীও প্রাকৃতিক নিয়মে শিক্ষালাভ করে এবং কখনো কখনো মানুষ তাদের নিজেদের প্রয়োজনে ওই প্রাণীদের শিক্ষা দিয়ে নিজেদের কাজে লাগায়। কিন্তু, মানুষের ক্ষেত্রে শিক্ষার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্তর্নিহিত নিজ সত্তার সঙ্গে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানোই হল প্রকৃত শিক্ষা।

এই শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে তর্ক বিতর্কের শেষ নেই। কেউ বলে এটা সম্ভব, কেউ বলে এটা সম্ভব নয়। মাঝখানে নষ্ট হয় জীবনের মহামূল্যবান সময়। তাই, তর্কাতর্কি ও আইনি কচকচানির মধ্যে না গিয়ে কীভাবে শিক্ষাদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যায় আমরা তা নিয়ে ভাবতে পারি। সবার আগে স্বামী বিবেকানন্দের একটি কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। তিনি বলেছেন 'Be and make'। 'হও এবং তৈরি করো।' আগে নিজেকে তৈরি হতে হবে। যার অভাবই হল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একটি বড়ো বাধা। এখন শিক্ষাতত্ত্বের কচকচানির মধ্যে না গিয়ে কীভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং বাস্তবে করা গেছে তা তুলে ধরা প্রয়োজন। অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে—বলা সহজ, করা কঠিন। কিন্তু, বাস্তবে যা সম্ভব হয়েছে তার উদাহরণ দিয়ে তুলে ধরলে এক ইতিবাচক পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের প্রাচীন গুরুকুলের আশ্রমের শিক্ষা আজ পরিবর্তিত হতে হতে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত নানাভাবে বিভক্ত হয়েছে। কোথাও আবাসিক কোথাও বা মুক্ত বিদ্যালয়। শিক্ষক থেকে অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী থেকে শিক্ষামন্ত্রী পর্যন্ত

প্রত্যেকেই এই ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রত্যেকের লক্ষ্য এক। কর্ম ভিন্ন ভিন্ন। একটি মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় হল তিন থেকে আঠারো বছর বয়স পার হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। এই সময় শিক্ষার ভিত তৈরি হয়। পরে তা ভিন্নমুখী হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে। তাই এই আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পথ ও ধরন-ধারণ নিয়ে যে প্রচেষ্টা বাস্তবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে তা তুলে ধরলেই আলোচনার পক্ষে একটা ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি ব্যক্তিকেই প্রথমে ভাবতে হবে এদের জন্য কিছু করার একটা দায়িত্ব আমার ওপর আছে। দেখিনা, চেষ্টা করে কিছু করতে পারি কিনা। এই প্রচেষ্টা থাকলেই কিছু করা সম্ভব, যার দিকে অসংখ্য শিক্ষার্থী তাকিয়ে আছে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের স্থানীয় চাহিদাকে লক্ষ করে শিক্ষার পথনির্দেশ করা হয়। যেখানে যেভাবেই হোক না কেন শিক্ষা শৈশব থেকেই শুরু। প্রাক্ প্রাথমিক স্তরের শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলি তার প্রমাণ। যেখানে তিন থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের সম্পূর্ণ খেলার মাধ্যমে শিক্ষার ভিত তৈরি করা হয়। তারপরই শুরু হয় প্রাথমিক শিক্ষা। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে নিম্নরূপ মাত্রায় শিক্ষার্থীদের পাওয়া যায়।

| | | |
|---|---|---|
| ১) | লেখাপড়া, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় ভালো | ৫ শতাংশ |
| ২) | কেবলমাত্র লেখাপড়ায় ভালো | ১৫ শতাংশ |
| ৩) | কেবলমাত্র খেলাধুলায় ভালো | ২০ শতাংশ |
| ৪) | কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক চর্চায় ভালো | ১৫ শতাংশ |
| ৫) | লেখাপড়ায় ও খেলাধুলায় ভালো | ৫ শতাংশ |
| ৬) | লেখাপড়ায় ও সাংস্কৃতিক চর্চায় ভালো | ১৫ শতাংশ |
| ৭) | সাংস্কৃতিক চর্চা ও খেলাধুলায় ভালো | ৫ শতাংশ |
| ৮) | কোনোটিতেই ভালো নয় | ২০ শতাংশ |

একই বিদ্যালয়ে একই শ্রেণিতে এই আটটি পর্যায়ের শিক্ষার্থী আছে। এই সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য নানান উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক ঘাটতি থাকায় হয়তো অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তবে কিছু যে করা যায় সে বিষয়ে নিশ্চিত। প্রাথমিক স্তরে লেখাপড়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। পাশাপাশি খেলাধুলারও ব্যবস্থা আছে। ঠিক তেমনি, সাংস্কৃতিক চর্চার বিকাশ ঘটানোরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে সরকারি কোনো নির্দেশ না থাকলেও একজন পরিদর্শক হিসেবে অনেক কিছুই করা যায়।

১৯৮৪ সালে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক পদে হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়াপশ্চিমচক্রে নিযুক্ত থেকে এবং জাঙ্গিপাড়া চক্রের দায়িত্বে থেকে একইসঙ্গে পুরো থানাতে কীভাবে এই প্রতিবেদক কর্তৃক সাংস্কৃতিক চেতনা বৃদ্ধির সফল চেষ্টা করা হয়েছিল তা তুলে ধরা প্রয়োজন।

প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের জন্য বিদ্যালয় স্তর, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর, চক্রস্তর এবং শেষে প্রদর্শনীমূলক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন করার জন্য চক্রস্তরে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক কমিটি গঠন করার পর সেই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি সাংস্কৃতিক

পাঠ্যসূচি তৈরি করে প্রতি বিদ্যালয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাদের যোগ্যতামতো বিষয়ে অনুশীলন চালানোর জন্য দেওয়া হয়েছিল। বর্ষব্যাপী অনুশীলনের পর ওই পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিনে প্রতিটি বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি ক-বিভাগ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি খ-বিভাগ এর জন্য পৃথকভাবে নাচ, গান, আবৃত্তি, আলোচনা, নাটক, ছবি আঁকা, সুন্দর করে লেখা প্রভৃতির বিষয়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীদের নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের প্রতিবিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়দের নিয়ে চক্রস্তরে এবং চক্রস্তরের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়দের নিয়ে থানা পর্যায়ে। প্রতিটি বিভাগের প্রথম স্থানাধিকারীদের নিয়ে প্রদর্শনীমূলক অনুষ্ঠান রাজ্যবাসীর দৃষ্টি আর্কষণ করেছিল। প্রতিটি পর্যায়ের অনুষ্ঠান সফল করে তুলতে বিদ্যালয়ের পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির আর্থিক সহযোগিতা ও পরামর্শ দান নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। প্রদর্শনীমূলক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছিল কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায়। সেদিনের সেই উৎসাহ ও সাফল্য শিক্ষার ইতিহাসে নতুন পথের সূচনা করেছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রের সৌজন্যে সেই ছবি এখনও সমুজ্জ্বল।

আরও পরে এই ধারা বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর চক্রে এই প্রতিবেদক কর্তৃক অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রূপে ১৯৯৩ সালে প্রাথমিক স্তরে যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা অনুরূপভাবে করা হয়েছিল তার সুফল জাঙ্গিপাড়া থানার মতো বিষ্ণুপুর থানার মানুষ এখন উপভোগ করছেন।

বর্তমানে বিষ্ণুপুর মহকুমার মাধ্যমিক স্তরে চলছে তারই প্রতিফলন। ১৯৯৯সালের জানুয়ারি মাস থেকে প্রতিটি মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ে সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক রূপে এই প্রতিবেদক কর্তৃক যে অবিরতভাবে গবেষণামূলক পরিদর্শন কর্মসূচি চলছে তাতে টিফিনের বিরতির পর শিক্ষার্থীবৃন্দের পরিচালনায় এবং অংশগ্রহণে তাৎক্ষণিকভাবে পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংস্কৃতি চর্চাকে শিক্ষার্থীচিত্তে এবং জনমানসে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে অভাবনীয় শিল্পপ্রতিভা আছে তা প্রকাশের অপেক্ষায় ঠিক যেন 'বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়/ কোথায় কারার দ্বার'—এর মতো অবস্থা। এই দ্বারোদ্ঘাটন করে দেওয়াই হল একজন শিক্ষাসচেতন মানুষের কর্তব্য। প্রয়োজন শুধু নিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ এবং সদিচ্ছা। সারা বিশ্ব সেই অপেক্ষাতেই আছে।

# পরিদর্শকের দৃষ্টিতে মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ সমস্যা ও সমাধান সূত্র

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার সঠিক রূপায়ণে শিক্ষা বিভাগ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূমিকা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে সার্বিক উন্নয়নের সঠিক চিন্তা ভাবনাও করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও এখনও হাজারো সমস্যা বিদ্যালয় শিক্ষাকে সঠিক ধারায় চলতে বাধা দিয়ে চলেছে। বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শন করে লব্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে নিজ উদ্যোগে রূপরেখা তৈরি করে কীভাবে বর্তমান পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেও মাধ্যমিক শিক্ষাকে সঠিকভাবে রূপায়িত করা যায় তার যুক্তিনির্ভর আলোচনা তুলে ধরা হল।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমাটি কর্মক্ষেত্র হওয়ায় এই মহকুমার ৩২টি নিম্ন-মাধ্যমিক, ৫৭টি মাধ্যমিক এবং ৩৫টি উচ্চ মাধ্যমিক মোট ১২৪টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিকে একাধিকবার পরিদর্শন করা সম্ভব হয়েছে এবং উক্ত বিদ্যালয়গুলির সমস্যা জেনে পরীক্ষামূলকভাবে তা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করে এরই মধ্যে শতকরা প্রায় একশো ভাগই সুফল পাওয়া গেছে। এখন দেখা যাক কখন এবং কীভাবে তা সম্ভবপর হয়েছে।

**কীভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হচ্ছে—**

প্রথম পর্যায় ঃ

১। পরিদর্শন সূচি অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়কে চিঠি দিয়ে পরিদর্শনের দিন-ক্ষণ আগেই জানিয়ে দিয়ে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্যদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

২। বিদ্যালয়ের শ্রেণি ও বিভাগ সংখ্যা অনুযায়ী দলগতভাবে ২ জন বা ৩ জন পরিদর্শককে নিয়ে 'পরিদর্শক দল' গঠন করে বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়েছে।

৩। প্রতিটি বিদ্যালয়েই প্রার্থনা সভা থেকে শুরু করে বিদ্যালয় ছুটির পর পর্যন্ত প্রায় ৫ ঘন্টারও বেশি সময় উপস্থিত থেকে পরিদর্শন করা হয়েছে।

৪। প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থাকার ফলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে পরিচিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

৫। প্রতিটি শ্রেণি পরিদর্শন করে শিক্ষক-শিক্ষিকার পাঠদান পদ্ধতি অনুধাবন করা হয়েছে এবং উক্ত বিষয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর দক্ষতা কী রকম তা শ্রেণিকক্ষে তুলে ধরা হয়েছে।

৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কী কী সমস্যা আছে এবং ব্যক্তিগত কী কী অসুবিধে আছে তা সরাসরি জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

৭। কোন কোন শ্রেণির খেলাধুলার বিষয়টিও খেলার মাঠে গিয়ে দেখা হয়েছে।

৮। টিফিনের বিরতির সময় শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির যৌথ সভায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা খুঁজে বের করে তা দূরীকরণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৯। পঞ্চম পিরিয়ড থেকে ছুটির পর পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়ে তাতে শিক্ষার্থীর সাংস্কৃতিক নৈপুণ্য, অনুষ্ঠান পরিচালনা করার দক্ষতা, শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা লক্ষ করা হয়েছে এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য টিফিনের সময় আয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মী ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির যৌথসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি ওই অনুষ্ঠানেই সমস্ত শিক্ষার্থীকে একযোগে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

**দ্বিতীয় পর্যায় ঃ**

১। পরিদর্শন সূচি অনুযায়ী আকস্মিকভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হচ্ছে।

২। বিগত পরিদর্শনের সুপারিশ ও পরামর্শ কতটা কার্যকর হয়েছে তা দেখে পুনরায় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

৩। এছাড়াও প্রথমবারের মতো বাকি পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হচ্ছে।

**শিক্ষাবিষয়ক প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি কী কী ঃ**

১। প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থেকে দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থাকছে না, অনেকেই দেরিতে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হচ্ছে।

২। অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থনা সভায় শ্রেণি বা বিভাগ অনুযায়ী সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে ছোটো থেকে বড়ো দাঁড়াচ্ছে না, বরং এলোমেলো ও বিশৃঙ্খলভাবে দাঁড়াচ্ছে।

৩। জাতীয় সংগীত সমস্বরে গাইছে না, এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা ৫২ সেকেন্ড-এর বেশি বা কম সময়েও গাইছে।

৪। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বা শিক্ষাকর্মীদের কেউ কেউ প্রার্থনাসভায় নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকছেন না।

৫। প্রার্থনাসভার পর এলোমেলোভাবে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সঙ্গে কোনো কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে যায়।

৬। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের যত্ন করে না এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকারাও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন না, ফলে, সরকারি পাঠ্যপুস্তক ভীষণভাবে নষ্ট হচ্ছে।

৭। মহকুমার প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণি বা বিভাগ পরিদর্শন করা সম্ভব হয়েছে এবং প্রতিটি উপস্থিত শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে তাদের সমস্যা ও দক্ষতা পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের পাঠদানপর্ব পর্যবেক্ষণ করে উক্ত বিষয়ে বিগত পরীক্ষার ফলাফল নিম্নরূপভাবে বোর্ডে লিখে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। যে চিত্র পাওয়া গেছে তা শতকরা

হিসেবে দেখানো হল। এই চিত্র কমবেশি প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই একরকম। বোর্ডে ছকটি তৈরি করে যাদের ঐ স্থানে নম্বর আছে তাদের দাঁড়াতে বলা হয়েছে। তাদের সংখ্যা সংগৃহীত হলে তাদের বসতে বলে অপর দশকে নম্বর থাকা শিক্ষার্থীদের দাঁড়াতে বলে সেই চিত্র সংগৃহীত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক—শিক্ষকমশাই দশম শ্রেণিতে 'গণিত'-এর ক্লাস নিচ্ছেন, ৯০-১০০ এর মধ্যে এই বিষয়টিতে ক'জন নম্বর পেয়েছে জানতে চাওয়া হলে—কেউ দাঁড়াল না, অর্থাৎ কেউ উক্ত নম্বর পায়নি। এইভাবে পুরো চিত্রটি ছক-এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। বিষয় গণিত শ্রেণি ঃ-দশম, মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ঃ-১২০ উপস্থিত ঃ-১০০ জন

বিগত অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ঃ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৯০ | থেকে | ১০০ | এর | মধ্যে | নম্বর | পেয়েছে | ০ জন |
| ৮০ | " | ৮৯ | " | " | " | " | ১ জন |
| ৭০ | " | ৭৯ | " | " | " | " | ২ জন |
| ৬০ | " | ৬৯ | " | " | " | " | ৫ জন |
| ৫০ | " | ৫৯ | " | " | " | " | ১০ জন |
| ৪০ | " | ৪৯ | " | " | " | " | ১৩ জন |
| ৩০ | " | ৩৯ | " | " | " | " | ৩০ জন |
| ২০ | " | ২৯ | " | " | " | " | ২০ জন |
| ০ | " | ১৯ | " | " | " | " | ১৯ জন |
| | | | | | | মোট | ১০০ জন |

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের পরীক্ষার এইরকম খারাপ ফলাফলের যা ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে তা হল—

১) বাড়িতে কাজের চাপ।

২) অনেকেরই অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ।

৩) প্রাইভেট টিউশন ঠিকমতো পাওয়া যায় নি।

৪) কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে ঠিকমতো পড়াশোনা হচ্ছে না বলেও ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছে।

এই শ্রেণিতে কতজন প্রাইভেট টিউশন পড়ে জানতে চেয়ে জানা গেছে ৯৮ জন। প্রতিটি বিদ্যালয়েরই প্রায় ৯৮ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাইভেট টিউশন পড়ে । শিক্ষার্থীদের বলা হয়েছে অনেকেই ঠিকমতো বুঝতে পারেনি তাই লিখতে পারেনি এবং নম্বরও পায়নি। কতজন শিক্ষার্থী শিক্ষকমশাই-এর কাছে শ্রেণিকক্ষে জানতে চেয়েছে তাদের দাঁড়াতে বলা হলে একজনকেও পাওয়া গেল না। কেননা, তারা টিউশন থেকেই জেনে নেয়। তার ফল বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে টিউশন পড়াটা নিছক 'ফ্যামিলি স্ট্যাটাস' দেখানোর জন্যই। বিদ্যালয়ে যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন, তাঁদের কাছ থেকে জেনে নিলেই যথেষ্ট হত। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় শিক্ষার্থীরা তা করছে না, তাই ফল এইরকম। যাদের বাড়িতে

কাজ করতে হয় তাদের ভোরবেলা উঠে দু-ঘন্টা করে পড়ারসময় করে নিলে ভালো ফল হবে উদাহরণ দিয়ে এই পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি বিদ্যালয়েই শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও পরিচালন সমিতির সঙ্গে যৌথসভায় মিলিত হয়ে যে যে সমস্যাগুলি জানা গেছে তা নিম্নরূপ ঃ

১। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অনিয়মিত উপস্থিতি।

২। টিফিনের বিরতির সময় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের অনুমতি ব্যতিরেকেই বাড়ি চলে যাওয়া।

৩। যেহেতু অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার কোনো গুরুত্ব নেই তাই এই পরীক্ষায় আদৌ গুরুত্ব না দেওয়া।

৪। ইচ্ছাকৃতভাবে অরুচিকর পোশাক পরে বিদ্যালয়ে আসা।

৫। প্রার্থনা সভায় উপস্থিত না হয়ে একেবারে সরাসরি ক্লাস চলাকালীন উপস্থিত হওয়া।

৬। পরীক্ষার একমাস আগে থেকে বিদ্যালয়ে না এসে বাড়িতে প্রাইভেট টিউশন পড়া।

৭। পঞ্চমশ্রেণির শিক্ষার্থীরা সরকারি পাঠ্যপুস্তকগুলির যত্ন করে না।

৮। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা পুজোর ছুটির পর আর বিদ্যালয়ে ক্লাস করতে আসে না।

৯। পঞ্চম শ্রেণিতে যেসকল শিক্ষার্থী ভর্তি হয় তাদের অনেকেই বাংলা লিখতে এবং পড়তে পারে না।

১০। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে নানান অরুচিকর মন্তব্য লিখে শিক্ষার পরিবেশ দূষিত করে।

১১। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে ঠিকমতো পড়াশোনা হচ্ছে না বলেও পরিচালন সমিতি অভিযোগ করেছেন।

১২। বিভিন্ন শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর 'হারিয়ে যাওয়া'র ঘটনাও উদ্বেগজনক। এ বিষয়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ে সমীক্ষা চালিয়ে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপ ঃ-

বিষ্ণুপুর মহকুমার চিত্র ঃ-

মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে কতজন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল এবং কতজন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তা দেখা যাক—

শিক্ষাচক্র ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০০-২০০১

| শিক্ষাবর্ষ | শ্রেণি | বিষ্ণুপুর মহকুমার মোট নতুন শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ১৯৯৫-১৯৯৬ | ৫ম | ১০৯৮৯ |
| ১৯৯৬-১৯৯৭ | ৬ষ্ঠ | ১১০৯ |
| ১৯৯৭-৯৮ | ৭ম | ২১০ |
| ১৯৯৮-৯৯ | ৮ম | ২২৩ |
| ১৯৯৯-২০০০ | ৯ম | ৯২০ |
| ২০০০-২০০১ | ১০ম | ২৪ |
| মোট ভর্তি হওয়া নতুন শিক্ষার্থী | | ১৩৪৭৫ |
| ২০০১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে | | ৫৯৬৫ |
| ছটি শিক্ষাবর্ষে হারিয়ে গেছে | | ৭৫১০ |
| হারিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীর শতকরা হিসাব | | ৫৫.৭৩ |

শিক্ষাচক্র ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০০১-২০০২

| শিক্ষাবর্ষ | শ্রেণি | বিষ্ণুপুর মহকুমার মোট নতুন শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ১৯৯৬-১৯৯৭ | ৫ম | ১১৯৯২ |
| ১৯৯৭-১৯৯৮ | ৬ষ্ঠ | ১১২১ |
| ১৯৯৮-৯৯ | ৭ম | ২০৯ |
| ১৯৯৯-২০০০ | ৮ম | ২৬৩ |
| ২০০০-২০০১ | ৯ম | ১০০৬ |
| ২০০১-২০০২ | ১০ম | ৩৭ |
| মোট ভর্তি হওয়া নতুন শিক্ষার্থী | | ১৪৬২৮ |
| ২০০২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে | | ৬৩৩৩ |
| ছটি শিক্ষাবর্ষে হারিয়ে গেছে | | ৮২৯৫ |
| হারিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীর শতকরা হিসাব | | ৫৬.৭০ |

শিক্ষাচক্র ১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০০২-২০০৩

| শিক্ষাবর্ষ | শ্রেণি | বিষ্ণুপুর মহকুমার মোট নতুন শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ১৯৯৭-১৯৯৮ | ৫ম | ১২২১৫ |
| ১৯৯৮-১৯৯৯ | ৬ষ্ঠ | ১০৮১ |
| ১৯৯৯-২০০০ | ৭ম | ২৫৯ |
| ২০০০-২০০১ | ৮ম | ২৪৭ |
| ২০০১-২০০২ | ৯ম | ৮৭৯ |
| ২০০২-২০০৩ | ১০ম | ২ |
| মোট ভর্তি হওয়া নতুন শিক্ষার্থী | | ১৪৬৮৩ |
| ২০০৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে | | ৬১৩৭ |
| ছটি শিক্ষাবর্ষে হারিয়ে গেছে | | ৮৫৪৬ |
| হারিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীর শতকরা হিসাব | | ৫৮.২০ |

শিক্ষাচক্র ১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০০৩-২০০৪

| শিক্ষাবর্ষ | শ্রেণি | বিষ্ণুপুর মহকুমার মোট নতুন শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ১৯৯৮-১৯৯৯ | ৫ম | ১১৭৩৬ |
| ১৯৯৯-২০০০ | ৬ষ্ঠ | ১১২০ |
| ২০০০-২০০১ | ৭ম | ১৬৭ |
| ২০০১-২০০২ | ৮ম | ২২০ |
| ২০০২-২০০৩ | ৯ম | ৮৭২ |
| ২০০৩-২০০৪ | ১০ম | ৮ |
| মোট ভর্তি হওয়া নতুন শিক্ষার্থী | | ১৪১২৩ |
| ২০০৪সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে | | ৬৩৩১ |
| ছটি শিক্ষাবর্ষে হারিয়ে গেছে | | ৭৭৯২ |
| হারিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীর শতকরা হিসাব | | ৫৫.১৭ |

**কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ** যেহেতু সমস্যাগুলি কেবলমাত্র একটি বিদ্যালয়েরই নয় সমস্ত বিদ্যালয়েরই সমস্যা সেহেতু প্রতিটি বিদ্যালয়েই যাতে একযোগে কোনো গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় সে জন্য বিদ্যালয়গুচ্ছ গঠন করা হয়েছে। বিষ্ণুপুর মহকুমায় ৬টি থানায় ৬টি ব্লক এবং ২টি পুরসভা আছে। এই ৬টি ব্লকে ৮টি এবং ২টি পুরসভায় ২টি মোট ১০টি বিদ্যালয়গুচ্ছ গঠন করা হয়েছে।

**কীভাবে বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠন করা হয়েছে—**

প্রথমে মহকুমার প্রতিটি বিদ্যালয়েরই প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে ২০০০ সালের ৮ জানুয়ারি শনিবার দুপুব ১২ টায় বিষ্ণুপুর কৃত্তিবাস মুখার্জি উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি সভা আহ্বান করে সেখানে বিদ্যালয়গুচ্ছ গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভার মুখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের মাননীয় উপশিক্ষা অধিকর্তা (প্রশাসন) পূর্ণানন্দ প্রধান মহাশয়। এরপর বিভিন্ন দিনে প্রতিটি থানায় একদিন করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল সম্পাদক, স্টাফ কাউন্সিল সম্পাদক ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদকদের আহ্বান জানিয়ে প্রতিটি থানায় এক বা একাধিক বিদ্যালয়গুচ্ছ গঠন করা হয়েছে। তাতে উক্ত পদাধিকারী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করে বাকিদের সাধারণ সদস্য রাখা হয়েছে। এছাড়াও মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক বা তাঁর কার্যালয়ের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শককে বিভাগীয় সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুর মহকুমার বিদ্যালয়গুচ্ছগুলি হল ঃ (১) বিষ্ণুপুর পুরসভা বিদ্যালয়গুচ্ছ (২) বিষ্ণুপুর ব্লক উত্তর বিদ্যালয়গুচ্ছ, (৩) বিষ্ণুপুর ব্লক দক্ষিণ বিদ্যালয়গুচ্ছ, (৪) সোনামুখী পুরসভা বিদ্যালয়গুচ্ছ, (৫) সোনামুখী ব্লক বিদ্যালয়গুচ্ছ, (৬) জয়পুর ব্লক বিদ্যালয়গুচ্ছ, (৭) কোতুলপুর ব্লক বিদ্যালয়গুচ্ছ, (৮) পাত্রসায়ের ব্লক বিদ্যালয়গুচ্ছ, (৯) ইন্দাস পূর্ব বিদ্যালয়গুচ্ছ, (১০) ইন্দাস পশ্চিম বিদ্যালয় গুচ্ছ।

প্রতিটি বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে প্রাপ্ত তথ্যগুলি বিশদভাবে বিদ্যালয়গুচ্ছের সভায় আলোচনা করে সর্বসম্মতভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার সঠিক মান উন্নয়নের জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

১। প্রার্থনা সভায় প্রত্যেকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীগণও প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থেকে সভা পরিচালনা করবেন।

২। জাতীয় সংগীত এলোমেলোভাবে গাওয়া হত, তা নির্দিষ্ট সময়সীমা ৫২ সেকেন্ডেই গাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩। শ্রেণি বা বিভাগ অনুযায়ী পৃথকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রার্থনা সভায় সামনের থেকে পিছনের দিকে ছোটো থেকে বড়ো এইভাবে লাইন দিয়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে সামনে এসে দাঁড়িয়ে সকলের সামনে কিছু বলার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে সেজন্য প্রার্থনা সভাতেই প্রতিদিন বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী বাঙালি মনীষীদের যেমন রাজা রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখদের রচনা একদিন পঞ্চম/সপ্তম/নবম/একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অপর দিন ষষ্ঠ/অষ্টম/দশম/দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা পাঠ করবে। এর জন্য মোট সর্বাধিক ২ মিনিট সময় ব্যয় করা হবে।

৫। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নিজস্ব ইউনিফর্ম প্রবর্তন করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ইউনিফর্ম পরে বিদ্যালয়ে আসা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৬। পঞ্চম শ্রেণিতে কর্মশিক্ষা নেই। তাই, 'কর্মশিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান' শীর্ষক একটি ১০০ নম্বরের বিষয় অন্তর্ভুক্তি করে নিম্নরূপভাবে নম্বর বণ্টন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিয়মিত উপস্থিতি ২০, পাঠ্যপুস্তকের প্রতি যত্ন ২০, ইউনিফর্ম ২০, ভালো ব্যবহার ২০, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ১০, খেলাধুলায় অংশগ্রহণ ১০,

৭। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত কর্মশিক্ষার নম্বরগুলিকে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির স্বার্থে নিম্নরূপভাবে প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। কর্মশিক্ষা ৩০, উপস্থিতি ১০, বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন রাখা ১০, শারীর শিক্ষা ২০, ইউনিফর্ম ১০, ভালো ব্যবহার ১০, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ১০।

৮। বছরে দুটি পরীক্ষা হয়। প্রথম বা অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৪০ শতাংশ এবং দ্বিতীয় বা বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৬০ শতাংশ নিয়ে চূড়ান্ত ফল তৈরি করা হচ্ছে।

৯। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পুজোর ছুটির পর বিদ্যালয় না আসার প্রথা ভাঙতে ও বিদ্যালয় আসা সুনিশ্চিত করতে বাধ্যতামূলকভাবে ফ্রি কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১০। প্রতি তিন মাস অন্তর অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর তালিকা তৈরি করে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভায় পেশ করে উক্ত শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করে তাদের বিদ্যালয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১১। পঞ্চম শ্রেণির পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্ন নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১২। প্রতি শনিবার দুপুর ১২ টা থেকে ২ টো পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে শ্রেণিভিত্তিক অভিভাবকদের বিদ্যালয়ে আহ্বান করে তাঁদের শিক্ষার্থীদের সমস্যা এবং বিদ্যালয়ের সমস্যা নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৩। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যাতে পরবর্তী বছরের জন্য কমপক্ষে ৪০ শতাংশ পুরনো বই সংগ্রহ করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

১৪। প্রথম পিরিয়ডে এবং শেষ পিরিয়ডে উপস্থিতি গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে উপস্থিতির জন্য নম্বর প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। যদিও নির্দেশ আছে নবম-দশম শ্রেণির

শিক্ষার্থীরা শতকরা ৭০ দিন উপস্থিত না থাকলে পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবে না। তবু অভ্যাস গড়ে তুলতে প্রত্যেককেই নম্বরের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

১৫। শিক্ষার্থীদের অনিয়মিত বাইরে যাওয়া বন্ধ করতে দ্বিতীয় পিরিয়ডের পর ১০ মিনিট বিরতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

১৬। বিদ্যালয়গুচ্ছের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ে খো-খো, কাবাডি, ফুটবল এবং যোগব্যায়ামের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ক্রিকেট খেলায় কোনোরকম গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না ।

১৭। মাঝে মাঝে এক একটি বিদ্যালয়গুচ্ছের এলাকাধীন বিদ্যালয়গুলির বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

১৮। এক একটি বিদ্যালয়গুচ্ছের নিজস্ব পরিকাঠামোতেই প্রশ্নপত্র তৈরি করে একই প্রশ্নে সমস্ত বিদ্যালয়ে অর্ধবার্ষিক এবং বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।

১৯। একটি শিক্ষাবর্ষে ২০০ টি শিক্ষাদিবসকে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করার জন্য রাখার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

২০। বর্তমান প্রস্তাবিত পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিকে কার্যকরী করতে বাংলায় নতুন প্রগতিপত্র তৈরি করে তাতে নম্বর তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২১। যাতে নম্বরের শতকরা হিসেব করতে অসুবিধে না হয় তার জন্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে রেডিরেকর্নার প্রদান করা হয়েছে।

২২। প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তী, ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস এবং ২৩ জানুয়ারি নেতাজি জন্মদিবস সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

২৩। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস এবং ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে প্রত্যেকের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

২৪। বিদ্যালয়গুলিতে মাসিক দেওয়াল পত্রিকা এবং আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী বছরে একবার অথবা দুবছরে একবার অবশ্যই মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশ করা হবে।

২৫। যেসকল শিক্ষার্থীকে সকালে বিকেলে বাড়িতে কাজ করতে হয় তাদের ভোরবেলা উঠে ২ ঘন্টা করে পড়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বিষ্ণুপুর মহকুমার মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে 'বিদ্যালয়গুচ্ছ' গঠন করে মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতির সার্থক রূপায়ণের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তাতে প্রায় ১০০ শতাংশ সুফল পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়গুচ্ছ গঠনের নির্দেশ জারি করে এ বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব দিলে শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হবেই একথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়।

# শিক্ষকমশাইরা যখন সাহায্যকারী

সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে শিক্ষাদান বিষয়ে প্রতিনিয়ত গবেষণা চলছে। বহু শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে এবং সুপারিশের ভিত্তিতে বিভিন্ন পথ অনুসৃত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও শিক্ষার জন্য অপরিমেয় অর্থ ব্যয় করে চলেছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলা, সমাজের উপযোগী করে তোলা এবং নিরক্ষরতার অবসান ঘটানোই এর অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন।

সরকারের শিক্ষাবিভাগ থেকে পাঠ্য তালিকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। সেইমতো বইপত্রও রচিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পাঠ্য বই-এর তালিকাও তৈরি করে শিক্ষার্থীর হাতে যথাসময়ে অর্থাৎ শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার আগেই দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা তা হাতে পেয়েই পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করে নেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত বই এবং পঞ্চম শ্রেণির ক্ষেত্রে কিছু কিছু বই বিনামূল্যে সরকারি খরচায় শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা নতুন শ্রেণির বই নিয়ে সেই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করে থাকে—কবে মে মাসের ২ তারিখ আসবে—যেদিন নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠদান কাজ শুরু হবে—যেদিন নতুন বইপড়ার সুযোগ হবে।

এখন একটি প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের করা যেতে পারে—হাতে নতুন বই পাওয়ার পর তারা কী করে? উত্তর আসবে—মলাট দিয়ে যত্ন করে পড়ার উপযুক্ত করে রেখে দেয়। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, কী উচিত ছিল? নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর প্রথম কাজের দিন অর্থাৎ ২ মে তারিখে নিশ্চয়ই পাঠ্য বই-এর শেষ অধ্যায়টি, শেষ গল্প বা কবিতাটি, অঙ্কের ক্ষেত্রে শেষ প্রশ্নমালার অঙ্কগুলি শুরু হবে না। শুরু হবে পাঠ্যতালিকার প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই। শিক্ষার্থীর নিশ্চয় উচিত ছিল প্রথম দিনের জন্য প্রতিটি পাঠ্যবই-এর প্রথম অংশ পড়ে আয়ত্ত করার চেষ্টা করা। বুঝতে নাও পারতে পারে এবং না-পারাই স্বাভাবিক। কিন্তু, চেষ্টা করে কজন? আলোচকের পক্ষ থেকে বিষ্ণুপুর মহকুমার ১২৪টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে শতকরা ১০ জন শিক্ষার্থী প্রথম দিনের আগে পাঠ্য বই-এর পাতা উল্টে পাল্টে পড়ার চেষ্টা করে। বাকি শতকরা ৯০ জন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে নতুন শ্রেণিতে প্রথম দিনটির অপেক্ষায় থাকে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা কবে পাঠদান করবেন সেই অপেক্ষায় থাকে বা প্রাইভেট টিউটরের অপেক্ষায় থাকে। ঠিক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভাবতে হবে—একজন শিক্ষার্থীর কী উচিত ছিল; একজন সচেতন অভিভাবকের কী উচিত ছিল এবং একজন শিক্ষক-শিক্ষিকার কী করণীয় ছিল। আজ তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টাই তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। তার উচিত হাতে পাঠ্য বই আসার পরই প্রথম দিনে বিদ্যালয়ে যা পড়া বা আলোচনা হবে তা আগে থেকে বার বার পড়ে আয়ত্ত করার চেষ্টা করা। হয়তো সব ঠিকঠাক বুঝতে পারবে না। ভুল হবে—হোক। কিন্তু, চেষ্টা করতে হবে। অভিভাবকদেরও উচিত তাঁদের ছেলেমেয়েরা বই হাতে পেয়ে কারও সাহায্য না নিয়ে নিজ উদ্যোগে পড়ছে কিনা তা লক্ষ করে তাদের পড়তে উৎসাহিত করা। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উচিত শিক্ষার্থীদের আগে থেকেই সচেতন করে দেওয়া—যে তারা যেন হাতে পাঠ্য বই আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমদিকের অংশগুলি নিজ উদ্যোগে পড়ে আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। এই উদ্যোগ সবার আগে প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়—শতকরা ৯০ জনের ক্ষেত্রেই নেই। তাই, ওই সংখ্যক শিক্ষার্থীরা বই-এর পাতা না উল্টে প্রথম দিনটির জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকে। এইভাবে চলতে থাকায় শিক্ষার্থীদের উদ্যম ও আগ্রহ নষ্ট হচ্ছে, সময় নষ্ট হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষাক্ষেত্রে থাকবে শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা ও জিজ্ঞাসু মন। শিক্ষক-শিক্ষিকারা পাঠ আয়ত্তীকরণে এবং জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টায় সাহায্য করবেন। জিজ্ঞাসু মনের সামনে প্রকৃত উত্তর তুলে ধরবেন। শিক্ষক সমাজকে যতটা না শিক্ষাদাতা বলা যায় তার থেকে বেশি বলা যায় সাহায্যকারী। তাই,প্রচলিত ধারণা বদলে দিয়ে বলা যায়—শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ে পড়াতে আসেন না, আসেন শিক্ষার্থীর পাঠগ্রহণে সাহায্য করতে। যেদিন শিক্ষার্থীরা বুঝতে শিখবে—শিক্ষক-শিক্ষিকার কাজই হল পাঠে সাহায্য করা, মূল কাজটি শিক্ষার্থীর—সেদিনই হবে সঠিক শিক্ষাগ্রহণ এবং পঠনপাঠনের সঠিক মূল্যায়ন। এই বিচার বুদ্ধিরই আজ বড়ো প্রয়োজন।

# শিক্ষার্থী জীবন ও প্রাইভেট টিউশন

শিক্ষা নিয়ে যেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষ নেই সেখানে 'প্রাইভেট টিউশন' ব্যবস্থাটা শিক্ষা ও প্রগতির পথে যেভাবে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে তা নিয়ে কিছু চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন। প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আজ আতঙ্কিত। যদি এই হারে 'প্রাইভেট টিউশন'ব্যবসাকেন্দ্রিক হয়ে সংক্রামক ব্যাধির মতো বেড়ে চলে এবং তার গতি অব্যাহত থাকে, তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থাটা পুরোপুরিভাবে ভেঙে পড়বে। মাত্র কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে গড়ে ওঠা এই রমরমা ব্যবসাটা মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে আঘাত হানার পর শিক্ষার্থীর স্বচ্ছন্দ আনন্দে কুঠারাঘাত করছে। শিক্ষার্থীরা ঠিক ছিপে গাঁথা মাছের মতো হয়ে গেছে। সমস্যায় পড়েন অভিভাবকেরা। শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রাউভেট টিউশন পড়ানো আংশিকভাবে বন্ধ হলেও প্রথাটি উঠে যায়নি। বরং বেকার ছেলেমেয়েরা এই ব্যবসাটিকে তাদের রুজিরোজগারের প্রধান উৎস হিসেবে দেখতে শুরু করে। বিদ্যালয় চলাকালীন টিউটোরিয়াল হোম খুলে রেখে শিক্ষার্থীদের যেতে বাধ্য করাচ্ছে।

বর্তমানে, প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকেই প্রাইভেট টিউশন। একটা ফ্যাশান। কে কত বেশি এবং ভালো প্রাইভেট টিউটর রাখতে পারেন চলেছে তার দারুণ প্রতিযোগিতা। কিন্তু, এই শিক্ষিত অভিভাবকেরা একটু সচেতন হলে এই ফ্যাশানটা পাল্টে দিতে পারতেন।

বিদ্যালয় তাহলে আছে কেন? এক একটা ক্লাসের জন্য যে সময় বরাদ্দ থাকে তারই আনুপাতিক হারে সিলেবাস রচিত এবং সিলেবাসের ওপর ভিত্তি করেই সময় নির্দিষ্ট করা থাকে। অর্থাৎ সিলেবাস এবং পঠন পাঠনের সময় পরস্পরের পরিপূরক। প্রাইভেট টিউশন পড়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের তৈরি করবে 'সিলেবাস কমিটি' একথা চিন্তাই করেননি। যে কোনো শ্রেণির পাঠক্রমের ক্ষেত্রে সেই শ্রেণির জন্য বর্তমানে যে সময় নির্দিষ্ট আছে তা-ই যথেষ্ট। প্রয়োজন সচেতনতার এবং সদ্ব্যবহার করার।

কিন্তু, অভিভাবকেরা একটা ফ্যাশন প্রতিযোগিতায় নেমে তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ চিন্তাধারাকে পঙ্গু করে দিচ্ছেন। ভাবতে পারছেন না যে কী ভীষণ ক্ষতি করছেন তাঁরা। এক্ষেত্রে, বর্তমানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদেরই উচিত শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট টিউশন পড়া থেকে বিরত করা। প্রাইভেট টিউশন না পড়ে যদি শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় শিক্ষার ওপর বিশেষভাবে জোর দেয় তাহলে যে অনেক ভালো ফল হবে তা তাদেরই বোঝাতে হবে।

আসলে বর্তমানে পাশাপাশি দুটো বিদ্যালয় চলছে। একদিকে সরকার স্বীকৃত বিদ্যালয়, অপরদিকে টিউটোরিয়াল হোম। একজন শিক্ষার্থীর জন্য সময় কিন্তু নির্দিষ্ট। এই বিদ্যালয়

এবং টিউটোরিয়াল হোম-এ পড়াশোনা হচ্ছে পৃথকভাবে। সমীক্ষায় দেখা গেছে অনেক আগে সিলেবাস শেষ করার জন্যে প্রাইভেট টিউটররা উঠে পড়ে লাগেন। তাঁরা ভাবেন, বিদ্যালয়ে আদৌ পড়াশোনা হচ্ছে না, তাই অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের টিউটোরিয়াল হোম-এ পাঠিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন। সুতরাং, তাঁদের তো নির্দিষ্ট সময়ে সিলেবাস শেষ করে দিতেই হবে। গন্ডগোলটা এখানেই। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত ও যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাঠদান আদৌ গ্রহণ করছে না। তাদের অন্তরে গেঁথে গেছে 'প্রাইভেট টিউটররা' টাকার বিনিময়ে পড়াচ্ছেন, তাই তাঁদের দরদ থাকবেই। হচ্ছে উল্টো। কেবলমাত্র সিলেবাস শেষ-ই হচ্ছে, কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। তাহলে বিদ্যালয়ের জন্য এত খরচ করে প্রশিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে কেন? সাধারণভাবে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ বা কোনোরকমে গ্র্যাজুয়েট হওয়া ছেলেমেয়েদের দিয়েই তো শিক্ষাদানের কাজ চলত! বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যাচ্ছে না, গেলেও টিফিনের সময় বাড়ি চলে যাচ্ছে নানা অজুহাতে, কখনও বা কাউকে কিছু না জানিয়ে লুকিয়ে ক্লাস পালাচ্ছে। যারা থাকছে তারা সিলেবাস শেষ হয়ে গেছে বা ওই পড়াটা তার আগেই হয়ে গেছে, তাই সময় নষ্ট করে কী হবে! সে যেন 'সবজান্তা' হয়ে গেছে এমন ভাব দেখায়। যারা দুটো পড়াই করতে চায় তারা সময় পায় না। পাবে কী করে? দিনরাত মিলে তো ২৪ ঘন্টা সময়। যদি এইভাবে সময় বিন্যাস করা যায় তাহলে তার আর দ্বিতীয় স্থানে পড়ার সময় কোথায়? যেমন ঘুম-এর প্রয়োজন মানুষের ক্ষেত্রে সবার আগে। ঘুমানোর জন্য তাই ৬ ঘন্টা বরাদ্দ রাখতেই হয়। চারবার খাওয়ার জন্য মোট ২ ঘন্টা সময় প্রয়োজন হয়। খেলাধুলা, বেড়ানো সাংসারিক কাজ এবং গল্পগুজবের জন্য ২ ঘন্টা, ব্যক্তিগত কাজের জন্য ১ঘন্টা, বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য ১ ঘন্টা, বিদ্যালয়ে থাকার জন্য ১১ টা থেকে ৪ টে পর্যন্ত প্রয়োজন হবে ৫ ঘন্টা। সর্বশেষ বিদ্যালয়ের সাত পিরিয়ডের পড়া তৈরি করতে এবং লিখিত হোম টাস্ক করতে ৭ ঘন্টা সময় দিলে২৪ ঘন্টা পূরণ হয়ে যাচ্ছে। তার আর সময় কোথায়? কখন সে পাশাপাশি চলতে থাকা দ্বিতীয় বিদ্যালয় 'টিউটোরিয়াল হোম'-এ পড়তে যাবে এবং সেখানকার পৃথকভাবে পড়া তৈরি করবে! এইভাবেই এক একটি শিক্ষার্থীর সময় হারিয়ে যাচ্ছে সে যদি টিউটোরিয়াল হোম-এর জন্য এই সময় ব্যয় করে তাহলে সে স্কুল যাবে কখন বা সেখানকার পড়া তৈরি বা করবে কখন? তাই, পাশাপাশি দুটি বিদ্যালয় চলতে পারে না। এতে শিক্ষার্থীদের আদৌ লাভ হয় না। যারা, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী তারা বিদ্যালয়ের পাঠদান মনোযোগ সহকারে গ্রহণ করে এবং সেই পড়াটিই প্রাইভেট টিউটরের সহযোগিতায় একবার ঝালিয়ে নিয়ে এগিয়ে যায়। এদের ফল ভালোই হয়। অপরদিকে সাধারণ ও নিম্নমানের ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ করে না, শোনে না, তাদের টিউটোরিয়াল হোমেই সব হয়ে যাবে ভেবে সেখানেও অন্ধকার দেখে। সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে বিদ্যালয়ে যখন গণিতের ১ নং প্রশ্নমালার অঙ্ক হয় তখন টিউটোরিয়াল হোম-এ হয় কমপক্ষে ১০ বা ১১ নং প্রশ্নমালার অঙ্ক, কেননা সিলেবাস শেষ করে অভিভাবকের মনোরঞ্জন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা আদৌ শিখল কিনা তা দেখার মতো সময়

তাঁদের কী করে থাকবে? কেননা, ওই একই সময়ে আরও অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরও তো শেখাতে হবে।

তাই, এই মুহূর্তে অভিভাবকদের ভাবতে হবে খুবই চিন্তা করে, বিচার- বিবেচনা করে দেখতে হবে। প্রাইভেট টিউশন রবীন্দ্রনাথের সময়ও ছিল, এখনও আছে , ভবিষ্যতেও থাকবে। একজন শিক্ষার্থীর বেশি শেখার বা জানার অধিকার আছেই। কিন্তু, তারা বেশি শিখছে কি? এই প্রশ্নই আজ ঘুরে ফিরে আসছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কী করা উচিত? উত্তরে, বলা যায় শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করতেই হবে, বিদ্যালয়ের পাঠগ্রহণের জন্য সময় ও মন দিতেই হবে এবং বাড়িতে গিয়ে নিজেকে অনুশীলন করতে হবে, তাতেও যদি কিছু অংশ বোধগম্য না হয় তখন তো প্রাউভেট টিউটরের সাহায্য চাওয়া যেতেই পারে। তবে, তার মানে এই নয় যে তাকে প্রাইভেট পড়তেই হবে। সে তো নিজের চেষ্টায় ওই না বুঝতে পারা বিষয়টি বিদ্যালয় শিক্ষকের কাছে শ্রেণিকক্ষেই পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারে। অন্যের সাহায্য নিতে হলে খেয়াল রাখতে হবে বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের পাঠটি যেন সে নিজের চেষ্টায় বা অন্যের সাহায্য নিয়ে প্রতিদিন তৈরি করে নিতে পারে। তাহলে তাকে আর প্রাইভেট টিউশন পড়তেই হবে না এবং জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল এমন মানসিকতার শিকার হতে হবে না। বিদ্যালয়ে পড়াশোনা হয় না বলে যে একটা মুখরোচক খবর প্রচারিত হয় তা একপ্রকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী মানুষের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা আলো থেকে অন্ধকারের দিকে ছুটে যায়। মনে রাখতে হবে, পাশাপাশি দুটো বিদ্যালয়ে একইসঙ্গে পড়াশোনা করা যায় না। দ্বিতীয় কোনো বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব মেনে নিতে হলে দেখতে হবে তা যেন বিদ্যালয়ের পরিপূরক হয়, বিকল্প বা প্রতিযোগী নয়।

# বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ প্রাইভেট টিউশনের প্রথম পাঠ

রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে আদৌ কিছু হচ্ছে না বলে একটা মুখরোচক কথা বহুল প্রচলিত আছে। আমরাও শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে বেশ রস আস্বাদন করি। কিন্তু, দুঃখের বিষয় কেউ প্রতিবাদ করি না বা প্রতিবাদ করার মতো রসদ সংগ্রহের চেষ্টা করি না। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন এবং সর্বকালীন করার জন্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ তথা শিক্ষাগবেষকদের চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে নতুন নতুন পথ আবিষ্কৃত এবং অনুসৃত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ভেতরের সুপ্ত প্রতিভাকে টেনেবের করে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। দু-একজন শিক্ষক -শিক্ষিকার নেতিবাচক মনোভাব বা দু-একটি বিদ্যালয়ের পিছিয়ে থাকা নীতি দিয়ে বিচার করলে তো এর সদুত্তর পাওয়া যাবে না। তাই, খুঁজতে হবে, দেখতে হবে। অপরদিকে, শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে গড়ে ওঠা বিদ্যালয়ের প্রায় সমান্তরাল বিকল্প বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোরও কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে হবে। তিন বছর বয়স অতিক্রম করলেই শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানো এবং সেই বিদ্যালয়ে গিয়ে তার শৈশব বিকিয়ে দিয়ে সেখানে ১৩ বছর বয়সি শিক্ষার্থীর পাঠক্রম চাপিয়ে দিয়ে তাকে কুঁজো করে দেওয়া হচ্ছে। সে কতটা নিতে পারছে তা দেখা হচ্ছে না। বই-এর পাশে বই, তার ওপরে বই, সঙ্গে ছবি আঁকার সরঞ্জাম দিয়ে তাকে আদর্শ ছাত্র হওয়ার মন্ত্রগুপ্তি পাঠ করানো হচ্ছে। এই মন্ত্র পাঠ করতে এসে তাকে নির্ভর করতে হয় মায়ের ওপর। মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম থাকলে বা হাতে সময় কম থাকলে প্রাইভেট টিউটরের ওপর। তিন বছরের যে শিশুটি মায়ের কোলে বসে দুধ খাবে, মায়ের আদর খাবে, সোহাগ লাভ করবে তাকে ব্যাগভর্তি বই-এর চাপে চেপে রেখে বড়ো করার এক অবৈজ্ঞানিক চেষ্টা চালানো হচ্ছে। শিক্ষার্থী হারাচ্ছে তার শৈশব। পাচ্ছে মায়ের কোলে বসে প্রাইভেট টিউশন পড়ার মন্ত্রগুপ্তি। হারাচ্ছে স্বাবলম্বন, পাচ্ছে পরনির্ভরতা। যার ফল পরবর্তীকালে মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলিতে আছড়ে পড়ছে। বিদ্যালয়ের পাঠদানের সঙ্গে যোগাযোগই থাকছে না অগণিত শিক্ষার্থীর। দক্ষ শিক্ষকের পাঠদান না গ্রহণ করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো প্রাইভেট টিউশন-কেন্দ্রে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ের পাঠের বিপরীত পাঠ গ্রহণ করছে। ব্যর্থ হচ্ছে বিদ্যালয় শিক্ষকের শ্রম, অপচয় হচ্ছে সরকারি অর্থ। সূত্রপাত তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিকল্প বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতেই। এমন কতকগুলি বিষয় ওই তিন বছরের শিশুদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, শিক্ষাদানের এমন অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে যাতে খুব কম বাবা-মা-ই যেন সেই শিশুকে সেই বিষয়ে তৈরি করে দিতে পারেন। পিতামাতার কম অভিজ্ঞতা বা কম সময়ের সদ্ব্যবহার করছেন ওই বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির

শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁরা ঠিক ম্যানেজ করে নিয়ে ওই ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট পড়াচ্ছেন। কোনো সরকারি নীতি ওদের স্পর্শ করতে পারছে না। যেখানে প্রতিদিনের পাঠ প্রতিদিনই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে আয়ত্ত করতে পারে তার প্রচেস্টা চালানো হচ্ছে সেখানে এইসকল বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো সুপরিকল্পিতভাবে প্রাইভেট টিউশনের বীজ পুঁতছে। শিক্ষার্থীরা হারাচ্ছে আত্মনির্ভরতা। হচ্ছে প্রাইভেট টিউশননির্ভর। অভিভাবকরা নতুনত্বের খোঁজে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু, ক্রমশ পিছিয়ে আসছে অগণিত শিশু। প্রয়োজন এখনই অভিভাবকদের সচেতন হওয়া। এই শ্রেণির শিশুদের মা-বাবাকে বিষয়টি ভেবে দেখতেই হবে । কেননা, প্রাইভেট টিউশনের অনাবশ্যক শুরু এই বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেই। বর্তমান, 'হাম দো হামারা দো'-র যুগে বাবা-মা ঠকে আর সংশোধন হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। অন্যকে বলতে গেলেই সে ভাবছে মিথ্যে বলে তাদের ক্ষতি করতে চাইছে। তাই সব বাবা মায়েরাই পতঙ্গ হয়ে আগুনের দিকে ছুটছেন। কেউ কেউ বা অন্ধ প্রতিযোগিতার মোহে। এতো সিলেবাস, এতো বেশি বই-এর কোনো প্রয়োজনই নেই। শৈশব অপহরণ না করে অনুগ্রহ করে শিশুদের একটু স্বাধীনভাবে বাঁচতে দিন, বড়ো হতে দিন, মানুষ হতে দিন।

## শিক্ষাকে তৃতীয় শক্তি গ্রাস করে চলেছে

মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল শিক্ষা। এই শিক্ষাকে নিয়ে তাই বিশ্বজুড়ে প্রতিনিয়ত চলছে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চলছে গবেষণা, নানান চিন্তাভাবনা। ভারতবর্ষ এমন কি পশ্চিমবঙ্গের মানুষজনও তার থেকে পিছিয়ে নেই। যা-ই চিন্তা-ভাবনা করা হোক না কেন যে শিক্ষার সফল রূপ মূলত দুটি শক্তির ওপর নির্ভরশীল, তা বর্তমানে একটি তৃতীয় শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ দুটি মূল শক্তির যৌথ উদ্যোগে যেখানে শিক্ষা সার্থকরূপ লাভ করতে পারে সেখানে অনাবশ্যকভাবে তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব, মাতামাতি এবং প্রথম দুটি শক্তির দুর্বলতার সুযোগে ক্ষমতা দখল ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবেশ পরিস্থিতিকে ওলট পালট করে দিচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষ বেকায়দায় পড়ছে। ইদানীং কিছুটা ভাবতে শুরু করেছে। সরকারি নীতি ও সাধারণ মানুষের চাহিদার পরিপন্থী এই তৃতীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা চলে যাওয়ায় বর্তমানে শিক্ষাবিদদের টনক নড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শিক্ষার অগ্রগতির সূচকটি তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে প্রথম শক্তিটি বড়োই নড়বড় করছে। দ্বিতীয় শক্তিকে কাজে না লাগানোর ফলে তা অকেজো হয়ে উঠছে। সবাই তৃতীয় শক্তি নির্ভরশীল হওয়ায় তার ভিত ক্রমশ মজবুত হচ্ছে। একটু বিশ্লেষণ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

এই তিনটি শক্তির প্রথম শক্তি হচ্ছে একজন শিক্ষার্থী। শিক্ষা গ্রহণের সমস্ত দায়দায়িত্বই তার। শিক্ষাবিভাগ থেকে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক এবং সময়সীমা নির্ধারণ করাআছে। নিযুক্ত করা আছে বিশাল সংখ্যক শিক্ষক বাহিনী। এছাড়াও আছে শিক্ষাবিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কর্মীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান। এই খুদে শিক্ষার্থীটিকে নিয়েই সবার ওঠা বসা, নড়ন চড়ন, গর্ব, অহংকার এমনকি খাওয়া-পরা, বেঁচে থাকা। তা সত্ত্বেও শিক্ষাকে তৃতীয় শক্তি গ্রাস করছে। চিন্তার বিষয় বৈ-কি!

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাবর্ষের শুরু মে মাস থেকে। হাতে বই পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন শিক্ষার্থীকে চিন্তাভাবনা করে নিতে হবে যে শিক্ষাগ্রহণে তারই মূল দায়িত্ব। তাই, হাতে বই পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাভাবনা করে নিতে হবে যে ২ রা মে থেকে তার পাঠ্য বিষয়ের যে অংশটির আলোচনা হবে তাতে কী আছে দেখা যাক। বার বার তাকে তা পড়ে আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে হবে। নিজে না পারলে বাড়ির কারও বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলোচনা করে তা বুঝে নিতে হবে। কেননা, শিক্ষাগ্রহণে উদ্যোগী হওয়ার দায়িত্ব একজন শিক্ষার্থীর। শিক্ষার্থীর এই নিজ উদ্যোগে পাঠ আয়ত্তকরণই হল শিক্ষার প্রথম ধাপ। প্রথম শক্তি হল শিক্ষার্থী।

একজন শিক্ষার্থী বার বার চেষ্টা করে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারল না। এবার তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে শিক্ষা পরিকাঠামোর দ্বিতীয় শক্তি। অনেকের ধারণা শিক্ষক মশাইরা পড়ান। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কথাটি ঠিক। কিন্তু, বাস্তব অন্য কথা বলে। শিক্ষকমশাইরা পড়ান না, সাহায্য করেন। একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর সাহায্যকারী। এই কথাটি আজ বিশেষ করে ভাবতে হবে। যে প্রচেষ্টা এতক্ষণ ধরে শিক্ষার্থীরা নিয়ে এসেছে তাতে দ্বিতীয় শক্তি হিসেবে শিক্ষকমশাইরা সাহায্য করেন। তাঁরা ধরেই নেন যে, শিক্ষার্থীরা বার বার পড়েছে, আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছে। হয়তো ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পারেনি। সেই আয়ত্ত করিয়ে দেওয়ায় দায়িত্ব শিক্ষক সমাজের। শিক্ষাগ্রহণের প্রথম পর্বে একজন শিক্ষার্থীকে তাই নিজেকে চেষ্টা করতেই হবে এবং এটাই পদ্ধতি। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজের শক্তির যোগান দিয়ে শিক্ষার্থীকে পুষ্ট করবেন শিক্ষক সমাজ। শিক্ষক সমাজ হলেন শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতির দ্বিতীয় শক্তি। এই পাঠদান প্রক্রিয়া প্রথম এবং দ্বিতীয় শক্তির মাধ্যমেই সুসম্পন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। বার বার প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থী আলোচ্য বিষয়টিকে আয়ত্ত করবে। তাই, শিক্ষার্থীকে অবশ্যই 'জিজ্ঞাসু' হতে হবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যার আধিক্য এখানে বড়ো কোনো সমস্যাই নয়। কেননা, শিক্ষার্থীর জানার আগ্রহ এবং শিক্ষকের দেবার আগ্রহ যখন এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয় তখন আর কোনো 'সমস্যা'-কে সমস্যা বলেই মনে হবে না। প্রয়োজন মনোনিবেশ। ওই শিক্ষার্থী ভিড়ে ঠাসা সিনেমা হলে গিয়ে অথবা যাত্রার প্যান্ডেলে গিয়ে তিন-চার ঘন্টা ধৈর্য ধরে বসে থাকার পর বাড়ি ফিরে পুরো বিষয়টি বন্ধু বা আত্মীয় পরিজনের কাছে উগরে দিতে পারে। এবং এটাই ঘটনা, তাহলে?

তাই, প্রথম শক্তি আগ্রহী এবং দ্বিতীয় শক্তি সক্রিয় হলে তবেই শিক্ষার অগ্রগতি সম্ভব। বাস্তব কিন্তু, অন্য কথা বলে। এখানে প্রত্যেকের অগোচরে কখন যে তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে তা বুঝতে পারা যায় না।

এই তৃতীয় শক্তির আবির্ভাবই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। যদি তৃতীয় শক্তির অস্তিত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতে হয় তাহলে দ্বিতীয় শক্তির জন্য এত অর্থব্যয় করে সরকারি কোশাগার শূন্য করার প্রয়োজনীয়তা কোথায়! এই কথাটিই আজ প্রত্যেকটি মানুষকে ভাবতে হবে।

শিক্ষার্থীদের অনেকেই প্রথম শক্তিকে কাজে লাগায় না। অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় থাকে। দ্বিতীয় শক্তিকেও কাজে লাগায় না। কেননা, তৃতীয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সে নাকি বিরাট সাফল্য লাভ করতে পারবে। তাই, বিদ্যালয়ে অনিয়মিত উপস্থিত হয়, নিজস্ব সময় খোঁজার চেষ্টা করে না। তৃতীয় শক্তি অর্থাৎ প্রাইভেট টিউটর কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেওয়া সময়সীমাকে ধ্যান-জ্ঞান মনে করে পড়তে যায়। সেখানেও কিছু হচ্ছে না। এ তথ্য কেবল একটি বিদ্যালয় থেকেই গৃহীত নয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সমীক্ষা চালিয়ে গৃহীত তথ্য বলে—অধিকাংশ বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই কিন্তু, ৩০ শতাংশ থেকে ৩৯ শতাংশের মধ্যে নম্বর পায়। ৮০ শতাংশ থেকে ৮৯ শতাংশ নম্বর বা তারও বেশি নম্বর পায় ১ শতাংশ থেকে ২ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী।

তাহলে ? না প্রাইভেট টিউশনেও কিছু হচ্ছে না। যতক্ষণ না একজন শিক্ষার্থী 'জিজ্ঞাসু' হয় ততক্ষণ কিছুই হবে না। একজন শিক্ষার্থী জিজ্ঞাসু হলে প্রথম ও দ্বিতীয় শক্তিতেই সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারবে। অথচ, শিক্ষার্থী সমাজ উল্টোপথে হাঁটছে। তারাও আবার উল্টোপথে হাঁটতে বাধ্য হচ্ছে। একজন অভিভাবক বর্তমানে তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে যতগুলি বিষয় আছে ততগুলির জন্যে একজন করে বা কোনো কোনো বিষয়ে একাধিক গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। অথচ, খোঁজ নেন না-যে তাঁর পুত্রকন্যা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় কিনা, বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকার কাছে কিছু জানতে চায় কিনা বা কোন পাঠ্য বিষয়ক প্রশ্ন করে তার উত্তর খোঁজার চেস্টা করে কিনা। প্রতিবেশীর পুত্রকন্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের থেকে বেশি গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে নিজের সামাজিক কৌলিন্য প্রকাশ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর সর্বনাশ ডেকে আনে। এখন নিজ উদ্যোগে বিষ্ণুপুর মহকুমার ১২৪টি উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর ওপর অনেকবার সমীক্ষা চালিয়ে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা তুলে ধরা হল। গৃহশিক্ষক-নির্ভর শিক্ষার্থীর সংখ্যা -৯৮শতাংশ।

বিগত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের চিত্র ঃ—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৯০%-১০০% | এর | মধ্যে | × | শতাংশ | শিক্ষার্থী |
| ৮০%-৮৯% | এর | মধ্যে | ১ | ” | ” |
| ৭০%-৭৯% | এর | মধ্যে | ২ | ” | ” |
| ৬০%-৬৯% | এর | মধ্যে | ৫ | ” | ” |
| ৫০%-৫৯% | এর | মধ্যে | ১০ | ” | ” |
| ৪০%-৪৯% | এর | মধ্যে | ১৩ | ” | ” |
| ৩০%-৩৯% | এর | মধ্যে | ৩০ | ” | ” |
| ২০%-২৯% | এর | মধ্যে | ২০ | ” | ” |
| ০%-১৯% | এর | মধ্যে | ১৯ | ” | ” |

গৃহ শিক্ষক নির্ভর হয়েও তাদের অগ্রগতির এই হাল। বিষয়টি ভাবনার উদ্রেক করছে নাকি?

অপরদিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও হতে হবে আরও উদার। নিছক চাকরি নয়, সেবার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এলে এবং পাঠদান পদ্ধতির ওপর নিয়ত গবেষণা করলে তাঁর শ্রম বিফল হবে না। সঠিকভাবে শিক্ষার্থীকে আকৃস্ট করতে পারলে সুফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। তাই, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে কোনো মতেই তৃতীয় শক্তিনির্ভর হতে দেওয়া উচিত নয়। যথেস্ট শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে আছেন। শুধু এই বিশাল মানব সম্পদকে সদ্ব্যবহার করিয়ে নেবার উদ্যোগ অভিভাবকদেরও নিতে হবে। অবশ্যই তাহলে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি প্রথম দুটি শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, তৃতীয় শক্তির প্রয়োজন হবে না।

# প্রাইভেট টিউশন ঃ একটি সমীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গো২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশন করার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা সরকারিভাবে জারি করা হয়েছে তাকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে বিতর্কের অন্ত নেই। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ যে এখনও প্রাইভেট টিউশনের পক্ষে সরব এমন কি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশজন বা কুড়িজন পরীক্ষার্থীর প্রায় সকলেই প্রাইভেট টিউশনের পক্ষে সওয়াল করেছেন। যাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের উৎসাহের অন্ত নেই, সেই 'প্রাইভেট টিউশন' প্রকৃতই কতখানি কাজে লাগছে এবং প্রকৃত চিত্রই বা কী তা খুঁজে বের করতেই একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমায় যে সকল শিক্ষার্থী প্রাউভেট টিউশন পড়েছিল এবং বাৎসরিক পরীক্ষা দিয়ে ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে পড়াশোনা করছে তাদের ওপরই এই সমীক্ষা চালানো হয়েছে। বিষ্ণুপুর মহকুমাটি এই সমীক্ষকের কর্মক্ষেত্র হওয়ায় সমীক্ষা চালানো সহজতর হয়েছে। মে ২০০২ থেকে আগস্ট ২০০২ পর্যন্ত সময়সীমায় বিষ্ণুপুর মহকুমার ছটি থানা এলাকায় নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক—বালক/বালিকা এবং সহপাঠক্রমিক বিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন শ্রেণির মাদ্রাসা পরিদর্শন করে প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীর সঙ্গো কথা বলে তাদের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করে প্রকৃত চিত্র উপস্থাপন করা হল। বিদ্যালয়গুলির মর্যাদার স্বার্থে নাম নিজ কার্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে কেবলমাত্র পরিদর্শনের তারিখ, থানা, শ্রেণি, উপস্থিত শিক্ষার্থী, কতজন টিউশন পড়েছে এবং বিগত পরীক্ষায় কতজন কী রকম নম্বর পেয়েছে তা তুলে ধরা হল। ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের নাম সমীক্ষকের কার্যালয়ে থাকছে, কোনোরকম প্রয়োজন অনুভূত হলে তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হবে।

সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে কোন থানায় কোন তারিখে কোন বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়েছে, তাতে কোন কোন শ্রেণিতে কতজন শিক্ষার্থীর মধ্যে কতজন 'প্রাইভেট টিউশন' পড়েছে এবং বিগত পরীক্ষায় এক একটি বিষয়ে কতজন ৮০-১০০, ৬০-৭৯, ৪০-৫৯, ২০-৩৯, ০-১৯ এর মধ্যে নম্বর পেয়েছে।

## ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের
## বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল এবং প্রাইভেট টিউশন চিত্র

| কোন থানার বিদ্যালয় | বর্তমান শ্রেণি | বিষয় | শিক্ষার্থী সংখ্যা | বিগত বছরে টিউশনপড়েছিল | কতজন শিক্ষার্থী কত নম্বর পেয়েছে | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ৮০ ↓ ১০০ | ৬০ ↓ ৭৯ | ৪০ ↓ ৫৯ | ২০ ↓ ৩৯ | ০ ↓ ১৯ |
| জয়পুর | ১০ম | গণিত | ২৯ | ২৯ | ২ | ৪ | ৫ | ১০ | ৮ |
| কোতুলপুর | ১০ম | গণিত | ৪৪ | ৪০ | ১ | ২ | ৩ | ১০ | ২৮ |
| পাত্রসায়ের | ৭ম | ভূগোল | ১৩ | ১২ | - | ১ | ৪ | ৮ | - |
| কোতুলপুর | ৭ম | গণিত | ৪৪ | ৪১ | ১ | ১ | ৬ | ১৩ | ২৩ |
| ঐ | ১০ম | বাংলা | ৪২ | ৪০ | - | ৪ | ৩৪ | ৪ | - |
| ঐ | ৯ম | গণিত | ৯৪ | ৯১ | ১ | ২ | ৬ | ৭৭ | ৮ |
| বিষ্ণুপুর | ৮ম | ইংরেজি | ৪৩ | ৪৩ | - | ৫ | ৮ | ২৯ | ১ |
| ইন্দাস | ৮ম | জী.বিঃ | ৪১ | ৪১ | - | ১ | ১৭ | ২৩ | - |
| পাত্রসায়ের | ১০ম | ইংরেজি | ৪৭ | ৪৭ | - | ১ | ৪ | ৪১ | ১ |
| জয়পুর | ৯ম | প.বিঃ | ৬৬ | ৬৬ | ৭ | ৪ | ৩২ | ২২ | ১ |
| বিষ্ণুপুর | ১০ম | ইংরেজি | ৩৭ | ৩৫ | - | - | ১ | ২৭ | ২৯ |
| জয়পুর | ১০ম | প.বিঃ | ৫৬ | ৫৬ | - | ৪ | ৭ | ৪২ | ৩ |
| ইন্দাস | ৮ম | ইতিহাস | ২০ | ১৪ | - | ১ | ২ | ৬ | ১১ |
| সোনামুখী | ৮ম | গণিত | ৪৯ | ৪৬ | ১ | ৪ | ৭ | ২০ | ১৭ |
| ঐ | ৭ম | গণিত | ৫৪ | ৫১ | ১ | ৫ | ২ | ১৬ | ৩০ |
| জয়পুর | ১০ম | গণিত | ৪৫ | ৪৫ | - | ২ | ৮ | ২৯ | ৬ |
| ঐ | ৮ম | জী. বিঃ | ২৭ | ২১ | - | ২ | ৮ | ১৭ | - |
| কোতুলপুর | ৭ম | গণিত | ৪৮ | ৪৮ | ৫ | ৯ | ৯ | ২৩ | ২ |
| বিষ্ণুপুর | ১০ম | গণিত | ৩০ | ৩০ | - | ৩ | ৫ | ২২ | - |
| জয়পুর | ১০ম | প.বিঃ | ৩৭ | ৩৭ | - | ১ | ৪ | ৩০ | ২ |
| পাত্রসায়ের | ৮ম | গণিত | ৩৩ | ৩২ | ২ | ৩ | ২ | ১৮ | ৮ |
| বিষ্ণুপুর | ১০ম | ইংরেজি | ৬৬ | ৬৪ | - | - | ২ | ২৭ | ৩৭ |
| জয়পুর | ১০ম | ইংরেজি | ৩৫ | ৩৫ | ১ | ৩ | ৯ | ২১ | ১ |
| ঐ | ১০ম | ইংরেজি | ৫৫ | ৫০ | - | ৪ | ১৪ | ৩৬ | ১ |
| বিষ্ণুপুর | ৮ম | প.বিঃ | ২২ | ২১ | - | ১ | ২ | ১৮ | ১ |
| পাত্রসায়ের | ১০ম | জী. বিঃ | ১৮ | ১৮ | - | ২ | ৯ | ৬ | ১ |
| ঐ | ৭ম | গণিত | ৩৬ | ৩৪ | ১ | - | ৩ | ৯ | ২৩ |
| ঐ | ৭ম | ভূগোল | ৪০ | ৩২ | ২ | ৩ | ৯ | ২৬ | - |
| কোতুলপুর | ১০ম | বাংলা | ৬৯ | ৬৯ | - | ৬ | ৫৬ | ৭ | - |

উপরিলিখিত সমীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা অতীব ভয়ঙ্কর। প্রাইভেট টিউটর হিসেবে শিক্ষক/শিক্ষিকা বা অশিক্ষক প্রাইভেট টিউটর কারা উপযুক্ত বা সার্থক এরকম জটিল ও সংবেদনশীল প্রশ্নেও যাচ্ছি না। কেননা, প্রাইভেট টিউশন কতজন পড়েছে এবং তারা কতখানি উপকৃত হয়েছে তাই বিচার্য বিষয়। বিষ্ণুপুর মহকুমার মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলির প্রত্যেকটিরই এই একই চিত্র। স্থানাভাবে কেবলমাত্র এক-একটি শ্রেণির একটি করে বিষয়ের চিত্র তুলে ধরা হল। ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার ফলাফলের এই চিত্র। যাঁরা শিক্ষার স্বার্থে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশন জরুরি বলে মনে করেন তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানানো যায় যে, বিগত শিক্ষাবর্ষেও যেহেতু শিক্ষক শিক্ষিকাদের ওপর প্রাইভেট টিউশন-এর বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না সেহেতু এই ফলাফলের অংশীদার তাঁরাও। আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করলে ফলের জন্য প্রকৃতপক্ষে যাঁরা দায়বদ্ধ হলেন তাঁরা হলেন—(১) শিক্ষার্থী, (২) বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, (৩) প্রাইভেট টিউটর ( প্রাইভেট টিউশনরত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ ), (৪) অভিভাবক।

এখন, প্রশ্ন এখনও যে প্রায় ৯০% শিক্ষার্থী গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ছে তাদের ফলাফল কেন এরকম ? যদি উত্তর আসে 'যা হয়েছে ভালো হয়েছে, গৃহ শিক্ষক না থাকলে আরও খারাপ হত' তাহলে মাসে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিদ্যালয়গুলি রাখার কী প্রয়োজন ? যদি বলে 'যা হবার তা বিদ্যালয়েই হয়েছে' তাহলে গৃহশিক্ষকের কাছে ছুটছে কেন ?

আরও গভীর অনুসন্ধানে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা আরও রোমাঞ্চকর ও হতাশা-ব্যঞ্জক।

**এখন দেখা যাক শিক্ষার্থীরা প্রাইভেট টিউশন পড়তে যাচ্ছে কেন ?**

(১) প্রাইভেট টিউশন না পড়লে কিছুই হবে না এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল হয়ে জাঁকিয়ে বসে আছে। তাই, শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগে থেকেই তারা প্রাইভেট টিউটর ঠিক করে নিয়েছে। "বিদ্যালয়ে কিছু হচ্ছে না এবং হবে না"—এই ভ্রান্ত ধারণাটাই প্রাইভেট টিউশন শুরুর প্রথম ধাপ।

(২) অনেক অভিভাবক তাঁদের পারিবারিক মর্যাদাবৃদ্ধি ও আর্থিক কৌলিন্য দেখানোর জন্য একাধিক প্রাইভেট টিউটর নিয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, প্রতিবেশীর সঙ্গে টেক্কা দিতেও একজন অভিভাবক তিনজন প্রাইভেট টিউটর নিয়োগ করলে অপরজন পাঁচজন নিয়োগ করে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন।

(৩) বর্তমানে মানুষ এত বেশি কর্মব্যস্ত ও আত্মসচেতন যে নিজের দুধের শিশুকে অন্যের হাতে রেখে বাইরে কাজে যেতে বাধ্য হয়। ঠিক তেমনি, নিজের পড়ুয়া শিশু বা কিশোর কিশোরীর খোঁজ নেওয়ার মতো সময়ও হয়ে ওঠে না। তাই, প্রাইভেট টিউটর নিয়োগ করে তাঁর ওপর সব দায়ভার ন্যস্ত করে নিজে নির্ঝঞ্ঝাট হতে চান। যা আদৌ সুফলপ্রদ হয় না।

(৪) অধিকাংশ শিক্ষার্থী নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারে না, তারা একটুও সচেষ্ট নয়। শৈশব থেকে পরনির্ভরশীলতা তাদের প্রাইভেট টিউশনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

(৫) বয়ঃসন্ধিকালের এই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী সহপাঠক্রমিক প্রাইভেট টিউশনে একটু বাড়তি আনন্দ খুঁজে পায়।

(৬) বিজ্ঞাপনের যুগে মিডিয়ার রমরমায় প্রাইভেট শিক্ষকের বা শিক্ষাকেন্দ্রের প্রচার শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে বিভ্রান্ত করে। তারা তা বিশ্বাস করে টিউশনের দিকে ছুটে যায়।

(৭) আত্মকেন্দ্রিকতার শিকার হয়ে যৌথপরিবার থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে নিজের সন্তানকে সবার থেকে ভালো করার লক্ষ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থেকে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যালয়ে থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে বাড়িতেই কোনো কোনো অভিভাবক তাঁর ছেলে মেয়েকে পৃথকভাবে পড়ানোর ব্যবস্থা করেন।

(৮) কোনো কোনো বিদ্যালয়ে কিছু কিছু নেতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন শিক্ষক/শিক্ষিকার অবহেলার শিকার হয়ে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রাইভেট টিউশন পড়তে বাধ্য হয়।

(৯) উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ক্ষেত্রে জয়েন্ট এন্ট্রাস প্রভৃতি পরীক্ষায় বসার জন্য তৈরি হতে প্রাইভেট টিউশন পড়তে অনেকেই বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক। তারা কেবলমাত্র প্রাকটিক্যাল করার জন্য বিদ্যালয়ে আসে।

(১০) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কিয়দংশ বিদ্যালয়ে পড়ানোর ওপর গুরুত্ব না দিয়ে প্রাইভেট টিউশনের মাধ্যমে অধিক রোজগারের জন্য সচেষ্ট হন। নিজ প্রাইভেট টিউশন কেন্দ্রে পড়াশোনা করলে বেশি নম্বর পাওয়া যাবে-এমন নিশ্চিত বাণী ও অভয় আশ্বাস তাঁদের টিউশন কেন্দ্রের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। বর্তমানে প্রাইভেট টিউশনে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকলেও বেকার পুত্র কন্যা বা গৃহকর্মরতা স্ত্রী অথবা নিকট আত্মীয়কে সামনে রেখে নিজে পুরোটাই সামাল দিয়ে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করছেন।

(১১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবহেলার শিকার বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী আছে যাদের ঘাটতি পূরণের জন্য প্রাইভেট টিউশন দিতে অভিভাবকরা বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু, ভিত আলগা থাকায় কোনো ফলই হচ্ছে না।

(১২) বেশ কিছু শিক্ষার্থীর আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় তারা বাড়িতে এমন কি অন্যের বাড়িতে শিশুশ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রে তারা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। তারাও ঘাটতি পূরণের জন্য প্রাইভেট টিউটরের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু, এখানেও বিশেষ সুবিধে করতে পারে না।

(১৩) বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হারে অসঙ্গতি আছে তাই, বিদ্যালয়ে পড়ানো যাচ্ছে না এমনই একটা বিভ্রান্তির প্রচার কিছু কিছু নেতিবাচক মনোভাবাপন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা করে থাকেন। তাই 'কিছু হচ্ছে না বা হবে না' ধরে নিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রাইভেট টিউশনের দিকে যায়।

(১৪) উক্ত শ্রেণিগুলিতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে জানা গেছে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে কোনো হোম টাস্ক বা বাড়ির কাজ দেওয়া হয় না। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কোনো পরামর্শ বা চাপও দেওয়া হয় না। তাই, স্কুলে কেবলমাত্র যাতায়াত এবং বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করা ছাড়া কিছু হচ্ছে না ধরে নিয়ে টিউশনের দিকে যায়। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষাবিজ্ঞান বহির্ভূতভাবে চেয়ারে বসে বসেই পড়ান এবং শেষের বেঞ্চের

শিক্ষর্থীরা কী করছে তা দেখার মতো মানসিকতা দেখান না। শিক্ষক শিক্ষিকাদের এই চিরস্থায়ী অভ্যাসটির জন্য শ্রেণিকক্ষে আকর্ষণীয় পাঠদান সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষার্থীরা বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে প্রাইভেট টিউশনের দিকে পা বাড়ায়।

(১৫) কিছু সংখ্যক মেধাবী ও আগ্রহী শিক্ষার্থী আছে যারা বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন আয়ত্ত করেও বাড়তি কিছু জ্ঞানলাভের জন্য প্রাইভেট টিউটর রাখে। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকের শীর্ষস্থানে থাকা ছাত্রছাত্রীরা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এদের সংখ্যা খুবই সীমিত।

**(গ) প্রাইভেট টিউশন কেন্দ্রের বর্তমান চিত্র কী ?**

(১) বর্তমানে প্রায় ৬০% প্রাইভেট টিউশন কেন্দ্র সকাল সন্ধ্যার পাশাপাশি বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে খোলা থাকে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে না গিয়ে বা টিফিনের সময় বিদ্যালয় থেকে চলে গিয়ে প্রাইভেট টিউশন কেন্দ্রে ভিড় জমায়। বিদ্যালয়গুলিতে এক্ষেত্রে কড়াকড়ি ভূমিকা গ্রহণ করা হয়নি।

(২) বিদ্যালয়ের পাঠদানের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে প্রাইভেট টিউটররা ত্বরান্বিত গতিতে সিলেবাস শেষ করেন। শিক্ষার্থীরা কতটা গ্রহণ করল বা না করল তা না দেখে সিলেবাস তাড়াতাড়ি শেষ করাই যেন এদের মূল লক্ষ্য।

(৩) একদিকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাঠদান, অপরদিকে প্রাইভেট টিউটরদের পৃথক পাঠদান এই দুটিকে পাশাপাশি রেখে যেহেতু নিজ অর্থব্যয়ে প্রাইভেট টিউটররা নিযুক্ত সেহেতু তাদের পাঠদানকেই বেদবাক্য মনে করে শিক্ষার্থীরা চলার চেষ্টা করে। কিন্তু দুটির কোনোটিই কাজে লাগে না।

(৪) অনেক ক্ষেত্রে একাধিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একই প্রাইভেট টিউশন কেন্দ্রে পড়ে, তাদের পুস্তকও বিভিন্ন লেখকের হয়। সমীক্ষায় এও দেখা গেছে, প্রাইভেট টিউশনে উক্ত বিদ্যালয়গুলির কোনোটিরই বই অনুসরণ না করে প্রাইভেট টিউটরদের কেউ কেউ অপর একটি বই কিনতে বলে সেই বইটি অনুসরণ করে পড়ান।

(৫) প্রাইভেট টিউশন কেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য যে সকল শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে তাদের সংবর্ধনা দিয়ে পুরস্কৃত করে নিজেদের টিউশন কেন্দ্রকে ভালো বলে চিহ্নিত করছে এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

(৬) প্রাইভেট টিউশন কেন্দ্রের অধিকাংশতেই সহশিক্ষার ব্যবস্থা রেখে কিছু বাড়তি শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে।

(৭) প্রাইভেট শিক্ষকদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার কোনো মাপকাঠি না থাকায় যে কেউ যেখানে সেখানে প্রাইভেট টিউশন শুরু করেছেন। ফলে শিক্ষার সামগ্রিক মান বলে কিছুই থাকছে না।

(৮) শিক্ষার্থীরা রাশি রাশি নোট সংগ্রহ করছে এবং তা জেরক্স মাইক্রোজেরক্স করিয়ে নিচ্ছে। ফলে, নিজস্ব চিন্তা ও বুদ্ধির বিকাশ হচ্ছে না।

(ঘ) বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের করণীয় কী?

(১) পঠন-পাঠনে ও শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেশি চিন্তাভাবনা করা ও সক্রিয় থাকা উচিত। বাস্তবে কিন্তু হচ্ছে না। অনেকেই নানান কাজে ব্যস্ত। প্রাইভেট টিউশন বন্ধ হলেও অনেকে বেনামে কাজ চালাচ্ছেন। অথচ, বিদ্যালয়ে পড়ানোর ক্ষেত্রে যত অজুহাত। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কিছুই হয়নি। তাই, ওই 'কিছু না জানা' শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমরা কী করব- এই মন্তব্য করে দায় এড়াতে চান। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বদল করে কিছু করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী না এলে শিক্ষকের অস্তিত্বই বিনষ্ট হবে।

(২) সময়ের স্বল্পতা, সুদীর্ঘ পাঠ্যসূচি বলে অনেকেই দায় এড়াতে চান। কিন্তু ২৮-৭-১৯৬৭ তারিখের ১৯৩৪/ই.ডি.এন/এস অনুযায়ী বিরতির সময় বাদে প্রতি সপ্তাহে ৩০ঘন্টা পঠন-পাঠনের জন্য রাখা আছে। বাস্তবে, প্রায় প্রতি বিদ্যালয়েই বিরতি ব্যতিরেকে মাত্র ২৫ ঘন্টা বরাদ্দ করা আছে। প্রতি সপ্তাহের ৬ দিন ৫ ঘন্টা সময় কাজে লাগাতে পারলে ২০০ টি পঠন পাঠনের দিনে কত ঘন্টা সময় বাঁচানো যেত তা অনেকেই ভাবতে পারেন না। আসলে শিক্ষক শিক্ষিকারা যা করছেন তাকে অর্জিত অধিকার ভেবে বসেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করলে সময়ের স্বল্পতা বলা যেত না।

(৩) অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন যাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেও শিক্ষকসুলভ মনোভাব নেই। তাই সবার আগে 'শিক্ষক' হতে হবে।

(৪) বিদ্যালয়ের পাঠদানকে আকর্ষণীয় না করতে পারলে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করা যাবে না। শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট না করলে শিক্ষকদের অস্তিত্বই থাকবে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষিকারা গেছেন, অথচ, শিক্ষোপকরণ তো দূরের কথা চক-ডাস্টার নিয়েও যান না। এদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলকে এবিষয়ে অধিক সচেতন হতে হবে।

(৫) নিয়মিত অভিভাবক সভা ডেকে শিক্ষার্থীদের ত্রুটি তুলে ধরতে হবে এবং অভিভাবকদের কাছে শিক্ষার্থীর পুরো চিত্র তুলে ধরে কীভাবে আরও ভালো করা যায় তার পরামর্শ দিতে হবে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে অভিভাবকদের নিবিড় যোগাযোগই শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

(৬) পরিবেশ কেউ সৃষ্টি করে দেবে না, বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নিজেকেই তৈরি করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই চিন্তা ভাবনাটা থাকা অত্যন্ত জরুরি।

(৭) বিদ্যালয়ে কিছু হচ্ছে না বলে যে একটা ভ্রান্ত ধারণা শিক্ষার্থীও অভিভাবকদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে তা দূর করতে হবে। যাতে বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে প্রত্যেকটি ক্লাস হয় তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৮) বিদ্যালয়ে দুটি মূল পরীক্ষা হয়। প্রথম বা অর্ধ-বাৎসরিক পরীক্ষার কোনো গুরুত্ব নেই এমন একটা ধারণা শিক্ষার্থীদের কাছে বদ্ধমূল হয়ে আছে। তাই, তারা চূড়ান্ত পরীক্ষাকেই

পরীক্ষা বলে মনে করে এবং গুরুত্ব দেয়। বিদ্যালয়ে প্রত্যেকটি পরীক্ষাকেই পরীক্ষা বলে মনে করতে হবে এবং গুরুত্ব দিতে প্রথম পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৪০ শতাংশ এবং দ্বিতীয় বা শেষ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৬০ শতাংশ নিয়ে চূড়ান্ত ফল তৈরির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাহলে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করা যাবে।

(৯) বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করতে বিভাগীয় নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য প্রথম পিরিয়ডের পাশাপাশি শেষ পিরিয়ডেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

**(ঙ) বিদ্যালয় পরিদর্শকের ভাবনা ঃ—**

'প্রাইভেট টিউশন' রোধে একজন বিদ্যালয় পরিদর্শকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের বাস্তব চিত্রটি তা একমাত্র বিদ্যালয় পরিদর্শকরাই বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের কাছে তুলে ধরতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষিকা ব্যতীত একমাত্র বিদ্যালয় পরিদর্শকরাই শ্রেণিকক্ষে গিয়ে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন, অন্যরা নন। তাই, পরিদর্শকদের অবশ্যই উদার এবং কিছু করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে।

(১) বিদ্যালয়গুলি নিয়মিত পরিদর্শন করা প্রয়োজন। প্রার্থনা সভা থেকে শুরু করে ছুটির সময় পর্যন্ত বিদ্যালয় পরিদর্শকের বিদ্যালয়ে থাকা অবশ্যই জরুরি। শ্রেণি পঠন-পাঠন এবং বিগত পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে কী হয়েছে, কী হওয়া উচিত ছিল তা তুলে ধরা দরকার।

(২) বিভাগীয় প্রতিনিধি হিসেবে নিয়মিত বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভায় উপস্থিত থেকে শিক্ষা ও প্রশাসন বিষয়ক পরামর্শ দিলে এবং বিভাগীয় মতামত প্রদান করলে পরিচালন সমিতির হাত শক্ত হবে এবং প্রত্যেক সদস্যই উৎসাহিত হবেন।

(৩) অভিভাবকদের বিদ্যালয়মুখী করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে বিদ্যালয়গুলিকে উৎসাহিত করতে হবে।

(৪) প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অভিভাবক সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করলে ভালো ফল হবে।

(৫) প্রত্যেকটি পরীক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এবিষয়ে পরিদর্শকবৃন্দ খোঁজ-খবর নিতে এবং পরামর্শ দিতে পারেন।

(৬) বিদ্যালয় পরিদর্শকদের উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা এবং বি.টি/বি.এড্ প্রভৃতি ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও তাদের পরিদর্শনের কাজে কম সময় দিয়ে অন্যান্য করণিকরা যে কাজ মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষার ডিগ্রি নিয়ে করেন সেই কাজ করানো হচ্ছে। ফলে পরিদর্শন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হচ্ছে'। পরিদর্শন ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটা মানে পুরোশিক্ষা ব্যবস্থাটি ভেঙে পড়া। তাই, সব কাজ ফেলে রেখে পরিদর্শনের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

বিদ্যালয় পরিদর্শন মানে খবরদারি নয়, বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করা। পরিদর্শন বিভাগকে অবহেলা করে বা ভুল বুঝে দূরে সরিয়ে রেখে বিদ্যালয়ে শিক্ষার উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়। পরিদর্শনপ্রক্রিয়া পূর্বেও ছিল, এখনও কোনোরকমে টিকে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই, পরিদর্শকদেরও নিজ কর্তব্য এবং মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে।

(৭) প্রতিটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে হবে। প্রত্যেকটি শ্রেণিতে যেতে হবে এবং প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর বিগত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর বোর্ডে লিখে তা বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে এবং বিগত পরীক্ষার পূর্বে প্রাইভেট টিউশন পড়েও এই ফল হয়েছে তা বোঝাতে হবে। বার বার বিদ্যালয়ে গিয়ে এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে অবশ্যই আলোচনা করা প্রয়োজন।

(৮) শিক্ষার পরিকাঠামো ধরে রাখতে এবং পরিবেশকে উন্নত করতে প্রতিটি থানায় বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠন করা প্রয়োজন। এতে বিদ্যালয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি হবে এবং সহমত হয়ে কাজ করার ফলে প্রত্যেকটি কাজ সঠিকভাবে রূপায়ণ করা যাবে।

**(চ) এই প্রতিবেদকের বাস্তব উপলব্ধি ঃ**

একজন পরিদর্শক হিসেবে দেখেছি অনেক কিছুই করার আছে। পরিদর্শনের পরিবেশ কেউ তৈরি করে দেবে না, নিজেকেই তৈরি করে নিতে হবে। বিষ্ণুপুর মহকুমার ১২৪টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ই প্রার্থনা সভা থেকে শুরু করে ছুটির সময় পর্যন্ত থেকে পরিদর্শন করে ঝিমিয়ে পড়া পরিদর্শন ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা গেছে এবং পরিদর্শন সম্বন্ধে প্রত্যেকের মনে একটা ইতিবাচক ধারণা জন্মেছে।

বিভিন্ন শ্রেণি পরিদর্শন করে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর বিগত পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে প্রাইভেট টিউশন না পড়েও যে ভালো ফল করা যায় তা বোঝানো সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়বার পরিদর্শনে গিয়ে যেটুকু পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে তা খুবই আশাব্যঞ্জক। বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠন করেও বিষ্ণুপুর মহকুমার শিক্ষার পরিবেশ অনেকখানি উন্নত করা সম্ভবপর হয়েছে। বর্তমান পরিসংখ্যানের চিত্রে অনেকখানি দুর্বলতা ধরা পড়লেও প্রথমবারের চিত্র ছিল আরও ক্ষীণ। বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিদর্শন এবং বিদ্যালয়গুচ্ছ গঠনের মাধ্যমে এই অগ্রগতিটুকু আনা সম্ভবপর হয়েছে এবং বেশ কিছু শিক্ষার্থীর গৃহশিক্ষক বন্ধ করে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোতেই শিক্ষাদান সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়েছে। সুতরাং, জোর দিয়ে বলা যায় কোনো কিছুকেই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে তার ইতিবাচক দিকটি খুঁজলে অবশ্যই শ্রম সার্থক হবে। আসুন না, আমরা সেই পথ খোঁজারই চেষ্টা করি।

# বিষ্ণুপুর মহকুমায় বিদ্যালয়গুচ্ছঃ গঠন থেকে উত্তরণ

শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। দীর্ঘ সমীক্ষার পর কমিশনের পক্ষ থেকে নানান সুপারিশও করা হয়েছে। বিদ্যালয়গুচ্ছ গঠনের মাধ্যমে শিক্ষাকে আরও ফলপ্রসূ করার কথাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের আলোচনায় ব্যক্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন মাননীয় পার্থ দে মহাশয় 'বিদ্যালয় গুচ্ছ' গঠনের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলিকে নিজ নিজ গণ্ডি থেকে বের হয়ে এসে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে এগিয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সর্বজনগ্রাহ্য একটি শক্তিশালী কার্যকরী সমিতির তত্ত্বাবধানে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উন্নতমানের শিক্ষা পরিকাঠামো আঞ্চলিকভাবে গঠনের প্রচেস্টা চালিয়েছিলেন। এন সি ই আর টি-র পক্ষ থেকে শিক্ষাসংক্রান্ত যে দলিল প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে শিক্ষার উন্নত পরিকাঠামোর জন্য 'বিদ্যালয়গুচ্ছ' গঠনের সুপারিশ করা হয়েছিল। পশ্চিবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে ১৯৮৮-৮৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় থানাভিত্তিক কর্মশালার আয়োজন করে তাতে এই মর্মে প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। কর্মশালায় দলগতভাবে পারস্পরিক আলোচনার সময় মাথা কাত করে প্রত্যেকেই এর প্রয়োজনীয়তার কথা লিখিতভাবে জানিয়ে গেলেও কর্মক্ষেত্রে এর সামান্যতম প্রয়োগ করতে কেউ কেউ পিছ-পা হলেন। এই কথাটি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাননীয় ডঃ হরপ্রাদ সমাদ্দার মহাশয় 'পর্ষদবার্তা'র নভেম্বর ২০০১ সংখ্যায় 'সভাপতির কলমে' বড়ো আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন 'আমাদের শিক্ষকেরা শুনেছি উদ্যোগ নিয়েছিলেন 'বিদ্যালয়গুচ্ছ' সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার মাধ্যমে পঠন-পাঠনের উৎকর্ষ বিধান, সুষ্ঠু শিক্ষার পরিমন্ডল সৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ উন্নত করতে। কিন্তু তাঁদের সেই উদ্যোগ আংশিক সফল হলেও পূর্ণতা পায়নি। সম্ভবত শিক্ষকদের সামগ্রিক সহযোগিতার অভাবে এই কাজ সমাধা করা যায় নি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং আমাদের এই কাজ করতেই হবে। তাই, আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। আমি প্রাক্তন সভাপতিদেরও অনুরোধ করেছি আমাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য। আশা করি, সকলের সহযোগিতায় এটি দ্রুত রূপায়ণ করা সম্ভব হবে।

বাস্তবে, কাজের লোকের সংখ্যা খুব কম। অনেকেই কোনোরকমে দিন অতিবাহিত করার লক্ষ্যে বিভোর। নতুন কিছু চিন্তাভাবনা করার মতো মানসিকতা এবং অবকাশ তাঁদের নেই। নিজের বিদ্যালয়টি এবং শ্রেণিকক্ষগুলি যে প্রকৃ তপক্ষে এক একটি বড়ো মাপের শিক্ষা গবেষণাগার একথা চিন্তায় আনার মতো শিক্ষক-শিক্ষিকার বড়ো অভাব। সর্বত্রই 'নেতিবাচক ধ্বনি'। এইরকম প্রতিকূল পরিবেশের মাঝে কিছু করার শপথ গ্রহণের মঞ্চ হল 'বিদ্যালয় গুচ্ছ'।

'বিদ্যালয় গুচ্ছ' গঠনের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিদর্শকদের ভূমিকাও কম নয়। কিন্তু, সেখানেও পর্যাপ্ত পরিদর্শকের অভাব। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক থাকাকালীন মাননীয় পূর্ণানন্দ প্রধান মহাশয় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় নিজ পদাধিকার বলে 'বিদ্যালয় গুচ্ছ' গঠন করেছিলেন। কিন্তু, তাও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের সহযোগিতার অভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কোথাও কোথাও আঞ্চলিকভাবে কোনোও কোনোও শিক্ষক সংগঠনের খাপছাড়া প্রচেষ্টায় দু-একটি বিষয়ে, বিশেষ করে 'প্রশ্নপত্র রচনা' এবং 'একই পাঠ্যপুস্তক' প্রতিটি বিদ্যালয়ে চালু করার মতো দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'বিদ্যালয় গুচ্ছ' গঠনের প্রচেষ্টা চালালেও নিরপেক্ষ মঞ্চের অভাবে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়কে একই ছত্রছায়ায় আনা যায়নি এবং বাস্তবে তা সম্ভবও নয়। এরজন্য চাই নিরপেক্ষ প্রশাসন। এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা বিভাগীয় আধিকারিকদের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণদানের সময় 'বিদালয় গুচ্ছ' গঠনের মাধ্যমে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা মহাশয় আয়োজিত ১৯৯৯ সালের ১৩-১৭ সেপ্টেম্বর সল্টলেকের 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট'-এ পাঁচদিনের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ শিবিরে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা করণের মাননীয় উপ-বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা (প্রশাসন) পূর্ণানন্দ প্রধান মহাশয় বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে কর্মক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে বাস্তবে রূপায়িত করার পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শকে নিছক প্রশাসনিক ফাইলে আবদ্ধ না রেখে বিষ্ণুপুর মহকুমায় ১১৮টি বিদ্যালয়ের ৯ থেকে ১৮ বছর বয়সি প্রায় দেড় লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য কিছু একটা করার দায়িত্ব এবং অধিকার সংশ্লিষ্ট সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের ওপর শিক্ষা বিভাগ থেকে দেওয়া আছে তা স্মরণ করে এবং একজন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে যে দায়বদ্ধতা আছে তা ভেবে 'কিছু একটা করার জন্য' বিদ্যালয় গুচ্ছকে হাতিয়ার করে এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার এই শপথ। এ বিষয়ে এই প্রতিবেদক কর্তৃক ওই সময়কার সহকর্মী অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকবৃন্দ ধ্রুবনারায়ণ বাগদি, বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও তরুণকুমার নন্দী-র সঙ্গে আলোচনা করে এটি একটি 'দলগত কাজ' বিবেচনা করে 'বিদ্যালয় গুচ্ছ' গঠনের কাজে হাত লাগানো হয়। ২০০০ সালের ৮ জানুয়ারি শনিবার দুপুর ১২টায় বিষ্ণুপর কৃত্তিবাস মুখার্জি উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে মহকুমার ১১৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান/ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক/ শিক্ষিকা এবং সেই সঙ্গে মহকুমার চারটি স্বীকৃত শিক্ষক সংগঠনের মহকুমা পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আহ্বান করে প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মাননীয় উপবিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা পূর্ণানন্দ প্রধান মহাশয় মুখ্য আলোচক ও পথ প্রদর্শক হিসেবে উপস্থিত থেকে 'বিদ্যালয় গুচ্ছ' গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং ওই সভাতেই মহকুমার ছটি থানাতেই পৃথকভাবে আঞ্চলিক বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিষ্ণুপুর মহকুমার ছটি থানা এলাকার মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলির প্রধান/ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক, স্টাফ কাউন্সিল সম্পাদক ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল সম্পাদক এবং ওই থানা এলাকার স্বীকৃত শিক্ষক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে বর্ধিত আকারের

সভা করে ওই সভাগুলিতেই থানাভিত্তিক আঞ্চলিক বিদ্যালয়গুচ্ছ গঠন এবং পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচন করা হয়। বিদ্যালয়গুলির প্রধান/ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি, একজনকে সম্পাদক এবং একজনকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে অন্যান্যদের সদস্য রাখা হয়। সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক বা ওই কার্যালয়ের যে কোনও একজন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শককে সদস্য হিসাবে মনোনীত করা হয়।

বিষ্ণুপুর মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক করণের পক্ষ থেকে জানুয়ারি ১৯৯৯ থেকে যে অবিরতভাবে রুটিনমাফিক গবেষণামূলক বিদ্যালয় পরিদর্শন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে তাতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থেকে, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং পঞ্চম পিরিয়ড থেকে ছুটির সময় পর্যন্ত প্রতিটি বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীদের দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাতে উপস্থিত থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা বিশ্লেষণ করে প্রতিটি আঞ্চলিক বিদ্যালয়গুচ্ছের সভায় সমস্যাগুলি এই আলোচকের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হলে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়েই সুন্দর শিক্ষা পরিকাঠামো রূপায়িত করতে সর্বসম্মতভাবে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়।

১। প্রার্থনা সভায় প্রত্যেকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থেকে সভা পরিচালনা করবেন।

২। জাতীয় সংগীত এলোমেলোভাবে না গেয়ে নির্দিষ্ট ৫২ সেকেন্ড সময়সীমার যাতে গাওয়া যায় তার জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

৩। শ্রেণি বা বিভাগ অনুযায়ী পৃথকভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা সারির সামনের দিক থেকে উচ্চতার ভিত্তিতে 'ছোটো থেকে বড়ো' এইভাবে শ্রেণিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে।

৪। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে সকলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে পারে তা অভ্যাস করাতে এবং মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য প্রার্থনা সভাতেই প্রতিদিন ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী একদিন পঞ্চম/সপ্তম/নবম/একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এবং পরের দিন ষষ্ঠ/অষ্টম/দশম/দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ বাঙালি মনীষীদের রচনা শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের তত্ত্বাবধানে একজন সর্বাধিক ৩০ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে পাঠযোগ্য রচনা পাঠ করবে।

৫। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের নিজস্ব ইউনিফর্ম প্রবর্তন করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ইউনিফর্ম পরে আসা বাধ্যতামূলক করা হবে।

৬। পঞ্চম শ্রেণিতে কর্মশিক্ষা নেই। অথচ, এরূপ একটি বহু উদ্দেশ্যসাধক বিষয় অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাই, 'কর্মশিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান' শীর্ষক একটি ১০০ নম্বরের বিষয় অর্ন্তভুক্ত করে নিম্নরূপভাবে নম্বর বন্টন করার ব্যবস্থা করা হবে। নিয়মিত উপস্থিতি - ২০, ইউনিফর্ম - ২০, ভালো ব্যবহার- ২০, পাঠ্যপুস্তকের যত্ন-২০, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি - ১০ এবং খেলাধুলায় অংশগ্রহণ - ১০।

৭। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত 'কর্মশিক্ষা' বিভাগের নম্বরগুলিকে নিম্নরূপভাবে প্রদান করা হবে। কর্মশিক্ষা-৩০, উপস্থিতি - ১০, বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন রাখা - ১০, শারীর

শিক্ষা- ২০, ইউনিফর্ম-১০, ভালো ব্যবহার-১০ এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে ১০ নম্বর প্রদান করা হবে।

৮। বছরে দুটি পরীক্ষা হয়। প্রথম বা অর্ধ বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের ৪০ শতাংশ এবং দ্বিতীয় বা বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের ৬০ শতাংশ নিয়ে চূড়ান্ত ফল তৈরি করা হবে।

৯। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পুজোর ছুটির পর বিদ্যালয় না আসার প্রথা ভাঙতে এবং বিদ্যালয় আসা সুনিশ্চিত করতে ফ্রি কোচিং -এর ব্যবস্থা করা হবে।

১০। প্রতি তিন মাস অন্তর অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর তালিকা তৈরি করে তা বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভায় পেশ করে উক্ত শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করে তাদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

১১। পঞ্চম শ্রেণির পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে পৃথকভাবে প্রথম দুমাসে তাদের জন্য একটি অতিরিক্ত পরিপূরক শিক্ষাক্রম চালু করে তাদের মূল স্রোতের উপযুক্ত করে তোলা হবে।

১২। প্রতি শনিবার দুপুর ১২ টা থেকে ২টো পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে শ্রেণিভিত্তিক অভিভাবকদের বিদ্যালয়ে আহ্বান করে তাদের নিজ নিজ শিক্ষার্থীদের সমস্যা এবং বিদ্যালয়ের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে উন্নতির পথ বের করা হবে। সময় সুযোগ মতো শিক্ষার্থীদের মায়েদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

১৩। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে যাতে পরবর্তী বছরে ব্যবহারের জন্য সমস্ত বই সংগ্রহ অবশ্যই করা যায় তা দেখা হবে এবং সংগৃহীত বইগুলির মধ্য থেকে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ বই যাতে পরবর্তীবছরে প্রদান করা সুনিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

১৪। প্রথম পিরিয়ডে এবং শেষ পিরিয়ডে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে উপস্থিতির জন্য নম্বর দেওয়া হবে।

১৫। শিক্ষার্থীদের অনিয়মিত বাইরে যাওয়া বন্ধ করতে দ্বিতীয় পিরিয়ডের পর প্রতি বিদ্যালয়েই ১০ মিনিট বিরতি দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

১৬। বিদ্যালয় গুচ্ছগুলির উদ্যোগে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সহ প্রতি বিদ্যালয়ে খো-খো, কাবাডি, ফুটবল এবং যোগব্যায়ামের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। তবে, বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ক্রিকেট খেলায় উৎসাহিত করা হবে না।

১৭। মাঝে মাঝে এক একটি বিদ্যালয় গুচ্ছের এলাকাধীন বিদ্যালয়গুলির বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হবে।

১৮। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়গুচ্ছের নিজস্ব পরিকাঠামোতেই প্রশ্নপত্র তৈরি করে একই প্রশ্নে সমস্ত বিদ্যালয়ে অর্ধবার্ষিক এবং বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। তবে, যে যে থানাগুলিতে ইতিমধ্যেই একই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে সেখানে ওই প্রশ্নপত্রকেই বিদ্যালয়গুচ্ছের প্রশ্নপত্র বলে গণ্য করা হবে।

১৯। একটি শিক্ষাবর্ষে ২০০ টি শিক্ষাদিবস শ্রেণি পঠন-পাঠনের জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে।

২০। বর্তমান প্রস্তাবিত পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিকে কার্যকর করতে বাংলায় নতুন প্রগতিপত্র তৈরি করে তাতে নম্বর তোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

২১। যাতে নম্বরের শতকরা হিসেব করতে অসুবিধে না হয় তার জন্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে 'রেডি রেকর্নার' প্রদান করা হবে।

২২। প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তী, ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস এবং ২৩ জানুয়ারি নেতাজি জন্ম-দিবস সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালনের ব্যবস্থা করা হবে এবং ওই তিনটি দিনকে বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত কার্যদিবস হিসেবে গণ্য করা হবে এবং নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুশীলন চালানো হবে।

২৩। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস এবং ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে প্রত্যেকের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৪। বিদ্যালয়গুলিতে মাসিক দেওয়াল পত্রিকা এবং আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী বছরে একবার অথবা দু'বছরে একবার মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশ করা হবে।

২৫। যে সকল শিক্ষার্থীকে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে সকালে বিকেলে নিজের বাড়িতে এমনকি অন্যের বাড়িতে কাজ করতে যেতে হয়, তাদের এবং অন্যান্যদেরও ভোরবেলা উঠে পড়া তৈরি করে নেবার পরামর্শ এবং উদাহরণ দিয়ে উৎসাহিত করা হবে।

২৬। নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার ফল এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ করে যাতে দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিন থেকেই দশম শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু করা যায় যে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২৭। প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি বিষয়ে যাতে লিখিত 'হোম টাস্ক' দেওয়া হয় এবং তা যাতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষাবিজ্ঞান সম্মতভাবে সংগ্রহ করেন এবং পরীক্ষা করে দেখে সংশোধিত খাতা ওই দিনই ফিরিয়ে দেন তা সুনিশ্চিত করা হবে।

২৮। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা যাতে পিছনের বেঞ্চ-এ প্রতিদিন না বসে তার জন্য প্রতিটি বেঞ্চ-এ বিভিন্ন মানের শিক্ষার্থীদের বসার তালিকা করে দিয়ে এবং ওই এক একটি বেঞ্চ-র শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে বেঞ্চ পরিবর্তন করে যাতে বসে তা সুনিশ্চিত করা হবে এবং এর তদারকির জন্য 'মনিটর' নির্বাচিত করা হবে।

২৯। যে বিদ্যালয়গুলিতে এখনই কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই এবং যা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিয়ে কোনোরকমই পূরণ করা যাবে না সেখানে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ে যদি ওই বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা থাকেন তাহলে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্মতি সাপেক্ষে সাময়িকভাবে এই অভাব পূরণের ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

৩০। বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট দূর করতে অভিভাবকদের নিকট থেকে অর্থসংগ্রহের বিষয়ে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করবে।

৩১। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীর সার্ভিস সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলি যাতে সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয় তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩২। বিদ্যালয়ের সমস্ত রেকর্ড যাতে সরকারি নির্দেশনামা অনুযায়ী রাখা হয় সে বিষয়ে নজর রাখা হবে।

৩৩। শিক্ষার্থীরা যাতে গৃহশিক্ষক নির্ভর না হয়ে বিদ্যালয়েই দৈনন্দিন পাঠ আয়ত্ত করতে পারে সে বিষয়ে প্রত্যেককে বিশেষ যত্নবান হতে হবে।

৩৪। প্রতিটি আঞ্চলিক বিদ্যালয়গুচ্ছ এক এবং অভিন্ন ছুটির তালিকা তৈরি করবে।

৩৫। শিক্ষক ও শিক্ষা সংক্রান্ত উপকরণ বিনিময়ের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করা হবে।

প্রত্যেকটি 'বিদ্যালয়গুচ্ছ' এগুলি শিক্ষাস্বার্থে প্রবর্তন করা এবং ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করে। শুধু তাই নয়, ২০০০ সালের এপ্রিলের মধ্যেই এই সিদ্ধান্তগুলি প্রত্যেকটি আঞ্চলিক বিদ্যালয় গুচ্ছের সভায় অনুমেদিত হয়। তবে, ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে সবগুলি একসঙ্গে কার্যকর করা না গেলেও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অধিকাংশই কার্যকর করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আঞ্চলিক বিদ্যালয়গুচ্ছগুলি সেইভাবে কাজকর্ম করতে শুরুও করে। বিষ্ণুপুর উত্তর বিদ্যালয় গুচ্ছের একাধিকবার ফুটবল, কাবাডি প্রতিযোগিতা স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েতগুলির সহযোগিতায় অত্যন্ত সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও সোনামুখী থানা বিদ্যালয় গুচ্ছের ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেকটি পরীক্ষার জন্য নিজ উদ্যোগে প্রশ্নপত্র তৈরি করে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং তা অভিভাবক মহলে সমাদৃত হয়েছে। যেখানে দুটি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে বার্ষিক ফল তৈরি করা হচ্ছে সেখানেই পরীক্ষার্থীদের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে এবং অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।

বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে বিরাট একটি অংশের উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেলেও কিছু 'নেতিবাচক' মনোভাবাপন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা নানান অজুহাতে এই গবেষণা কর্ম বানচাল করে দিতে চান। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত নির্দেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের নির্দেশ কার্যকর করতে করা হয়েছে তা বোঝাতে চাইলেও এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের উপ-অধিকর্তা (প্রশাসন) মহাশয় যখন এর সূচনা করে গেছেন তখন এর একটা গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আছে বলা সত্ত্বেও কিছু মুখরোচক বিভ্রান্তিকর কথা বলে কেউ কেউ ওই উৎসাহী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার থেকে নিবৃত্ত করতে চেস্টা করতে থাকেন। এইসব বাধাবিপত্তির মাঝে পড়েও যে সফলতা পাওয়া গেছে তা তুলে ধরে মাননীয় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা) বাঁকুড়া জেলা মহাশয়ের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাননীয় সভাপতি মহাশয়কে ১-১০-২০০১ তারিখে ২৯৬/বি.এস.ডি. সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে অবহিত করলে তৎকালীন সভাপতি মাননীয় ডঃ হরপ্রসাদ সমাদ্দার মহাশয় বিষয়টি খতিয়ে দেখেন এবং তৎপরতার সঙ্গে সমীক্ষার বিষয়টি তাঁর কার্যালয়ের ১০-১০-২০০১ তারিখের ২৫৯/প্রেস/কলকাতা/১ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের সুনজরে আনেন। এরপর পশ্চিমবঙ্গ

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এর মাননীয় সভাপতি মহাশয় এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য এই প্রতিবেদককে তাঁর কার্যালয়ে ২২-১০-২০০১ তারিখে দুপুর ২ টোর সময় উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর কার্যালয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হলে তিনি আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের কাছে বিষ্ণুপুর মহকুমার এই বিদ্যালয়গুচ্ছ ও বিদ্যালয় পরিদর্শন সম্বন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে বলেন, যা পরবর্তী সময়ে প্রথম শ্রেণির বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। মাননীয় সভাপতি মহাশয় প্রত্যেক পর্ষদ সদস্য এবং শিক্ষা বিভাগীয় বিভিন্ন আধিকারিককে তাঁর পত্র সহ সমীক্ষার অনুলিপি পাঠান। এছাড়াও তিনি এবিষয়ে পত্র দিয়েছেন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা বিদ্যালয়-গুচ্ছগুলিকে, যার ফলশ্রুতি হিসেবে জেলা ছাড়িয়ে জেলার বাইরে যেমন, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনী ব্লক বিদ্যালয় গুচ্ছের ৮-৪-০২ তারিখের সভায় উপস্থিত থেকে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য আসে আমন্ত্রণ। ওই সভায় উপস্থিত থেকে বিষ্ণুপুর মহকুমার প্রতিটি শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরাও হয়।

এরই মাঝে চলতে থাকে এই প্রতিবেদকের উদ্যোগে মহকুমার প্রত্যেকটি বিদ্যালয় দ্বিতীয়বার পরিদর্শন। শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে ১১৮টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও নতুন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৬টি বিদ্যালয় সহ মোট ১২৪টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পরিদর্শন করে প্রায় ৮০ শতাংশ বিষয়ে সফলতা অর্জনের চিত্র ভেসে ওঠে। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়গুচ্ছের সিদ্ধান্তগুলির প্রায় প্রত্যেকটি এবং কোথাও কোথাও আংশিকভাবে কার্যকর করা হয়েছে।

এর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি রাজ্যের প্রতিটি জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে শিক্ষা প্রশাসন ও বিদ্যালয় পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে ১৬-১৭ মার্চ ২০০২ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নামখানায় ২ দিনের এক কর্মশালার আয়োজন করে। ওই কর্মশালায় বিষ্ণুপুর মহকুমায় বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠন এবং পরিদর্শনের ওপর গবেষণার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। সাধারণ সম্পাদক সুবোধকুমার চক্রবর্তী মহাশয় প্রতিটি জেলায় এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আহ্বান জানান। সভায় বিশেষ আলোচক রূপে উপস্থিত থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তৎকালীন সভাপতি মাননীয় ড.হরপ্রসাদ সমাদ্দার মহাশয় এই গবেষণার বিষয়টি প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে তুলে ধরতে এই প্রতিবেদককে প্রতিটি জেলায় আলোচনার জন্য পাঠাতে পরামর্শ দেন।

এরই মধ্যে বিষ্ণুপুর মহকুমার এই 'শিক্ষা, পরিদর্শন ও প্রশাসন' বিষয়ে গবেষণা ও ফলাফলকে স্বীকৃতি দিতে বহু সংস্থা এবং ব্যক্তি এগিয়ে এসেছেন।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞকে সার্বিকভাবে রূপায়িত করতে ২০০২ সালের ১৮ মার্চ উপশিক্ষা অধিকর্তা (গ্রান্টইন এড) মাননীয় পূর্ণানন্দ প্রধান মহাশয়ের উপস্থিতিতে বিষ্ণুপুর মহকুমার আঞ্চলিক বিদ্যালয়গুচ্ছগুলির সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং মহকুমার স্বীকৃত শিক্ষক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের ঐকমতে 'মহকুমা বিদ্যালয় গুচ্ছ পরিচালন

সমিতি' গঠিত হয়। এই সভায় শিক্ষক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বিষ্ণুপুর মহকুমা শাখার সম্পাদক আনন্দমোহন চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্যামল চক্রবর্তী, মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সম্পাদক অরবিন্দ দে এবং বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সভাপতি নিমাই মুখোপাধ্যায়। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বিষ্ণুপুর মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে এই প্রতিবেদককে পদাধিকার বলে সভাপতি এবং বিষ্ণুপুর শহর বিদ্যালয় গুচ্ছের যুগ্ম সম্পাদক তথা বিষ্ণুপুর কৃত্তিবাস মুখার্জি উচ্চবিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ পাত্রকে সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পপাদক নির্বাচিত করে একটি শক্তিশালী 'মহকুমা বিদ্যালয়গুচ্ছ পরিচালন সমিতি' গঠিত হয়।

এই মহকুমা বিদ্যালয় গুচ্ছ পরিচালন সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় ২০০১ সালে। যখন ইন্দাস থানার গুরুধাম শান্তাশ্রম ব্রহ্মানন্দ বিদ্যাভবনের ছাত্রী সাহেদা আফরিন বাঁকুড়া জেলার ছাত্রীদের মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭৩৬ নম্বর পেয়ে প্রথম হয় এবং বিষ্ণুপুর থানার বগডহরা সিদ্দিকিয়া হাই মাদ্রাসার ছাত্র সাইফুল্লা চৌধুরি পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ড-এর পরীক্ষায় ৭২৪ নম্বর পেয়ে রাজ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করে। এই কৃতী পরীক্ষার্থী দুজনকে সংবর্ধনা দেবার প্রস্তাবে এগিয়ে আসেন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ের প্রতিটি কর্মী। গর্ব হয়, এরকম মানসিকতাসম্পন্ন কর্মীদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ধ্রুবনারায়ণ বাগদি, বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার নন্দী এবং কার্যালয় সহায়ক হরলাল মণ্ডল, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অনিলবরণ রায় ও নারায়ণ নন্দী প্রত্যেকে চাঁদা দিয়ে এই সংবর্ধনা সভা করতে এগিয়ে আসেন। ২০-৮-২০০১ তারিখে এই সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে নবাগত অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক নিতাইচাঁদ দত্ত বিদ্যালয় গুচ্ছের জন্য অনেক শ্রম ও শক্তি ব্যয় করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দিয়েছেন মাননীয় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ইন্দুভূষণ পাহাড়ী মহাশয় এবং পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতির বাঁকুড়া জেলা শাখার সম্পাদক অমিয়বরণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিষ্ণুপুর মহকুমা শাখার সম্পাদক বাসুদেব নন্দী।

নবগঠিত মহকুমা বিদ্যালয়গুচ্ছ প্রথমেই একটি গর্ব করার মতো কাজ করার সুযোগ পায়। ২০০২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র কৌশিক পান রাজ্যে নবম (পরে অষ্টম) স্থান অর্জন করতে সক্ষম হওয়ায় তাকে প্রথম সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে।

২৪/৭/২০০২ তারিখের মহকুমা বিদ্যালয় গুচ্ছের কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ২০০২ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত মহকুমার যতজন শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী অবসর নিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য একটি বড়ো আকারের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

বিষ্ণুপুর মহকুমা বিদ্যালয় গুচ্ছের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় এবং বিদ্যালয় পরিদর্শন ও বিদ্যালয় গুচ্ছকে নিয়ে গবেষণার সাফল্যে 'কিছু নেতিবাচক শিক্ষক-শিক্ষিকা' অহেতুক ক্ষুব্ধ

হয়ে বার বার এই বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠনের সমর্থনে সরকারি আদেশনামা দেখতে চান। তাঁরা এই বিশাল কর্মযজ্ঞকে এবং এতগুলি মানুষের সদিচ্ছাকে পণ্ড করে দিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরই প্রেক্ষিতে গৃহীত কর্মসূচি থেকে সাময়িকভাবে বিরত থাকতে হয়। সোনামুখী থানা বিদ্যালয় গুচ্ছ অবশ্য সিদ্ধান্তকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের ৫ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখের শিক্ষক দিবসে সংবর্ধনা দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, চিন্তা যদি সৎ ও সার্বজনীন হয় তাহলে জয় হবেই হবে। যারা নিজেদের 'স্বরূপ' দিয়ে জগৎকে বিচার করতে গিয়ে সব কিছুতেই নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে তারাও ভুল বুঝতে পারবে। আজ যারা বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছেন তাঁরা গর্বিত ও ধন্য। মহামান্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ 'বিদ্যালয় গুচ্ছ' এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন এবং সফলতা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই, 'সর্ব শিক্ষা অভিযান' সফল করতে শিক্ষা ব্যবস্থার তৃণমূল স্তর থেকে বিদ্যালয় গুচ্ছ'কে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করার জন্য রূপরেখা তৈরি করে ২৯/১/২০০৩ তারিখে ৯২/এস.ই/প্রাই এস.এস.এ -৭/২ সংখ্যক নির্দেশনামা জারি করেছেন। এই গুচ্ছের নাম দেওয়া হয়েছে 'গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্র' বা 'ক্লাস্টার রিসোর্স সেন্টার'। একটিগ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ে 'উল্লম্ব পর্যায়' বা 'Vertical Type' বিদ্যালয় গুচ্ছ গড়ে তোলা হবে। শিক্ষার উন্নতিতে 'বিদ্যালয় গুচ্ছ '-এর আদলে গঠিত 'গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্র' যে বিরাট ভূমিকা পালন করবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এখন এই প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করতে সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক বা অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়গুলির পক্ষ থেকে উদ্যোগী হয়ে উচ্চ বিদ্যালয়গুলির সমস্যা দূর করতে এবং শিক্ষার ঘাটতি পূরণ করে মান বৃদ্ধি করতে বিদ্যালয় পরিদর্শন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করলে এবং থানা পর্যায়ে এক বা একাধিক 'অনুভূমিক বা 'Horizontal Type' বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠন করার কাজে গুরুত্ব দিলে অসুবিধের কী আছে।

বর্তমানে, বিষ্ণুপুর মহকুমা বিদ্যালয় গুচ্ছ পরিচালন সমিতির উদ্যোগে চলছে নানান গঠনমূলক কাজ। তারমধ্যে শিক্ষার্থীদের উৎসাহদানই প্রধান। ২০০৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে বিশ্বমাতৃসচেতনতা দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে মহকুমার ২০০৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭০০ বা তার বেশি নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদেব এবং বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মায়েদের উপস্থিতিতে সংবর্ধনাজ্ঞাপন এবং শিক্ষায় মায়ের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা শিবিরে ১০৮ জন শিক্ষার্থী ও মায়েদের অংশগ্রহণ বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। আরও চলছে বিষ্ণুপুর মহকুমার শিক্ষার ইতিহাস রচনার কাজ যা ২০০৫ সালের মধ্যেই শেষ হবে আশা করা যায়। এ সবই সম্ভব হচ্ছে বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠনের মধ্য দিয়ে।

২০০৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় মহকুমার প্রতিটি বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ এবং ৭০০ বা তার বেশি নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মায়েদের উপস্থিতিতে ২০০৪ সালের ৭ নভেম্বর প্রত্যেককে পুরস্কৃত করা হয় এবং ওই বছরই মাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতী ছাত্রী রাজ্যে সম্ভাব্য ত্রয়োদশ স্থান অর্জনকারী ইন্দাস গার্লস হাই স্কুলের আত্রেয়ীপাল এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে পঞ্চম

সমিতি' গঠিত হয়। এই সভায় শিক্ষক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বিষ্ণুপুর মহকুমা শাখার সম্পাদক আনন্দমোহন চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্যামল চক্রবর্তী, মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সম্পাদক অরবিন্দ দে এবং বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সভাপতি নিমাই মুখোপাধ্যায়। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বিষ্ণুপুর মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে এই প্রতিবেদককে পদাধিকার বলে সভাপতি এবং বিষ্ণুপুর শহর বিদ্যালয় গুচ্ছের যুগ্ম সম্পাদক তথা বিষ্ণুপুর কৃত্তিবাস মুখার্জি উচ্চবিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ পাত্রকে সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পপাদক নির্বাচিত করে একটি শক্তিশালী 'মহকুমা বিদ্যালয়গুচ্ছ পরিচালন সমিতি' গঠিত হয়।

এই মহকুমা বিদ্যালয় গুচ্ছ পরিচালন সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় ২০০১ সালে। যখন ইন্দাস থানার গুরুধাম শান্তাশ্রম ব্রহ্মানন্দ বিদ্যাভবনের ছাত্রী সাহেদা আফরিন বাঁকুড়া জেলার ছাত্রীদের মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭৩৬ নম্বর পেয়ে প্রথম হয় এবং বিষ্ণুপুর থানার বগডহরা সিদ্দিকিয়া হাই মাদ্রাসার ছাত্র সাইফুল্লা চৌধুরি পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ড-এর পরীক্ষায় ৭২৪ নম্বর পেয়ে রাজ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করে। এই কৃতী পরীক্ষার্থী দুজনকে সংবর্ধনা দেবার প্রস্তাবে এগিয়ে আসেন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ের প্রতিটি কর্মী। গর্ব হয়, এরকম মানসিকতাসম্পন্ন কর্মীদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ধ্রুবনারায়ণ বাগদি, বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার নন্দী এবং কার্যালয় সহায়ক হরলাল মণ্ডল, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অনিলবরণ রায় ও নারায়ণ নন্দী প্রত্যেকে চাঁদা দিয়ে এই সংবর্ধনা সভা করতে এগিয়ে আসেন। ২০-৮-২০০১ তারিখে এই সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে নবাগত অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক নিতাইচাঁদ দত্ত বিদ্যালয় গুচ্ছের জন্য অনেক শ্রম ও শক্তি ব্যয় করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দিয়েছেন মাননীয় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ইন্দুভূষণ পাহাড়ী মহাশয় এবং পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতির বাঁকুড়া জেলা শাখার সম্পাদক অমিয়বরণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিষ্ণুপুর মহকুমা শাখার সম্পাদক বাসুদেব নন্দী।

নবগঠিত মহকুমা বিদ্যালয়গুচ্ছ প্রথমেই একটি গর্ব করার মতো কাজ করার সুযোগ পায়। ২০০২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র কৌশিক পান রাজ্যে নবম (পরে অষ্টম) স্থান অর্জন করতে সক্ষম হওয়ায় তাকে প্রথম সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে।

২৪/৭/২০০২ তারিখের মহকুমা বিদ্যালয় গুচ্ছের কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ২০০২ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত মহকুমার যতজন শিক্ষক -শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী অবসর নিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য একটি বড়ো আকারের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

বিষ্ণুপুর মহকুমা বিদ্যালয় গুচ্ছের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় এবং বিদ্যালয় পরিদর্শন ও বিদ্যালয় গুচ্ছকে নিয়ে গবেষণার সাফল্যে 'কিছু নেতিবাচক শিক্ষক-শিক্ষিকা' অহেতুক ক্ষুব্ধ

হয়ে বার বার এই বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠনের সমর্থনে সরকারি আদেশনামা দেখতে চান। তাঁরা এই বিশাল কর্মযজ্ঞকে এবং এতগুলি মানুষের সদিচ্ছাকে পণ্ড করে দিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরই প্রেক্ষিতে গৃহীত কর্মসূচি থেকে সাময়িকভাবে বিরত থাকতে হয়। সোনামুখী থানা বিদ্যালয় গুচ্ছ অবশ্য সিদ্ধান্তকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের ৫ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখের শিক্ষক দিবসে সংবর্ধনা দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, চিন্তা যদি সৎ ও সার্বজনীন হয় তাহলে জয় হবেই হবে। যারা নিজেদের 'স্বরূপ' দিয়ে জগৎকে বিচার করতে গিয়ে সব কিছুতেই নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে তারাও ভুল বুঝতে পারবে। আজ যারা বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছেন তাঁরা গর্বিত ও ধন্য। মহামান্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ 'বিদ্যালয় গুচ্ছ' এর প্রযোজনীয়তা অনুভব করেছেন এবং সফলতা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই, 'সর্ব শিক্ষা অভিযান' সফল করতে শিক্ষা ব্যবস্থার তৃণমূল স্তর থেকে বিদ্যালয় গুচ্ছ'কে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করার জন্য রূপরেখা তৈরি করে ২৯/১/২০০৩ তারিখে ৯২/এস.ই/প্রাই এস.এস.এ -৭/২ সংখ্যক নির্দেশনামা জারি করেছেন। এই গুচ্ছের নাম দেওয়া হয়েছে 'গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্র' বা 'ক্লাস্টার রিসোর্স সেন্টার'। একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ে 'উল্লম্ব পর্যায়' বা 'Vertical Type' বিদ্যালয় গুচ্ছ গড়ে তোলা হবে। শিক্ষার উন্নতিতে 'বিদ্যালয় গুচ্ছ '-এর আদলে গঠিত 'গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্র' যে বিরাট ভূমিকা পালন করবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এখন এই প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করতে সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক বা অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়গুলির পক্ষ থেকে উদ্যোগী হয়ে উচ্চ বিদ্যালয়গুলির সমস্যা দূর করতে এবং শিক্ষার ঘাটতি পূরণ করে মান বৃদ্ধি করতে বিদ্যালয় পরিদর্শন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করলে এবং থানা পর্যায়ে এক বা একাধিক 'অনুভূমিক বা 'Horizontal Type' বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠন করার কাজে গুরুত্ব দিলে অসুবিধের কী আছে।

বর্তমানে, বিষ্ণুপুর মহকুমা বিদ্যালয় গুচ্ছ পরিচালন সমিতির উদ্যোগে চলছে নানান গঠনমূলক কাজ। তারমধ্যে শিক্ষার্থীদের উৎসাহদানই প্রধান। ২০০৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে বিশ্বমাতৃসচেতনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে মহকুমার ২০০৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭০০ বা তার বেশি নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদেব এবং বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মায়েদের উপস্থিতিতে সংবর্ধনাজ্ঞাপন এবং শিক্ষায় মায়ের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা শিবিরে ১০৮ জন শিক্ষার্থী ও মায়েদের অংশগ্রহণ বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। আরও চলছে বিষ্ণুপুর মহকুমার শিক্ষার ইতিহাস রচনার কাজ যা ২০০৫ সালের মধ্যেই শেষ হবে আশা করা যায়। এ সবই সম্ভব হচ্ছে বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠনের মধ্য দিয়ে।

২০০৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় মহকুমার প্রতিটি বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ এবং ৭০০ বা তার বেশি নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মায়েদের উপস্থিতিতে ২০০৪ সালের ৭ নভেম্বর প্রত্যেককে পুরস্কৃত করা হয় এবং ওই বছরই মাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতী ছাত্রী রাজ্যে সম্ভাব্য ত্রয়োদশ স্থান অর্জনকারী ইন্দাস গার্লস হাই স্কুলের আত্রেয়ীপাল এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে পঞ্চম

স্থান অর্জনকারী শাসপুর ডি. এন. এস ইসনস্‌টিটিউশনের সৌরভ অধিকারী এবং অষ্টম স্থান অর্জনকারী বিষ্ণুপুর উচ্চবিদ্যলয়ের কৌশিক পানকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

২০০৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় অনুরূপভাবে প্রতিটি বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গো রাজ্যে প্রথম স্থান অর্জনকারী অরিন্দম সাঁতরা, দশমস্থান অর্জনকারী অঙ্কুর দাশ গুপ্ত, চতুর্দশ-আফজল মিদ্যা, ষোড়শ-কৌশিক হাজরা, অষ্টাদশ অদ্রীশ ঘোষ-কে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে নবম স্থান অর্জনকারী অভিরূপ ঘোষকে ১৬ জুন ২০০৫ সংবর্ধনা জানানো হয়।

বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠনে বর্তমানে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের উপ-বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা (গ্রান্ট ইন এইড) মাননীয় শ্রী দিব্যগোপাল ঘটক মহাশয়। তিনি নিজেও এ বিষয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, গবেষণা করছেন এবং আমার এই গবেষণা কর্মে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে চলেছেন।

# আদর্শ শ্রেণি গঠন

অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটা প্রবণতা থাকে বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া। এমনটা থাকাই অবশ্য স্বাভাবিক। কেননা, দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে এবং তাদের ফলাফলের ওপর বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভরশীল। দশম শ্রেণির ওপর তাই, বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে নিচু শ্রেণি বিশেষ করে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রতি কম গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। অনেকে অবজ্ঞা করে, আবার কেউ কেউ বা সময় না পেয়ে তাদের প্রতি কম গুরুত্ব দিতে বাধ্য হন।

আজ এবিষয়ে একটু ভাবতে হবে। বর্তমান বছরের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরাই আগামী ছ'বছর পরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। দীর্ঘ ছ'বছরের তিল তিল করা যত্নে বেড়ে উঠে ওরাই বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণিতে গিয়ে বসে, মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়, বিদ্যালয়ের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। তাই, সবার আগে পঞ্চম শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি সমান গুরুত্ব দিতে হবে। পঞ্চম শ্রেণি থেকে তাই আদর্শ শ্রেণি গঠন করতে শুরু করলে প্রতি বছর একটি একটি করে বেড়ে আগামী ছবছরে বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণিই আদর্শ শ্রেণিতে পরিণত হবে। এক বছরে সব শ্রেণিকেই আদর্শ শ্রেণি হিসেবে গড়ে তুলব এমন প্রকল্প রচনা করা সম্ভব হলেও অনেক সময় সফল হওয়া যায় না। তা, বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক নিয়মে এবং গতিতে অন্যান্য শ্রেণিগুলি চললেও পঞ্চম শ্রেণি হবে সম্পূর্ণ পৃথক। পরের বছর পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে গেলে তাদের প্রতি সমান যত্ন তো থাকবেই উপরন্তু, নতুন পঞ্চম শ্রেণির প্রতি শুরু হবে নতুন করে গড়ে তোলার কাজ।

এখন দেখা যাক, এই আদর্শ শ্রেণি গঠন কীভাবে করা যাবে।

বিদ্যালয় অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এই 'আদর্শ শ্রেণি গঠন' প্রকল্পটি গ্রহণ করে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পরিচালন সমিতিও সমানভাবে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেবে। শুরু হবে 'আদর্শ শ্রেণি গঠন' প্রকল্পের কাজ। এই প্রকল্পের প্রথমেই যে বিষয়গুলিতে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে তা হল—

১। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি বিষয়ক প্রচেস্টা। ২। স্কুল পালানো রোধ। ৩। শিক্ষক শিক্ষিকাদের আন্তরিকতার মাধ্যমে শ্রেণি পঠন-পাঠন শুরু। ৪। নিয়মিতভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠ আয়ত্ত করিয়ে দেওয়া। ৫। লিখিত হোমটাস্ক প্রদান এবং তা দেখা বাধ্যতামূলক করা। ৬। নিয়মিত শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাকরা। ৭। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। ৮। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আসন বন্টন করা। ৯। মনিটর বা শ্রেণিকর্তা প্রথা চালু করে প্রত্যেকের ওপর পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব প্রদান। ১০। নিয়মিত অভিভাবক সভা আহ্বান। ১১। প্রয়োজনে

পাড়ায় গিয়ে অভিভাবক সভা করা। ১২। মায়েদের নিয়ে আলোচনা সভা করে শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত করা। ১৩। শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা অন্বেষণ করে সেইমতো তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ১৪। পঞ্চম শ্রেণিতে 'কর্মশিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান' বিষয় অন্তর্ভুক্তি করে তার ঠিকমতো প্রয়োগ। ১৫। বছরে দুটি পরীক্ষা করে প্রথম পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৪০ শতাংশ এবং দ্বিতীয় পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৬০ শতাংশ নিয়ে বার্ষিক চূড়ান্ত ফল তৈরি। ১৬। শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট টিউশনের প্রতি আকর্ষণ কমাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি। ১৭। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি পৃথকভাবে যত্ন করার প্রকল্প রচনা এবং তার বাস্তবায়ন। ১৮। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পঞ্চম বা ষষ্ঠ পিরিয়ডের পর পঞ্চম শ্রেণির ছুটি হয়ে যায়। এই প্রথা প্রচলিত থাকলেও এর কোনো সরকারি আদেশনামা নেই। অহেতুক প্রতিদিন একটি বা দুটি পিরিয়ড নষ্ট না করে ওই সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ। ১৯। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি সহমত পোষণ করে বছরে দশটি পরীক্ষা গ্রহণ করলে আরও সুফল পাওয়া যাবে।

শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের প্রথম ধাপ হল পঞ্চম শ্রেণি থেকে শুরু করে পরপর প্রতি বছর আদর্শ শ্রেণি গঠন করা। ওই প্রচেষ্টাই হল শিক্ষা, শিক্ষার্থী, বিদ্যালয় ও সমাজের প্রতি ভালোবাসার প্রথম ও প্রধান শপথ। শিক্ষার স্বার্থে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট প্রত্যেককেই এই শপথগ্রহণ করতে হবে।

# পরিদর্শক ও বিদ্যালয়ের প্রার্থনা সভা

পরিদর্শন একটি প্রথম শ্রেণির শিল্প। একজন সার্থক পরিদর্শকও তাই একজন অভিজাত শিল্পী। একদিকে শিক্ষকসুলভ মন, শিক্ষার্থীর মন বোঝার মতো হৃদয়, প্রথম শ্রেণির প্রশাসনিক দক্ষতা, অপরদিকে শিল্পীপ্রাণ নিয়েই একজন পরিদর্শক 'সার্থক পরিদর্শক' আখ্যায় আখ্যায়িত হন। বিদ্যালয় ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে একজন পরিদর্শককে প্রথম থেকেই অগ্রসর হতে হয়। তা না হলে পরিদর্শন হবে খাপছাড়া, হবে নিছক 'ভ্রমণ' কিন্তু, 'পরিদর্শন' নয়।

পরিদর্শনের প্রথম প্রক্রিয়াটি শুর হয় সার্থক ও বিজ্ঞানসম্মত পরিদর্শন সূচি প্রণয়নের মাধ্যমে। প্রথমেই নিজ এলাকার বিদ্যালয়গুলির গ্রাম, পঞ্চায়েত/ ব্লকভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এর জন্য নিজ কার্যালয়ের একটি স্থায়ী খাতা রাখা অবশ্যই জরুরি কাজ। যা কিনা 'পরিদর্শন আয়না' নামে অভিহিত হয়।

পরিদর্শন সূচি প্রণয়নকালে লক্ষ রাখতে হবে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোনো বিদ্যালয় একাধিকবার পরিদর্শন হল, কোনো দুর্গম এলাকার বিদ্যালয় আদৌ পরিদর্শন করা হল না—এমনটা যেন না হয়। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রতিটি বিদ্যালয় যাতে একবার করে অবশ্যই পরিদর্শন করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

পরিদর্শন প্রক্রিয়া শুরু করতে গিয়ে দেখা যায় দুভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়—
(১) অগ্রিম খবর দিয়ে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির পদাধিকারীদের উপস্থিত থাকবে বলে।
(২) কাউকে কোনো খবর না দিয়ে আকস্মিকভাবে। তবে, নতুন পরিদর্শন ভাবনা কার্যকর করতে গিয়ে প্রথম পর্যায়ে প্রত্যেক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অগ্রিম খবর দিয়ে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তাতে পরিদর্শক কী চাইছেন তা প্রথম বারেই প্রত্যেকেই অবগত হওয়ার সুযোগ পান। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাই, আগাম কোনো খবর না দিয়ে পূর্ববর্তী পরামর্শ কতটা কার্যকর হয়েছে তা উপলব্ধি করার সুযোগ থাকে। ভুলত্রুটি মানুষ মাত্রেরই হয়। তাই, পরিদর্শক যেন কেবল ভুল ত্রুটি ধরতেই না আসেন, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ভুলত্রুটি সংশোধন করাই তাই লক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

'পরিদর্শক'কে হতে হবে সময়ানুবর্তিতা সম্পন্ন। কেননা, সময় সম্পর্কে জ্ঞান বা সচেতনতা না থাকলে সার্থক পরিদর্শক হওয়া যায় না। বিদ্যালয়ে প্রার্থনা সভা বা জমায়েতের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু। তাই, প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থাকলে তবে, বিদ্যালয়ের সামগ্রিক চিত্রটি একজন পরিদর্শকের চোখে ধরা পড়বে। প্রার্থনা সভায় জাতীয় সংগীত গাওয়ার জন্য সরকারি নির্দেশ আছে। তা কার্যকর হয়েছে কি না, জাতীয় সংগীত গাইবার

জন্য যে ৫২ সেকেন্ডে সময় নির্দিষ্ট করা আছে তা অনুসরণ করা হচ্ছে কি না, 'স্থানীয় সংবাদ পাঠ', 'মনীষীদের রচনা পাঠ', করা হয় কি না তাও জানা যায় বা প্রত্যক্ষ করা যায়। তাছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীরা উপস্থিত হয় কি না, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থাকেন কি না তাও প্রত্যক্ষ করা যায়। এছাড়াও শিক্ষার্থীরা শ্রেণি বা বিভাগ অনুযায়ী ছোটো থেকে বড়ো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াচ্ছে কি না, ইউনিফর্ম পরে আসছে কি না, তা প্রত্যক্ষ করে পরবর্তী আলোচনা সভায় বা প্রার্থনা সভাতেও এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থাকলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গো প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা পরিদর্শকের পরিচয় করিয়ে দিলে পরবর্তী সময়ে শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শনের সময় শিক্ষার্থীদের চাপা কৌতূহল থাকে না। এই সভায় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গো প্রাথমিকভাবে পরিচিতি ঘটে। প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থাকলে বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা, সৌন্দর্যবোধ, সময়ানুবর্তিতা ও রুচিবোধ পরিদর্শকের সামনে ফুটে ওঠে। প্রার্থনা সভা বিদ্যালয়ের দর্পণ। প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থেকে একজন পরিদর্শক বিদ্যালয়ের পুরো চিত্রটি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাবেন। তাই সার্থক পরিদর্শকের অবশ্যই প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থাকা প্রয়োজন এবং এটাও একজন সার্থক পরিদর্শকের প্রধান গুণ।

পরিদর্শন কালে প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রার্থনা সভায় পরিদর্শক উপস্থিত থাকলে বিদ্যালয় শিক্ষায় একটা সাড়া জাগানো প্রভাব পড়বে। আর আচরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে একজন পরিদর্শক নিজের অজান্তেই একদিন 'আচার্য' উপাধিতে ভূষিত হবেন।

## শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর আসন বণ্টন

শিক্ষা নিয়ে নিত্য যেমন গবেষণা চলছে, শিক্ষার্থীদের নিয়েও তেমনি সারা বিশ্বজুড়ে চিন্তাভাবনার অন্ত নেই। কোথাও শিক্ষার্থীদের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলায় বেঁধে রাখা হয়, কোথাও বা তারা থাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন, মুক্ত, এলোমেলো। সব কিছুরই মূলে-কিন্তু শিক্ষার্থীদের মানুষ করে তোলার চিন্তাভাবনা কাজ করছে। আমাদের রাজ্যে এই বিশাল কর্মযজ্ঞে একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী থেকে শুরু করে শিক্ষা অধিকর্তা এমনকি শিক্ষামন্ত্রী পর্যন্ত প্রত্যেকেই এই একই উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছেন। পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ থাকলেও নিয়মশৃঙ্খলা যে মানবজাতিকে শক্তপোক্তভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে সে বিষয়ে কারও মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

বর্তমানে বিদ্যালয়গুলি হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। 'নেই নেই' শব্দে প্রত্যেকেই নাজেহাল। শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হারে শিক্ষক নেই, প্রয়োজনমতো বসার বেঞ্চ নেই, হাতেনাতে শিক্ষা দেবার মতো আধুনিক যন্ত্রপাতি এমনকি পুরোনো দিনের যন্ত্রপাতিও নেই। তার থেকে আরও যেটা সহজ সত্য তা হল অনেকেরই শিক্ষা দেবার মতো মানসিকতা নেই। শিক্ষার্থীদের মধ্যেও এর রেশ পৌঁছে গেছে। তারাও হতাশাগ্রস্ত, নেতিবাচক মানসিকতার শিকার। নিয়ম না মানার প্রতিযোগিতায় মগ্ন। তাই তো দেখা যায়—দেরিতে বিদ্যালয়ে আসা, প্রার্থনা সভায় যোগ না দেওয়া, শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পাঠদান না শোনা, টিফিনের সময় প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার অনুমতি ব্যতিরিকে বাড়ি চলে যাওয়া, পিছনের বেঞ্চ-এ বসে গোলমাল করার মতো হাজারো বদনেশায় আক্রান্ত। শিক্ষক/শিক্ষিকারাও নাজেহাল হয়ে যান। কেউ কেউ এর প্রতিবাদের জন্য অনেক কিছু ভাবেনও। কিন্তু, নতুন কিছু করে দেখাতে গেলেই—সঙ্গো সঙ্গো নানাদিক থেকে আসা নিরুৎসাহসূচক তির বুকে বিঁধে। সব ছারখার হয়ে যায়। যাঁরা নেহাৎ নাছোড়বান্দা হয়ে 'নেতিবাচক' দিকগুলিকে পায়ে মাড়িয়ে সম্পূর্ণ 'ইতিবাচক' চিন্তায় মগ্ন থাকেন তাঁরা দেরিতে হলেও জয়ী হন। তাই, বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আসন বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমেও শৈল্পিক মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়ে 'ইতিবাচক' দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলম্বন করা যেতেই পারে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর আসন বণ্টন করার মাধ্যমেও শিল্পবোধ, সুরুচি এবং নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলার একটা শুভসূচনা ও তাকে সহজেই ফলপ্রসূ করা যেতে পারে। প্রথমেই ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে বসানোর একটি বিজ্ঞানসম্মত দিক খুঁজে নেওয়া যাক। সহপাঠক্রমিক বিদালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পৃথকভাবে শ্রেণিকক্ষে বসে। মেধাগতভাবে তাদের একটিই তালিকা থাকলেও শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাবিজ্ঞান সম্মতভাবে আসন বণ্টন করার স্বার্থে শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথকভাবে মেধাভিত্তিক দুটি তালিকা করে নিতেই পারা যায়। ধরা যাক, একটি শ্রেণিতে পঞ্চাশ জন ছাত্র-ছাত্রী আছে। তারমধ্যে ৩০ জন ছাত্র এবং ২০

জন ছাত্রী। মেধাভিত্তিক দুটি তালিকা ছাত্র-ছাত্রী ভেদে এইভাবে করা যায়। যেমন ছাত্র ১,৪, ৫,৭,১০,১১,১২,১৫,১৬,১৭,১৮,২২,২৪,২৭,৩০,৩৩,৩৫,৩৬,৩৭,৩৮,৩৯,৪০,৪২,৪৩, ৪৪,৪৫,৪৬,৪৭,৪৯,৫০, ছাত্রী-২,৩,৬,৮,৯,১৩,১৪,১৯,২০,২১,২৩,২৫,২৬,২৮,২৯,৩১, ৩২,৩৪,৪১,৪৮।

ধরা যাক, বিদ্যালয়ে বসার জন্য মোট ১০টি বেঞ্চ আছে। প্রত্যেকটিতে পাঁচজন করে শিক্ষার্থী বসতে পারে। তাহলে ৩০ জন ছাত্রের জন্য ৬ টি এবং ২০ জন ছাত্রীর জন্য ৪টি বেঞ্চ প্রয়োজন। ছাত্র-ছাত্রী ভেদে বেঞ্চগুলিকে শ্রেণিকক্ষে দুপাশে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এবার এমনভাবে শিক্ষার্থীদের বসানো যেতে পারে যাতে প্রত্যেকটি বেঞ্চ-এ ক্রমিকসংখ্যা অনুযায়ী সমমেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা থাকে।

| ছাত্র | | | | | বেঞ্চ | ছাত্রী | | | | | বেঞ্চ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪৪ | ৪৩ | ২৪ | ২২ | ১ | (১) | ৩২ | ৩১ | ২০ | ১৯ | ২ | (১) |
| ৪৫ | ৪২ | ২৭ | ১৮ | ৪ | (২) | ৩৪ | ২৯ | ২১ | ১৪ | ৩ | (২) |
| ৪৬ | ৪০ | ৩০ | ১৭ | ৫ | (৩) | ৪১ | ২৮ | ২৩ | ১৩ | ৬ | (৩) |
| ৪৭ | ৩৯ | ৩৩ | ১৬ | ৭ | (৪) | ৪৮ | ২৬ | ২৫ | ৯ | ৮ | (৪) |
| ৪৯ | ৩৮ | ৩৫ | ১৫ | ১০ | (৫) | | | | | | |
| ৫০ | ৩৭ | ৩৬ | ১২ | ১১ | (৬) | | | | | | |

এইভাবে তালিকা প্রস্তুত করে এক একটি বেঞ্চে বসানোর ব্যবস্থা করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি বেঞ্চেই প্রায় সমান মেধার শিক্ষার্থী আছে। প্রতিদিন এরা কিন্তু পাশাপাসি বসবে। তবে, একই বেঞ্চ-এ প্রতিদিন বসবে না। বেঞ্চ পরিবর্তনযোগ্য। অর্থাৎ প্রথমদিন যারা প্রথম বেঞ্চে বসছে দ্বিতীয় দিনে তারা দ্বিতীয় বেঞ্চে বসবে। দ্বিতীয় বেঞ্চের শিক্ষার্থীরা তৃতীয় বেঞ্চে, তৃতীয় বেঞ্চের শিক্ষার্থীরা চতুর্থ বেঞ্চে, চতুর্থ বেঞ্চেররা পঞ্চম বেঞ্চে, পঞ্চমরা ষষ্ঠ বেঞ্চে, ষষ্ঠরা প্রথম বেঞ্চে বসবে। এইভাবে প্রতিদিন তালিকা অনুযায়ী পাশাপাশি বসবে। বেঞ্চ পরিবর্তন করে করে। প্রতিদিন বেঞ্চ-এর ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী বেঞ্চ পরিবর্তন করা যাবে। কিন্তু পাশাপাশি নির্ধারিত সিট পরিবর্তনযোগ্য নয়।

এখন দেখা যাক—এই পদ্ধতিতে বসানোর ফলে কিছু বাড়তি সুফল পাওয়া যায় কিনা।

(১) মৌরসি পাট্টার মতো বেঞ্চ-এ স্থান দখল করে একই স্থানে শিক্ষার্থীদের বসে থাকার মতো প্রবণতা বা অভ্যাস বিলুপ্ত হবে।

(২) কোনো শিক্ষার্থী অনুপস্থিত হলে তার স্থান কিন্তু, ফাঁকা পড়ে থাকবে। তাতে কোন শিক্ষার্থী কোন দিন আসছে না তা প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকারই সহজে নজরে পড়বে।

(৩) যে প্রতিদিন পিছনের বেঞ্চ-এ বসে মুখ নিচু করে কোনোরকমে ক্লাস ম্যানেজ করত তাকে একদিন হলেও প্রথম বেঞ্চ-এ বসতে হবে। ফলে একদিকে যেমন ভীতি দূর হবে, জড়তা কাটবে, ঠিক তেমনি পড়া তৈরি করার একটা প্রবণতা ক্ষীণ হলেও দেখা দেবে।

(৪) নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রমিক সংখ্যার জন্য যখন একটি করে বেঞ্চ নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে তখন। শিক্ষিক-শিক্ষিকাগণ পাঠদান কালে প্রশ্ন দলগতভাবেও জিজ্ঞাসা করতে পারবেন। কোন বেঞ্চ উত্তর দিতে পারছে তার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কোন বেঞ্চ কটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে তা বোর্ডে লিপিবদ্ধ করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও একটা আগ্রহ বাড়বে। প্রতিটি শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিদিন বসছে কিনা তা দেখার জন্য ছাত্র-ছাত্রী উভয়ের মধ্য থেকে একজন বা দুজন করে 'মনিটর' নির্বাচন করে দেওয়া যেতে পারে। এও সপ্তাহভিত্তিক হবে। তাহলে অনেকেরই 'মনিটর' হওয়ার সুযোগ ঘটবে। মাঝে মাঝে শিক্ষক মশাইরা সব ঠিকঠাক আছে কিনা তা যাচাই করে নেবেন। এই পদ্ধতিকে আরও জনপ্রিয় ও কার্যকরী করে তোলার জন্য প্রতি বেঞ্চ-এর এক একজনকে এক একটি বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত 'নেতা' নির্বাচন করে দেওয়া যেতে পারে। যেমন ছাত্রদের ১নং বেঞ্চ-এর উদাহরণ দিয়ে বলা যায়-ক্রমিক সংখ্যা ১ ইংরেজি ও গণিত ২২ বাংলা, ২৪ পদার্থবিজ্ঞান ও জীবন বিজ্ঞান, ৪৩ ইতিহাস ৪৪ ভূগোল বিষয়ের মুখ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এরাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে এবং নিজ নিজ বেঞ্চ এর শিক্ষার্থীদের উক্ত বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সচেতন করে তুলবে। ফলে, যারা নিত্য চুপচাপ থাকত তারাও অন্তত কিছুটা হলেও সতর্ক হবে। পারস্পরিক আলোচনা করতে বাধ্য হওয়ায় বিষয়টিকে কিছুটা হলেও আয়ত্ত করতে শিখবে।

শিক্ষকমশাইকেও সতর্ক থাকতে হবে। কোন বেঞ্চ থেকে তাঁর বিষয়ে কেমন উত্তর আসে তা লিখে রাখলে সপ্তাহে বা মাসে বা এক একটি অধ্যায় শেষে হিসেব দিলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা প্রতিযাগিতার মনোভাব তৈরি হবে।

অনেকে যুক্তি দেখাতে পারেন—শ্রেণিকক্ষে এইভাবে বসলে অসুবিধে হতে পারে। কেননা, যাদের উচ্চতা বেশি তারা যদি সামনের দিকে বসে এবং পিছনে যদি যাদের উচ্চতা কম তারা বসে তাহলে তারা শিক্ষক/শিক্ষিকার নজরের আড়ালে চলে যাবে। তারা শিক্ষক/শিক্ষিকাকে ঠিকমতো দেখতে পাবে না এবং শিক্ষক -শিক্ষিকারাও তাদের ঠিকমতো লক্ষ্য করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে পরামর্শ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পুরনো ধ্যান-ধারণা পাল্টে শিক্ষাগবেষণার সাম্প্রতিকতম রূপটি গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের কেবলমাত্র চেয়ারে বসে থেকে পাঠদান করার দিন শেষ হয়ে গেছে। শ্রেণিকক্ষে বিচরণের মাধ্যমে পাঠদান করা এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি সমান নজর রাখার মতো পরিবেশ তো নিজেকেই তৈরি করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের অবশ্যই ধরে নিতে হবে-শ্রেণিকক্ষে কোনো চেয়ার নেই। ফলে সহজেই নেতিবাচক দিকটি কাটিয়ে উঠে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।

হ্যাঁ, এইভাবে পাঠদানের পরিবেশ তৈরি করতে গিয়ে একটু বেশি ঝামেলাভোগ, একটু বাড়তি পরিশ্রম তো করতেই হবে। প্রত্যেকের তো লক্ষ্য একটাই—শিক্ষার্থীদের কিছু শেখাতে হবে, তাদের মানুষ করে তুলতে হবে। তাহলে যে পদ্ধতি অবলম্বন করলে শিক্ষাবিজ্ঞানকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় সে পদ্ধতি অবলম্বন করলে আপত্তি কীসের?

আসুন না আমরা সবাই মিলে একটু ভেবে দেখি।

# বিদ্যালয়ে ক্লাস মনিটর বা শ্রেণিকর্তা প্রথা প্রবর্তন

বিদ্যালয়গুলিতে ক্লাস মনিটর বা শ্রেণিকর্তা প্রথা পুনরায় প্রবর্তন হওয়া প্রয়োজন। একসময় ক্লাস মনিটর বা শ্রেণিকর্তা অনেক দায়দায়িত্ব পালন করে শ্রেণিকক্ষকে সদা সফল করে রাখত। বর্তমানে সেই প্রথার প্রচলন খুবই জরুরি। এই মনিটর নিয়োগ বা নির্বাচন করবেন শ্রেণিশিক্ষকরাই। প্রতি সপ্তাহে দুজন করে মনিটর থাকবে। সহশিক্ষামূলক বিদ্যালয় হলে দুজন ছাত্র এবং দুজন ছাত্রী বা অন্য ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দুজন ছাত্র বা দুজন ছাত্রী প্রতি শ্রেণি থেকে প্রতি সপ্তাহের জন্য নিযুক্ত হবে। এদের মধ্যে একজনের ক্রমিক সংখ্যা ১ হলে অন্যজন যেন শেষ ক্রমিক সংখ্যার শিক্ষার্থী হয়। এইভাবে যে সপ্তাহে ২ ক্রমিক সংখ্যার শিক্ষার্থী নির্বাচিত হবে সেই সঙ্গে থাকবে শেষ-এর আগের ক্রমিক সংখ্যার শিক্ষার্থী। এইভাবে একজন প্রথম থেকে অন্যজন শেষ থেকে নির্বাচিত হবে। প্রতি সপ্তাহে প্রথম কাজের দিনে শ্রেণিশিক্ষক বা শিক্ষিকা ওই সপ্তাহের জন্য মনিটরের নাম ঘোষণা করে দেবেন। তারা এক সপ্তাহের জন্য শ্রেণিকক্ষের যাবতীয় সফলতা ও বিফলতার মুখ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। শিক্ষকমশাইরা হবেন পর্যবেক্ষক। এদের ওপর দায়িত্ব থাকবে শ্রেণিতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, শ্রেণি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রার্থনা সভায় যে যার নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াচ্ছে কিনা তা লক্ষ রাখা, মনীষীদের রচনা পাঠ করার জন্য ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী শিক্ষার্থীর ওপর দায়িত্ব দেওয়া, শ্রেণিকক্ষে ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী ঠিক করে দেওয়া স্থানে বসছে কিনা লক্ষ রাখা, লিখিত হোম টাস্ক-এর খাতা শিক্ষক শিক্ষিকারা স্টাফরুমে নিয়ে গিয়ে সংশোধন করে দিলে তা নিয়ে এসে যার যার খাতা তার তার হাতে তুলে দেওয়া। কেউ কোনো কারণে বাইরে গেলে তা নিয়ন্ত্রণ করা। এই প্রথা নিচু শ্রেণিগুলিতে খুব কার্যকর হবে। তাদের মধ্যে নেতৃত্বদানের স্পৃহা জাগ্রত হবে। নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রবণতা দেখা দেবে। তার ফলস্বরূপ উঁচু শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলার স্বার্থে এবং নিজেদের জীবনগঠনের লক্ষ্যে এই প্রথাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কর্মশিক্ষা বিভাগের জন্য বিদ্যালয়ের স্বার্থে নবপ্রবর্তিত নম্বর প্রদান শিক্ষার্থীদের সুসংহত হতে সাহায্য করবে।

এক সপ্তাহ করে প্রতি দুজনকে এই দায়িত্ব দিলে প্রত্যেকেই মনিটর হয়ে নিজ নিজ কর্মদক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পাবে। নিচু শ্রেণিগুলির ক্ষেত্রে দক্ষ মনিটরদের উপযুক্ত নম্বর প্রদান করলে এবং উঁচু শ্রেণিগুলির শ্রেষ্ঠ মনিটরদের পুরস্কার প্রদান করলে এই পদ্ধতির দ্রুত সুফল পাওয়া যাবে এবং প্রচেষ্টা সার্থক হবে। তবে, এক্ষেত্রে প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকা কে বেশি সময় বেশি শ্রম তো দিতেই হবে। লক্ষ্য যদি শিক্ষার্থীদের, বিদ্যালয়ের এবং সমাজের উন্নতি সাধন করা হয় তাহলে এই অতিরিক্ত দায়িত্বপালন কে আর না করতে চাইবেন?

# শিক্ষার্থী ও লিখিত হোম টাস্ক

লিখিত 'হোম টাস্ক' না করা এবং করতে না দেওয়া এই দুই-এর সংযুক্তিকরণে এককালে শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সার্বিক উন্নয়নের ব্যবস্থাপত্রটি বর্তমানে প্রায় শেষ হয়ে গেছে। শিক্ষার্থীদের কাছে যদি প্রশ্ন করা যায় যে 'তারা কী জন্য বিদ্যালয়ে আসে' তাহলে কেউ কেউ উত্তর দেবে 'পড়তে' , কেউ কেউ বলবে 'পড়াশোনা করতে', কিন্তু, 'লেখাপড়া' করতে একথা আজকাল আর কেউ বলে না। যা সত্য এবং নির্ভেজাল বাস্তব তাই তারা বলে দেয়। সত্যি তারা আসে কেবলমাত্র 'পড়তে' নয়তো কেবলমাত্র 'পড়াশোনা' করতে। 'লেখাপড়া' করতে নয়। ওরা সত্যিই পড়তে আসে, নয়তো পড়তে এবং শুনতে আসে। লিখতে আসে না। আসলে যে ওরা পড়ে কম। আর লিখে? আদৌ না। তাই তো, শ্রেণিকক্ষে গিয়ে খোঁজ-খবর নিলে দেখা যাবে— ইতিহাস-এর হোম টাস্ক- এর জন্য কার কার খাতা আছে দেখাও অথবা, গতকাল ইতিহাসের স্যার ইতিহাস-এর হোম টাস্ক-এর জন্য কী কী প্রশ্ন লিখতে দিয়েছিলেন? তাহলে উত্তর পাওয়া যাবে— আমাদের কোনো প্রশ্ন তো লিখতে দেওয়া হয়নি, বা খাতা নেই। যে খাতা আছে সে তো প্রাইভেট টিউশনের খাতা। এযে বড়ো বাস্তব কথা। ঠিক সেই সময় ওদের যদি বলা যায় যে 'লেখাপড়া' বলে একটা শব্দ আছে হয়তো শুনেছো। একজন মনীষী নিশ্চয়ই একদিন যে কোনো পরিস্থিতিতেই হোক এই 'লেখাপড়া' শব্দটার প্রচলন করেছিলেন। তিনি তখনকার দিনে কতো বাস্তবধর্মী ছিলেন তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে 'লেখাপড়া' কী সমাস হবে? অনেকেই বলতে পারবে না। দু-একজন কষ্ট করে বলবে—দ্বন্দ্ব সমাস। আবার যারা উত্তর দিয়েছে তারাও হয়তো 'দ্বন্দ্ব সমাস' কাকে বলে তা বলতে পারবে না। অষ্টম, নবম এবং দশম শ্রেণিতেই এই প্রশ্ন করে হতাশ হতে হয়। আসলে, সমস্যমান পদগুলির অর্থাৎ পূর্বপদ এবং উত্তরপদ প্রত্যেকটির গুরুত্ব সমান হয় এই দ্বন্দ্ব সমাসে। 'লেখা ও পড়া' এরূপ ব্যাসবাক্য করলে লেখার যেমন গুরুত্ব পড়ারও ঠিক তেমনি সমান গুরুত্ব। কিন্তু, বাস্তবে লেখার গুরুত্ব আজকাল আর শিক্ষার্থীরা সচরাচর দিতে চায় না। সময় কোথায়? বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন সময় বাদ দিয়ে একজন শিক্ষার্থীর হাতে থাকে বাড়িতে লেখাপড়ার করার জন্যে সর্বাধিক সাত-আট ঘন্টা সময়। তার অধিকাংশ সময় চলে যায় প্রাইভেট টিউশন পড়ার জন্য। নিজের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কিছু করার সময় তার আদৌ থাকে না। তাহলে সে লিখবে কখন?

লিখিত হোম টাস্ক প্রবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের। কিন্তু, বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা 'শ্রেণিকক্ষে মাত্রাতিরিক্ত শিক্ষার্থী' আছে তাই সম্ভব নয় বলে অজুহাত দেখিয়ে লিখিত হোম টাস্ক দিতেই চান না। তারা বলেন—খাতা দেখার সময়

কই? তাছাড়া, বাড়তি ঝামেলা। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে অপরদিকে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে এসে বলতে হবে— 'স্যার, বাড়িতে পড়া তৈরি করতে দিলেন, কিন্তু, লিখতে দিলেন কই?' তখন শিক্ষক শিক্ষিকারাই অনুপ্রাণিত হয়ে পরের দিনের জন্যে 'লিখিত হোমটাস্ক' করতে দেবেন।

একটি শ্রেণিতে বা বিভাগে হয়তো একশো বা তার বেশি শিক্ষার্থী আছে। বাস্তবে থাকেও। একজন শিক্ষক-শিক্ষিকার হয়তো ছটি ক্লাস আছে। তাহলে তিনি কীভাবে খাতা সংশোধন করবেন? এই প্রশ্নটি আজ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদেরই চিন্তা করে সময় বের করতে হবে। যদি একটি পিরিয়ড ক্লাস না থাকে তাহলে ওই পিরিয়ডটি খাতা দেখার জন্য ব্যয় করা যাবে। ধরা যাক, একটি পিরিয়ডে ৩০টি খাতা দেখতে পারবেন। তাহলে, প্রতি শ্রেণির পাঁচটি করে খাতা দেখার জন্য আনলে ৬টি পিরিয়ডে ৩০টি খাতা হবে। এই হিসাব কেবলমাত্র একটি পিরিয়ড ফাঁকা থাকলে কার্যকরী হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে টিফিনে বা ছুটির পরে হলেও প্রতি শ্রেণির জন্যে অন্তত পাঁচটি করে খাতা দেখার সময় বের করতেই হবে। এক্ষেত্রে ছুটির পরও সময় দিতে হতে পারে।

এবার কীভাবে ওই খাতা সংগ্রহ করা হবে তা দেখা যাক। ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের লিখিত 'হোম টাস্ক' করতে পরামর্শ দিতে হবে। অভ্যাস করাতে হবে। ওরা হোম টাস্ক করছে এবিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। এই নিশ্চিত হওয়াটাই হল সাফল্যের প্রথম সোপান। কোন শ্রেণিতে একশোজন শিক্ষার্থী থাকলে তাদের প্রত্যেকের খাতা একই দিনে দেখা এবং সংশোধন করে দেওয়া সম্ভব নয়। পাঁচটি খাতা তো দেখে সংশোধন করে দেওয়া যাবে। ওই পাঁচটি খাতা-ই সংগ্রহ করতে হবে। শিক্ষার্থীরা নিশ্চিত করুক যে তারা প্রত্যেকেই লিখে এনেছে। শ্রেণিকক্ষে খাতাগুলি নিজের নিজের হাতে করে তুলে ধরে স্যারকে দেখাবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকমশাই তার মধ্য থেকে যে কোনো পাঁচজনের খাতা নিয়ে নেবেন। তারপর সময়মতো ওই খাতাগুলি দেখে শিক্ষকমশাই শিক্ষার্থীদের হাতে ফেরত দেবেন। প্রথম দিন পাঁচজনের খাতা নিলে পরের দিন ওই পাঁচজনের ভেতর থেকে একজনের এবং নতুন চারজনের খাতা নেবেন। এইভাবে খাতা নিলে ফাঁকি দেবার প্রবণতা কমে যাবে। কোন দিন কার খাতা দেখবেন তার কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি না থাকায় প্রত্যেকেই সতর্ক থাকবে এবং নির্দিষ্ট লিখিত হোম টাস্ক করবে। হোম টাস্ক করার প্রবণতা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলেও আবার নতুন করে শিক্ষার্থীরা শুরু করবে। 'লেখাপড়া' শব্দটির সৃষ্টির পিছনে যে যুক্তি ছিল তা ধীরে ধীরে সার্থক হবে।

# দৈনন্দিন জীবনে শিক্ষার্থীর সুষম সময় বণ্টন

শিক্ষাকে নিয়ে প্রতিনিয়ত যেমন গবেষণা চলছে ঠিক তেমনি শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবন এবং তার প্রতিদিনের সুষম সময় বণ্টন বিষয়ে প্রত্যেক অভিভাবকের নজর রাখা প্রয়োজন। সুষম সময় বণ্টন না করা হলে যে কেউ যে কোনো একটি বিষয়ের ওপর বেশি গুরত্ব দেবে, ফলে অন্য বিষয়টির জন্য যা সময় থাকা প্রয়োজন তা থাকবে না। অথচ, ওই সময়টির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তখন, সব কিছু ছেড়ে দিয়ে লেখাপড়ার সময় থেকে সময় নিয়ে ঘাটতি পূরণ করা হয়। ব্যাহত হয় শিক্ষার্থীর পাঠ তৈরি ও অনুশীলন। আমাদের দেশে এই সুষম সময় বণ্টনের অভাবে বহু শিক্ষার্থী ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টিকে সামান্য ভেবে গুরুত্ব দেন না অনেকেই। তার ফল ভোগ করে শিক্ষার্থী। তাই, আদর্শ শিক্ষার্থী তৈরিতে সুষম সময় বণ্টনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এখন সেই সময় বণ্টন কীভাবে তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

মানুষের সবার আগে প্রয়োজন ঘুম। অনেকে খাবার-এর কথা বললেও বিপরীত যুক্তি দেখিয়ে বলা যায় একজন মানুষ না খেয়ে দশদিন বাঁচতে পারে কিন্তু, না ঘুমিয়ে আদৌ সুস্থভাবে সে বাঁচতে পারবে না। তাই সবার আগে প্রয়োজন ঘুম এবং এই ঘুম-এর জন্য রাখা যায় ৬ ঘন্টা সময়। এরপর প্রয়োজন খাবার গ্রহণ। দিনরাতে একজন যদি মোট চারবার খায় তাহলে এই চারবার খেতে সময় লাগবে ২ ঘন্টা। নিজের ব্যক্তিগত প্রাত্যহিক কাজ এর জন্য সময় রাখা হয় ১ ঘন্টা। এবার একটু বেড়ানো, গল্প করা, আড্ডা দেওয়া, খেলাধুলা করা। অধিকাংশ ছেলেমেয়েকে বাড়ির কাজে সহায়তা করতে হয়। আমাদের এই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর প্রতিবাদ করতে পারে না কেউই, তারা নীরবে কাজ করে যায়। এই কাজ করার জন্য খরচ করতে হয় ২ ঘন্টা। এরপর বিদ্যালয়ে যাতায়াত করার জন্য ১ ঘন্টা সময় রাখা যেতে পারে। বিদ্যালয়ে মোট পাঁচ ঘন্টা থাকে একজন শিক্ষার্থী। এবার বাকি থাকে বাড়িতে নিজের পাঠ অনুশীলন। পাঠ বলতে বিদ্যালয় প্রদত্ত হোম টাস্ক তৈরি করা। লেখা ও পড়া = লেখাপড়া। এই লেখার কাজ ও পড়ার কাজ করতে প্রতি বিষয়ের জন্য প্রয়োজন হবে এক ঘন্টা করে সময়। তাহলে ৭টি পিরিয়ডের পড়া তৈরি করতে এবং লিখতে সময় লাগবে ৭ ঘন্টা।

তাহলে যা দাঁড়াল তা নিম্নরূপ —

| | |
|---|---|
| প্রতিদিন ঘুমের জন্য সময়- | ৬ ঘন্টা |
| খাবার জন্য | ২ ঘন্টা |
| নিজের ব্যক্তিগত কাজ | ১ ঘন্টা |
| বেড়ানো, খেলাধুলা, গল্প গুজব ও বাড়ির কাজ | ২ ঘন্টা |
| বিদ্যালয় যাতায়াতের জন্য | ১ ঘন্টা |
| বিদ্যালয়ে থাকার সময় | ৫ ঘন্টা |
| ৭ টি পিরিয়ডের পাঠ তৈরির জন্য | ৭ ঘন্টা |
| মোট সময় | ২৪ ঘন্টা |

কারও কারও ক্ষেত্রে বাড়ির কাজের জন্য কোনো সময় রাখতে হয় না। কেননা, বাড়িতে কোন কাজই তাদের করতে হয় না। তারা ওই সময়টিকে সাধারণত বেড়ানো খেলাধুলার জন্য ব্যয় করে। কেউ কেউ লেখাপড়ার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখে। শুধুমাত্র ওই সময়টুকু ছাড়া আর কোনো সময় পরিবর্তনসাপেক্ষ নয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী এইভাবে সময়কে কাজে লাগালে সে তার সঠিক ফল পাবেই পাবে।

# শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা ঃ
# অন্বেষণ ও বিকশিতকরণ প্রকল্প

একটি শিশু কোনো না কোনো একটি বিশেষত্ব নিয়ে জন্মায় যা তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করে রাখে। এদের এই সুপ্ত প্রতিভা সহজেই এবং ব্যাপক হারে খুঁজে বের করার নির্ভরযোগ্য উদ্যোগ বা প্রকল্প বিদ্যালয়গুলিতে সচরাচর গ্রহণ করা হয় না। এর পিছনে নানান কারণ থাকতেই পারে। তবে, একটি সার্থক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবং একগুচ্ছ উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা যে প্রতিষ্ঠানে আছেন সেখানে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে না এমনটা হতে পারে না। 'শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা অন্বেষণ ও বিকশিতকরণ প্রকল্প' প্রতি বিদ্যালয়েই গ্রহণ করা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন প্রত্যেকের উদ্যোগ, উদ্যম ও মানসিকতা। একটি মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবছর যে সমস্ত শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণিতে নতুন ভর্তি হচ্ছে তাদেরই সুপ্ত প্রতিভা সবার আগে খুঁজে বের করা যুক্তিসঙ্গত এবং প্রয়োজনও । এখন কী ভাবে তা সম্ভব দেখা যাক। এই প্রকল্পে শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ছাড়াও আরও কতকগুলি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে পারা যায়। সম্ভব হলে প্রতি শ্রেণিতেও করা যায়। এক বছর প্রতি শ্রেণিতে প্রতিভা অন্বেষণ করে নিয়ে পরের বছর থেকে কেবলমাত্র পঞ্চম শ্রেণির প্রতিভা অন্বেষণ করলে কেউ বাদ থাকবে না, সকলকেই এই প্রকল্পের আওতায় আনা যাবে। পাশাপাশি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকলে উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। এক্ষেত্রেও নবম শ্রেণিতে প্রতিভা অন্বেষণ করা বিশেষ প্রয়োজন। যে শ্রেণিতেই করা হোক না কেন বেশ কিছু বিষয় খুঁজে বের করে একটি স্থায়ী রেজিস্টার করা যেতে পারে। তাতে এই বিষয়গুলি পরপর বাঁ দিক থেকে ডানদিকে লেখা থাকবে।

শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা ঃ- অন্বেষণ ও বিকশিতকরণ প্রকল্প

শ্রেণি- বিদ্যালয়ের নাম-

বিভাগ- ডাকঘর- জেলা-

অন্বেষণের তারিখ-

১। ক্রমিক সংখ্যা ২। নাম ৩। বাধ্যতামূলক বিষয়— (ক) ইউনিফর্ম (খ) পাঠ্যপুস্তকের যত্ন (পঞ্চম শ্রেণির জন্য) ৪। যোগ্যতামতো বিষয় — (১) সাধারণ —(ক) আবৃত্তি (খ) গান (গ) নাচ (ঘ) অভিনয় (ঙ) রচনাপাঠ (চ) বক্তব্য (ছ) হরবোলা (জ) ছবি আঁকা (ঝ) সুন্দর করে লেখা (২) বাদ্যযন্ত্র বাদন— (ক) তবলা (খ) গিটার (গ) বাঁশি (ঘ) বেহালা (ঙ) অন্যান্য (৩) যে কিছুই পারে না (৪) অন্যান্য।

মে মাসে বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন শুরু হয়ে যাবার পর দীর্ঘ ব্যবধানের একটি দিন স্থির করে বেশ কিছু আগেই এরূপ একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে জানিয়ে দিয়ে ওই দিন প্রত্যেককে উপস্থিত থাকার বিষয় বলে দিতে হবে। ঐ দিন যেন প্রত্যেকেই তাদের বিদ্যালয় নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পরে আসে এবং পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাদের সমস্ত সরকারি পাঠ্যপুস্তক অবশ্যই আনে তাও জানিয়ে দিতে হবে। যে দিন যে শ্রেণির হবে সেদিন সেই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রথম পিরিয়ডের পর পঠন-পাঠন বন্ধ রেখে শ্রেণিকক্ষে বা কোনো হলঘর থাকলে সেখানেই এরূপ অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে অন্যান্য যে শ্রেণিগুলির পঠন-পাঠন চলছে তাদের যেন কোনো অসুবিধে না হয়। যেদিন অনুষ্ঠান হবে সেদিন কর্মশিক্ষার শিক্ষক বা সাংস্কৃতিক বিষয়ে দক্ষ বা আগ্রহী এক বা একাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন এবং কার কোন বিষয়ে দক্ষতা আছে তা নিরূপণ করবেন। ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে শিক্ষার্থীদের ডেকে তাদের পাঠ্যপুস্তকগুলি দেখবেন, ইউনিফর্ম দেখবেন এবং যার যে বিষয়ে দক্ষতা আছে জানার জন্য রেজিস্টারে লেখা বিষয়গুলি পরপর বলে যাবেন এবং শিক্ষার্থীরা তাদের যে বিষয়ে সামান্যতম দক্ষতা আছে তা দেখাবে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা সামান্য দক্ষতা আছে দেখলেই সেই শিক্ষার্থীর ঘরের পাশাপাশি ডানদিকে বিষয়গুলির তলায়(✓) টিক চিহ্ন বসাবেন বাকি ঘরগুলিতে (×) ক্রশ চিহ্ন দেবেন। যদি এমন কেউ থাকে যে ওই বিষয়গুলির কোনটিতেই তার দক্ষতা নেই তাহলে 'যে কিছুই পারে না' বলে যে ঘরটি আছে সেই ঘরটিতে তার নামের পাশে (✓)টিক চিহ্ন বসবে।

এই অনুসন্ধান কাজে যে দীর্ঘ সময় লাগবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। যে আবৃত্তি করবে সে কবিতার একটি স্তবক বললেই বুঝতে পারা যাবে যে তার ওই বিষয়ে দক্ষতা আছে। তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে অন্য বিষয়ে দক্ষতা থাকলে তা উপস্থাপন করতে বলা হবে। এইভাবে গান, নাচ, অভিনয়, বক্তব্য সব কিছুরই আংশিক উপস্থাপন করিয়ে পরিমাপ করা যাবে। অবশ্য হাতে সময় থাকলে সম্পূর্ণ দেখা যেতে পারে।

অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শেষ হলে পরবর্তী সময়ে যে বিষয়গুলির ওপর প্রশিক্ষন বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোতেই দেওয়া যাবে সেই বিষয়গুলিতে সেইভাবেই শিক্ষার্থীদের আরও দক্ষ করে তোলার চেষ্টা করা যেতে পারে। যে বিষয়গুলি সম্ভব হবে না অথচ, শিক্ষার্থীর সেই বিষয়ে ভালো দক্ষতা আছে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। এর জন্য শ্রেণিভিত্তিক অভিভাবক সভা ডাকার যে সরকারি নির্দেশ আছে তা অনুসরণ করে লেখাপড়ার বিষয়টি যেমন তুলে ধরা যাবে তেমনি এই সহপাঠক্রমিক বিষয়ে দক্ষতার কথা তুলে ধরে সেই সেই বিষয়ে তাঁদের ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দেবার অনুরোধ জানাতে হবে।

এই কাজটির জন্য হয়তো বা স্বাভাবিক কাজকর্মের বাইরে কিছু পরিশ্রম করতে হবে। তাই, এ বিষয়ে প্রয়োজন প্রত্যেকের সহযোগিতা এবং সর্বোপরি উদ্যোগ। আন্তরিকভাবে বিষয়টি গ্রহণ করে প্রত্যেকে এগিয়ে এলে একটা ইতিবাচক দিক অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। এর জন্য সবার আগে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে যে ছেলেমানুষটি লুকিয়ে আছে তাকে খুঁজে বের করে আনতে হবে। এবং তখনই দেখা যাবে আমরা সফল এবং আমাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক।

# বিদ্যালয়ে প্রভিশন্যাল ক্লাস ঃ একটু সদিচ্ছা

পশ্চিমবঙ্গো বিদ্যালয় শিক্ষা নিয়ে যেখানে প্রতিনিয়ত নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, ঠিক তখনই একটি সমস্যা শিক্ষা প্রশাসনকে ভাবিয়ে তুলছে। প্রায় প্রতিদিনই একটি বিদ্যালয়ে শ্রেণি পঠন-পাঠনের দিনগুলি থেকে বেশ কিছুটা সময় হারিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে হৈ-চৈ ও কম হচ্ছে না, অথচ স্থায়ী সমাধানে ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে – তা হল, বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রভিশন্যাল ক্লাস। অভিভাবক তথা জনসাধারণের কাছ থেকে শোনা যায়— ছেলে-মেয়েরা বাড়ি ফিরে গিয়ে বলছে— আজ অমুক অমুক স্যার আসেননি, তাই তাঁদের ক্লাসও হল না। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভায় শিক্ষক প্রতিনিধিরা কোনো সদুত্তর দিতে পারেন না। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গো একান্তে কথা বলে দেখা গেছে— প্রকৃতই একজন শিক্ষক-শিক্ষিকা অনুপস্থিত থাকলে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই তাঁদের নির্ধারিত ক্লাসগুলি ফাঁকা যায়। প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কণ্ঠ থেকেও সেই একই সুরের অনুরণন। উত্তর আসে— কাকে ক্লাসে পাঠাব? যাঁদের ২৫ টি ক্লাস সপ্তাহে করতে হয় তাঁরা তো যাবেনই না, তাছাড়া যাঁদের কম ক্লাস করতে হয় তাঁরা একগুচ্ছ অজুহাত দেখিয়ে বলেন— 'আমার অমুক বিষয় আর যে ক্লাস ফাঁকা যাচ্ছে সে তো আমার বিষয় নয়—আমি গিয়ে কী পড়াবো!' প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনেক সময় দলবদ্ধ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের কাছে নিরুপায় হয়ে যান। নির্যাতিত হয় শিক্ষার্থীরা। তারা বয়সোচিত ধর্মে কিছু জানতে চায়, শুনতে চায়, আবার চুপচাপ বসেও থাকতে পারে না। অথচ, এই সময়টিকে কাজে লাগাতে পারলে শিক্ষার্থীদের একটি বিরাট ঘাটতি খুব সহজেই পূরণ করা যায়, শিক্ষা তথা সমাজ জীবনে বিপ্লব ঘটানো যায়। কিন্তু, সেকথা কজন ভাবে? সবাই নেতিবাচক রোগের শিকার। ইতিবাচক চিন্তা করার মতো সময় তাদের নেই। 'কী করে সম্ভব', 'অবাস্তব', 'অসম্ভব', 'এ নির্যাতন', 'হেডমাস্টার যাক না', ইত্যাদি নানান অমানবিক শব্দ তিরের ফলার মতো ওপ্রান্ত থেকে ছুটে আসে।

শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রয়োজনে তাঁদের পাওনা ছুটি অবশ্যই নেবেন। তাঁদের নির্ধারিত ক্লাসগুলি করার প্রযোজনীয়তাও চিরদিন থাকবে। এই সমস্যাও তাই চিরকালীন। তাই, এর একটা স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। কিন্তু, কীভাবে সেই সমাধান করা যায় তাই নিয়ে শিক্ষা প্রশাসনও অস্বস্তিতে ভুগছে। ঠিক, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা কিছু ভাবতেই পারি— কিছু করতেও পারি। কিন্তু, অনেকেই ভাবেন না। চিন্তা করেন না। সময় কোথায়? নিছক চাকরি করার মানসিকতা নিয়ে যাঁরা আসেন তাঁদের নিয়েই সমস্যা। অথচ, যাঁরা কিছু করতে চান তাঁরা ওই সময়টুকু সদ্ব্যবহার করার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে থাকেন। এই শ্রেণির শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কম হলেও আছে। তা না হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যেত।

আজকের দিনে যাঁরা অন্য বিষয়ের শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও তার বিপরীত বিষয়ের একটি ক্লাসে যান তাঁরা বিষয় খুঁজে বের করে পড়ান। তাঁদের সহযোগিতা করার জন্য আরও কিছু প্রস্তাব তুলে ধরা হল। যাঁরা নানান অজুহাত দেখান তাঁরাও একটু ভেবে দেখতে পারেন। কোনো প্রভিশন্যাল ক্লাসে গিয়ে বিষয় বহির্ভূত হাজারো বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের অভাব পূরণ করা যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষে গিয়ে আপনি অনায়াসেই বলতে পারেন- 'তোমরা খাতায় তোমাদের নাম, ঠিকানা লেখো'। বোর্ডে তুলেও লেখাতে পারেন, বেশ কয়েকজনকে। দেখবেন অনেক মেয়ে এখনও 'অঞ্জলী' বানান লিখছে, অনেক ছেলে নির্দ্বিধায় 'দেবাসীস/দেবাশীস' লিখছে। আমরা তো সহজেই 'অঞ্জলি'কে এবং 'দেবাশিস'কে এই বানান শেখাতে পারি। ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ঠিকানায় এরকম হাজারো বানান ভুল চোখে পড়ে। অথচ, খুব অল্প সময়ে এবং পরিশ্রমে তা সংশোধন করে দেওয়া যায়।

অন্য একটি ক্লাসে এসে নিজের জেলায় কটি মহকুমা আছে, নিজের মহকুমায় কটি থানা আছে, নিজের থানায় কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মেছেন কিনা-তাঁদের পরিচয়, কোনো দর্শনীয় স্থান আছে কিনা, কোনো প্রাচীন স্থাপত্য শিল্প বা নিদর্শন থাকলে তার ইতিহাস এসব হাজারো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে মনে হবে—সময়টা কখন শেষ হয়ে গেল, আরও একটু সময় পাওয়া গেলে ভালো হত। নিজেই ভেবে দেখুন, এইসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শেখানোর মতো সুযোগ কম। অভিভাবকরা তো প্রাইভেট টিউটরের কাছে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। প্রাইভেট টিউটররাও নির্দিষ্ট সময়ে সিলেবাস শেষ করতে ব্যস্ত। তাই, এই সামান্য সময়ে সাধারণ জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ করা যায় না। অথচ, খুব সহজেই করা যায়। পরিতাপের বিষয়—এইরকম পরিবেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে গিয়ে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের গভীরতা দেখালেও শিক্ষকতার জন্য সাক্ষাৎকারে গিয়ে নিজের জেলায় কটি মহকুমা বলতে পারেন না এমন প্রার্থীদেরও পাওয়া গেছে।

এইরকম উদাহরণ বর্তমানে ভুরি ভুরি আছে। যিনি কোনো প্রভিশন্যাল ক্লাসে যাবেন—তিনি যদি কিছু নাও পড়ান বা আলোচনা করেন—শুধুমাত্র বলেন— 'দশ মিনিট তোমরা চুপচাপ বসে থাকো, কোনো কথা বলবে না' এইভাবে তিনবার করলেই ক্লাসটি শেষ হয়ে যাবে। অথচ, এরই মাঝে চুপচাপ থেকে 'ধ্যান' প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া যায়। যা আমরা স্বামীজির শৈশবে লক্ষ করেছি। এর ফলাফল আমরা শ্রেণিকক্ষে বা তার বাইরে গিয়েই সঙ্গো সঙ্গো পাব তা ঠিক নয়—এর ফল ভবিষ্যতে মিলবে।

এছাড়াও তাৎক্ষণিকভাবে বিষয় বলে দিয়ে ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটিকা, গল্প প্রভৃতি লিখতে বললে তা বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশের সহায়ক হবে।

সামান্য দু-একটি পদ্ধতি নিয়ে এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা হল। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিজ বুদ্ধি ও কৌশলে এরকম হাজারো পদ্ধতি বের করে শিক্ষার্থীদের মনপ্রাণ ভরিয়ে তুলতে পারবেন। শুধু চাই একটু সদিচ্ছা।

# স্কুল পালানো শিক্ষার্থী ঃ সমস্যা ও সমাধান সূত্র

শিক্ষাকে নিয়ে দিন দিন যত গবেষণা হচ্ছে, উপায় উদ্ভাবন হচ্ছে পাশাপাশি নানান সমস্যা ও শিক্ষাদান পদ্ধতিকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছে। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের স্কুল পালানো একটি বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সামাজিক নানান পরিবেশ ও পরিস্থিতি শিক্ষার্থীদের মনকে এমনভাবে প্রভাবিত করছে যে, তারা নিজেদের সর্বনাশ করতেও পিছপা হচ্ছে না। কী ভালো কী খারাপ এই বিচার বিবেচনা-বোধ শেষ হয়ে গেছে। কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী মানুষের কুমন্ত্রণায় বিদ্যালয়ে 'কিছু হচ্ছে না, হবে না' এরূপ ভ্রান্ত ধারণা শিক্ষার্থীদের মনে গেঁথে গেছে। তারা বিকল্প পথের খোঁজ পেতে ছুটে চলেছে টিউটোরিয়াল হোমে বা ব্যক্তিগতভাবে গৃহশিক্ষক রেখে তাঁর কাছে তালিম নিতে। বর্তমানে গৃহশিক্ষকরা এত বেশি ব্যস্ত যে তাঁরা সময় দিতে পারছেন না। তাই, বিদ্যালয় চলাকালীন সময়েও খুলে রেখেছেন প্রাইভেট শিক্ষাকেন্দ্র। এমনকি শিক্ষার্থীদের বাড়িতে তাঁরা পড়াতে চলে যাচ্ছেন। বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীদের সেইদিনগুলিতে বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ রাখতে হচ্ছে, নয়তো বা বিদ্যালয় থেকে বলে বা না বলে চলে আসতে হচ্ছে। কিছু কিছু বিদ্যালয়ে টিফিনের বিরতির পর শিক্ষার্থীর সংখ্যা অর্ধেকের বেশি কমে যেতে দেখা যাচ্ছে। এ একটা সংক্রামক রোগ। এই রোগ থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করতে না পারলে শিক্ষার্থীদের তো কিছুই হবে না উপরন্তু, শিক্ষক শিক্ষিকাদের বা প্রতিষ্ঠানের বদনাম হবে।

এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে শিক্ষক সমাজ ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রথমেই অভিভাবক সভায় এই স্কুলপালানো শিক্ষার্থীদের কথা তুলে ধরতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় আলোচনা সভা ডেকে অভিভাবকদের এবং জনসাধারণকে এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, একদিনেই একশো শতাংশ সুফল পাওয়া যাবে না তবে, সেন্ট পারসেন্ট না হোক টেন পারসেন্টও তো উন্নতি হবে। এটাই তো বিরাট পাওয়া। এর পরে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীন নিয়মনীতিকে কাজে লাগানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষা বিভাগের নির্দেশ আছে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সত্তর শতাংশ উপস্থিতি না থাকলে স্বাভাবিক নিয়মে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না। এই নির্দেশনামাকে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে। নিয়মিতভাবে প্রচার চালিয়ে এবং প্রয়োগ করে বাস্তবায়িত না করলে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে সচেতন হবে না। ধীরে ধীরে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও শিক্ষাপরিষদের যৌথ আলোচনায় অন্যান্য শ্রেণিগুলিতেও এই নিয়ম অন্তত আংশিকভাবে হলেও প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণভাবে উপস্থিতির জন্য প্রতিদিন যেমন শিক্ষার্থীদের

হাজিরা খাতায় উপস্থিতি নেওয়া হচ্ছে এবং প্রতিদিনের উপস্থিতির সংখ্যা তলায় যোগ করে দেখানো হচ্ছে ঠিক তেমনি মাসের শেষে ডানদিকে এক একজন শিক্ষার্থীর মাসে কত উপস্থিতি হচ্ছে তাও শ্রেণিশিক্ষককে যোগ করে মাসের শেষ দিনে ওই শ্রেণি কক্ষেই বলে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রতিদিন দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় উপস্থিতি গ্রহণের জন্য ব্যয় করা হয়। যদি তার কোনো সুফল না পাওয়া যায় বা সে বিষয়ে আর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তাহলে এই সময় ব্যয় করে লাভ কী?

টিফিনের বিরতির সময় না বলে চলে যাওয়াটা একটা বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বদ অভ্যাস দূর করতে শেষ পিরিয়ডেও অনুরূপভাবে উপস্থিতি গ্রহণ করতে হবে। শুধু তা-ই নয়, সেই উপস্থিতির গুরুত্ব দিয়ে উপস্থিতির হার নির্ণয় করা প্রয়োজন। এভাবেও কিছু শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা যাবে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক খেলাধুলা, কোনো মনীষীর জন্মদিন পালনের অনুষ্ঠানে অনেক বিদ্যালয়ে দেখা যায় কোনো উপস্থিতি সেদিন লিপিবন্ধ করা হয়নি। এক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর উপস্থিতি দু-বার করে লিপিবন্ধ করা প্রয়োজন।

এছাড়াও স্কুল পালানো রোধ করতে হলে আইন শৃঙ্খলার দিকটি ভিন্ন অন্য দিকেও শিক্ষক শিক্ষিকাদের আরও যত্নবান হতে হবে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কর্মশিক্ষার নম্বরকে নতুনভাবে প্রদানের ব্যবস্থা করে উপস্থিতির জন্য নম্বর প্রদান করতে হবে। আরও আকর্ষণীয়, মনোজ্ঞ ও সহজবোধ্য ভাবে পাঠদান করে শিক্ষার্থীদের কাছে তা হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীরা যেন উপলব্ধি করতে পারে এই পাঠদানের আর কোন বিকল্প নেই বা থাকতে পারে না। এই উপলব্ধি আনয়নই হল শিক্ষক জীবনের সার্থকতা। এর জন্য ধরা বাঁধা সময়সূচি ধরে নয় আরও মানবিক ও উদার হতে হবে। ভাবতে শিখতে হবে এদের জন্যই আমি এবং এরাই আমার একান্ত আপনজন। তাই, সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মূল দায়িত্ব শিক্ষক সমাজকেই নিতে হবে।

# বিদ্যালয় পত্রিকা ও রচনা নির্বাচন

বিদ্যালয় পত্রিকা বিদ্যালয়ের দর্পণ। বিদ্যালয়ের সামগ্রিক চিত্র ফুটে ওঠে বিদ্যালয় পত্রিকার মাধ্যমেই। সারা বছরের কাজকর্ম, সুধীজনদের পরামর্শ থেকে শুরু করে বিগতদিনের ইতিহাস, আগামী দিনের কর্মসূচি সবই একনজরে ফুটে ওঠে বিদ্যালয় পত্রিকার পাতায়। এছাড়াও আজকের খুদে লেখক কবিটির রচনাও তো বিদ্যালয় পত্রিকার মাধ্যমে প্রত্যেকের কাছে যাবে। এই লেখক কবিটিই তো একদিন বিশ্ববরেণ্য হতে পারে। তাকে বীজ থেকে অঙ্কুরে পরিণত করার উপযুক্ত পাত্র হল বিদ্যালয় পত্রিকা। তখন তার কাছে স্মৃতি হয়ে থাকবে আজকের এই প্রচেষ্টা। প্রতিটি বিদ্যালয়েরই পত্রিকা প্রকাশ করা প্রয়োজন। অনেকে প্রকাশ করেন, কেউ কেউ বা করেন না। অজুহাত দেখান খরচ খরচা অনেক বেশি। আয় কম। কী করে সম্ভব হবে! এই কথাগুলো নেহাতই অজুহাত। সদিচ্ছা থাকলে এবং পরিকল্পনায় সততা থাকলে একটি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অর্থসমস্যা কোনো প্রতিবন্ধক হতে পারে না। প্রতি বছর সম্ভব না হলেও দু বছর অন্তর মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশ করা অবশ্যই যাবে। এছাড়াও প্রতি দু মাস অন্তর দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। অনেকে অবশ্য রচনা নির্বাচনকে সমস্যা হিসেবে তুলে ধরেন। কারণ দেখান —পত্রিকা প্রকাশ হবে বলে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞপ্তি দিলেই শিক্ষার্থীদের অনেকেই লেখা জমা দেবে। কে না চায় তার নামটি ছাপার অক্ষরে দেখতে? রচনা জমা দেওয়ার সময় তারা হাতের কাছে যে পত্রপত্রিকা পায় অনেকেই তার থেকে পছন্দমতো একটি রচনা হুবহু নকল করে এনে পাশে নিজের নামটি বেশ দক্ষতার সঙ্গে লিখে জমা দেয়। যারা একটু বেশি চালাক তারা বাড়ির গুরুজনদের কাছ থেকে লিখিয়ে এনে অনেক সময় তার কোনো অনুলিপি না করেই অবিকল লেখাটিই জমা দেয়। এ দুটোই অবশ্য বাস্তব সমস্যা। এই সমস্যায় প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়কেই ভুগতে হয়। এরই মধ্যে কিছু ভাল লেখাকে নির্বাচন করে অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ করতে হয় পত্রিকা। কিন্তু, এতে লাভ কী? ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারাও অনেক সময়ে এই বিষয়ে হতাশ হন। কিন্তু, বিকল্প ব্যবস্থার কথা অনেকেই ভাবেন না।

এ কথা তো বাস্তব যে সবাই লেখক বা কবি নয় এবং হওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু, যাদের প্রতিভা আছে তাদের তো সুযোগ দিতেই হবে। আবার কারও যদি প্রচেষ্টা থাকে তারও তো ফললাভ হতে পারে। এখন এই শ্রেণির কবি লেখকদের জন্যেই প্রত্যেককেই একটু ভাবতে হবে, সময় দিতে হবে। অকারণ পাতা ভর্তির জন্য ধার করে আনা বা চুরি করে আনা লেখা প্রকাশ করা যাবে না। প্রকৃত লেখক কবিদের খুঁজে বের করে তাদের লেখা তা সে যতই

নিম্নমানের হোক না কেন তাই দিয়ে পত্রিকার পাতা পূরণ করতে হবে। এখন কীভাবে সম্ভব হবে তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

একজন দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকার অবশ্যই নজরে থাকে একটি শ্রেণিকক্ষে অসংখ্য ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে কোনো খুদে লেখক কবি আছে কিনা। প্রথমে তাদের চিহ্নিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, পত্রিকা প্রকাশ হবে বলে কোনো বিজ্ঞপ্তি দেওয়া চলবে না। সারা বছরব্যাপী চলবে রচনা সংগ্রহ অভিযান। কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকা কোনো একটি শ্রেণিতে গিয়ে তো বলতেই পারেন 'শুনেছি' তোমাদের শ্রেণিতে অনেকেই ভালো কবিতা, প্রবন্ধ, ছড়া লিখতে পারো। সাম্প্রতিককালে বাঙালিদের কাছে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেগেল 'নোবেল পুরস্কার চুরি'। আচ্ছা, এই বিষয় নিয়ে কেউ কবিতা, কেউ প্রবন্ধ লেখো'। এইভাবে শ্রেণি উপযোগী ছড়া, কবিতা ,প্রবন্ধ, নাটিকা, গল্প প্রভৃতি লিখতে দেওয়া যায়। গল্পের সংকেত বলে দিয়ে তার ওপর ভিত্তি করে গল্প লিখতে বলা যায়। তাছাড়া, ছড়ার ক্ষেত্রে প্রথম ছত্র লিখে দিয়ে বাকি সাত, নয় বা এগারোটি ছত্র লিখে ছড়াটি সম্পূর্ণ করতে বলা যায়। লিমেরিকের ক্ষেত্রেও প্রথম ছত্রটি বলে দিয়ে বাকি চারটি ছত্র লিখতে বলা যায়। অবশ্য নতুন কবি ছড়াকারদের ছড়া এবং লিমেরিক লেখার নিয়ম কানুন বলে দিতে হবে। কোনো ঘটনা বলে সেই ঘটনার ওপর ছোটো নাটিকা লিখতে দেওয়া যায়। অনেকেই লিখবে। তার ভেতর থেকে এক বা একাধিক রচনা নির্বাচন করে তা পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে। এক্ষেত্রে একই বিষয়ের ওপর একাধিক রচনা হলেও তা দোষের নয়। কেননা, মনে রাখতে হবে নিজস্বতা ফিরিয়ে আনার জন্যেই এই উদ্যোগ। বিদ্যালয়ে পত্রিকার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে একদিকে চুরি বন্ধ হবে অপরদিকে বাড়ির গুরুজনদের লিখে দেওয়ার প্রবণতা কমবে। শিক্ষার্থীর রচনাটি হাতে নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা এই খুদে লেখক, কবি, ছড়াকারকে সামনে রেখে প্রয়োজনমতো সংশোধন করে দিলেই তা যথেষ্ট হবে। বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক শিক্ষিকার অনুপস্থিতিতে প্রভিশন্যাল ক্লাস নিতে গিয়ে 'কী পড়াব, এতো আমার বিষয় নয়' বলে অনেকে সময় নষ্ট করেন বা উষ্মা প্রকাশ করেন। সদিচ্ছা থাকলে তাঁরা সহজেই এই কাজটি সমাধা করতে পারেন। এইভাবে রচনা সংগ্রহ করলে রচনার মান যত কমই হোক না কেন এই রচনাটিই হবে সবচেয়ে সুন্দর এবং মূল্যবান। শিক্ষক শিক্ষিকাদের হতাশ না হয়ে একটু সময় দেবার মতো মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে গেলেই রচনা নির্বাচন এবং বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশ সহজতর হবে।

# বিদ্যালয় পাঠাগার ও শিক্ষার্থী

পাঠাগার মানব-জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। জ্ঞান আহরণের এই সঠিক ও সর্বজন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানটির ব্যবহার যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত থেকে উন্নততর হতে হতে বর্তমানে এক অত্যাধুনিক কর্মশালায় রূপান্তরিত হয়েছে। বিজ্ঞানের ও মুদ্রণ শিল্পের দ্রুত উন্নতির ফলে স্বল্প সময়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ গ্রন্থাগার আলোকিত করছে। তবে, নানান ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার জন্য মানুষের মন পড়া অপেক্ষা দেখা বা শোনার দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মনে দ্রুত এই প্রভাব সংক্রমিত হচ্ছে। ফলে, আজকাল পাঠাগারে পাঠকের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান, যা খুবই উদ্বিগ্ন করে তুলছে শিক্ষাবিদ তথা চিন্তাবিদদের। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা নিজে পড়া, পাঠাগারের সাহায্য নিয়ে পড়া অপেক্ষা প্রাইভেট পড়াকে এতো বেশি করে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং নিজে না পড়ে অপরের পড়াকে ক্যাপসুল আকারে গলাধঃকরণ করছে তা খুবই উদ্বেজনক। সাধারণ পাঠাগারে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের তো দেখাই যাচ্ছে না, উপরন্তু, বিদ্যালয় পাঠাগারে আকর্ষণীয় গ্রন্থ থাকতেও তারা আকৃষ্ট হচ্ছে না। এর ফল খুবই বিষময়। এইভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন পাঠাগারের অস্তিত্ব কেবলমাত্র গ্রন্থ সংগ্রহাগার হিসেবেই থাকবে, পাঠাগাররূপে গণ্য হবে না। এই মুহূর্তে শিক্ষিত মহলকে রুখে দাঁড়াতে হবে। বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর ৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব আছে এবং একজন বিদ্যালয় পরিদর্শকের ওপরও যে এই বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থীর দেখভাল করার দায়িত্ব আছে তা কাজে লাগাতে হবে। প্রত্যেককে গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পাঠাগার অভিমুখী করে তুলতে হবে। এখন কীভাবে এই দুঃসাধ্য কাজ সহজেই করা যেতে পারে তা দেখা যাক। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে 'সর্বশিক্ষা অভিযান' এবং 'জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প, এর মাধ্যমে শিশুদের উপযোগী অনেক পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করা হয়েছে। এখন ওই বইগুলিকে শিক্ষার্থীদের হাতে দিয়ে বিদ্যালয় পরিবেশেই তাদের পড়ার মতো মানসিকতা যাতে গড়ে ওঠে তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করতে হবে। এই কাজ মোটেই কঠিন নয়। খুব সহজেই কর‍্যা যায়। ওই সকল শিক্ষার্থীরা সাদা কাগজ। ওদের ওই সাদা কাগজমনে যে ভাবে দাগ কাটা যাবে সেইভাবেই দাগ পড়বে। প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকাদের একটু সদিচ্ছা ও সহমর্মিতা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে এই পাঠাগার বিমুখ শিক্ষার্থীদের কীভাবে পাঠাগার অভিমুখী করানো যায় তার চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। এই সকল শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অনেক রকম পদ্ধতি আরোপ করা যায়। তবে, তার মধ্যে আলোচ্য পদ্ধতিটি নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এগিয়ে যাওয়া যেতেই পারে। পঞ্চম শ্রেণিতে যে সকল শিক্ষার্থীরা আসবে তাদের নাকি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অঙ্গা হিসেবে গণ্য করে তাদের জন্যে প্রাথমিক যে দায়িত্ব আছে তা অনেক মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষিকা ভুলে যান। ওরা শিশু। ওদের সকাল করে ছেড়ে দিতে হবেএই অজুহাতে অনেক বিদ্যালয়েই পঞ্চম পিরিয়ডের পরে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ছুটি দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও বা ষষ্ঠ পিরিয়ডেই তাদের পঠন-পাঠন শেষ হয়। এক্ষেত্রে ষষ্ঠ-সপ্তম বা সপ্তম পিরিয়ডে ওই শ্রেণির জন্য লাইব্রেরি ক্লাস রেখে শিক্ষার্থীদের জন্য বই দেওয়া যেতে পারে। ওরাই শ্রেণিকক্ষে নিজেদের পাঠ্য বই রেখে খালি হাতে লাইব্রেরিতে গিয়ে তাদের পছন্দমতো বই-এর পাতা ওল্টাবে, দেখবে,পড়বে। ভারপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান বিষয়টি তদারকি করবেন। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে লাইব্রেরিয়ান নেই সেখানে কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকাই এই দায়িত্ব নিতে পারেন। এছাড়াও এক একটি শ্রেণির জন্য পাঠাগারের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুজন বা তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকা ওই সময় এসে শিক্ষার্থীরা যে বইগুলি পড়ল তার কিছু কিছু অংশ যদি জানতে চান তাহলে প্রক্রিয়াটি আরও সহজ হবে এবং শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হয়ে বই পড়তে চাইবে। কেবলমাত্র পঞ্চম শ্রেণি নয়, প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট একটি করে পিরিয়ড রেখে এমন কি ছুটির পরেও এইভাবে পাঠাগারের জন্য কিছু সময় ব্যয় করার ব্যবস্থা করলে পাঠাগার বিমুখী শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করা যাবে। যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অপরিহার্য।

শিক্ষার্থী সংখ্যা বর্তমানে এক একটি শ্রেণিতে অনেক বেশি এই অজুহাত দেখিয়ে কিছু নেতিবাচক মনোভাবাপন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা পাঠাগারের বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চান। কেউ কেউ বা অবাস্তব পরিকল্পনা বলে অন্যদের নিরুৎসাহিত করেন। তাই, অনেক সময় লাইব্রেরিকে উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু, প্রত্যেকের জেনে রাখা প্রয়োজন শ্রেণিকক্ষের মতো আবশ্যিকভাবেই পাঠাগার সংশ্লিষ্ট পাঠকক্ষ রাখতে হবে। তাতে একটি শ্রেণি বা বিভাগের শিক্ষার্থীদের বসে পড়ার মতো পরিবেশ অবশ্যই তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রেও প্রয়োজন সদিচ্ছা, অর্থ নয়। সদিচ্ছা থাকলেই অর্থ আসবে এবং অর্থ এলেই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। শিক্ষাবিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককেই বাস্তবের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে কিছু ভাবতেই হবে। মনে রাখতে হবে সমাজ আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে।

# বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

প্রতিটি বিদ্যালয়েই সারা বছরব্যাপী নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় এবং তার মধ্যে বেশ বড়োসড়ো করে, জাঁকজমক করে হয় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। শিক্ষার্থীদের প্রতিভা ও আনুগত্য, শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রচেষ্টা ও দক্ষতা এবং বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির প্রেরণা ও উৎসাহ এই এতগুলির মিলনেই হয় একটি সার্থক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের লক্ষ্যই হল শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো এবং যে কোনো উপায়ে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করানো। আজকাল এমন একটা সংক্রমকব্যাধি এসেছে তা হল বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের সময় কমিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট টিউশন যাওয়া। একদিকে যেমন 'স্কুল পালানো'র মতো বদ অভ্যাস অন্য দিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকার মতো আরও একটি বদ অভ্যাস শিক্ষার্থীদের গ্রাস করে চলেছে। তাই, এই অনুষ্ঠানকে সফল করতে এবং শিক্ষার্থীদের বদ অভ্যাস দূর করতে প্রথম পিরিয়ডে বাধ্যতামূলক হাজিরা এবং অনুষ্ঠান শেষে শ্রেণিকক্ষে গিয়ে বাধ্যতামূলক হাজিরা নেবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এছাড়া, সবার আগে অনুষ্ঠান সার্থকভাবে পরিচালনা করতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কোনো না কোনো একটি দলের অন্তর্ভুক্ত করে সেই দলের ওপর কিছু না কিছু কাজের ভার দিতেই হবে। তাছাড়া, অনুষ্ঠান পরিচালনা করবে শিক্ষার্থীরাই। প্রতি শ্রেণি থেকে ঘোষক এবং পরিচালক নির্বাচন করে তাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। তাতে, একদিকে যেমন দক্ষতা বাড়বে অপরদিকে তেমনি অনুষ্ঠানে উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে। অনুষ্ঠানের জন্য মুখ্য কাজগুলিকে স্থির করে নিয়ে প্রয়োজনে আরও উপরিভাগে কাজগুলিকে ভাগ করে নিয়ে সেই কাজগুলিকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে শিক্ষার্থীদের সেইভাবে দায়িত্ব দিতে হবে। তাদের কাজ তদারকি করবে, আবার একদল শিক্ষার্থী। আবার তাদের কাজও অন্য একজন নির্বাচিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী তদারকি করবে। এইভাবে প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীকে কোনো না কোনো ভাবে একটি দলের সঙ্গো যুক্ত করতে হবে। এই দল গঠন শ্রেণিভিত্তিক বা বিভাগ ভিত্তিক করা যায় আবার বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়েও এক একটি দল গঠন করা যায়। মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে কোন না কোন দলের সঙ্গো যুক্ত রেখে তার ওপর একটি বা একাধিক কাজের দায়িত্ব দেওয়া। এবং প্রত্যেককে অংশগ্রহণ করিয়ে অনুষ্ঠানটিকে সার্থকভাবে রূপায়িত করা।

অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি বা অতিথিবৃন্দ আমন্ত্রিত হয়ে এসে সভার গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করেন। তাঁরা আলোচনা করেন বক্তব্য রাখেন এবং পুরস্কার প্রদানের সময় পুরস্কার প্রদানও করেন। এক্ষেত্রেও কিছু ব্যতিক্রম ঘটানো প্রয়োজন। তাঁরা মূল্যবান

আলোচনা করবেন, কেবলমাত্র দু' একটি পুরস্কার প্রদান করবেন। বাকি পুরস্কারগুলি কিন্তু শিক্ষার্থীরাই অন্য কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেবে। পুরস্কার নিতে এবং হাতে তুলে দিতে কে না চায়? অনুষ্ঠানের দিনে একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি থেকে সমাধা পর্বে বিভিন্ন শ্রেণি বিভাগ বা দল বা উপদলের শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা লক্ষ করে মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ এই তালিকা তৈরি করবেন এবং তাঁদের সভায় একের পর এক ডেকে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে উৎসাহিত করবেন। এতে একদিকে যেমন যোগ্যতার স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে উৎসাহিতও করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাবে। যে শিক্ষার্থী এইভাবে কোনো একটি অনুষ্ঠানে একজন সহপাঠী বা সতীর্থের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছে তার সেই স্মৃতি চিরদিন থাকবে। এইভাবে পুরস্কার প্রদানে যেমন আছে নতুনত্ব তেমনি এর প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী।

# বিদ্যালয়ে অভিভাবক সভা

শিক্ষার্থীরাই হল বিদ্যালয়ের প্রাণ। শিক্ষার্থীবিহীন বিদ্যালয়কে নিষ্প্রাণ মরুভূমির মতো মনে হয়। এই শিক্ষার্থীদের যাঁরা অভিভাবক তাঁরা হলেন বিদ্যালয়ের সম্পদ। তাই, অভিভাবকদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক নিবিড় হওয়া প্রয়োজন। এই সুসম্পর্ক গড়ে তোলার তাগিদে যোগাযোগ যাতে নিয়মিত থাকে তার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থী যতক্ষণ থাকে তার প্রায় চারগুণেরও বেশি সময় বাড়িতে অভিভাবকদের সঙ্গে থাকে। তাই, একজন শিক্ষার্থীর উন্নতি অবনতিতে একজন অভিভাবকের ভূমিকা কম নয়। শুধু, তাই নয়, দায়দায়িত্বও অনেক বেশি। অভিভাবক যদি নিরক্ষরও হন তাহলেও তাঁর বক্তব্য এবং শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা শুনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনেক বেশি সচেতন হতে পারবেন এবং সুপরামর্শ দিতে পারবেন। পরিতাপের বিষয়, সবাই সে দায়িত্ব পালন করেন না। তাঁরা তাঁদের পুত্রকন্যাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে নিয়মিত বিদ্যালয়ের ফিজ মিটিয়ে দিলেই না কি দায়মুক্ত! এছাড়াও, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত করে দিয়ে টিউশন পড়ালেই না কি তাঁরা বিরাট কিছু করে দেবেন। এই ভ্রান্ত ধারণার বশে অধিকাংশ অভিভাবক স্বল্পশিক্ষিত এমনকি প্রায় অশিক্ষিত প্রাইভেট টিউটর নিয়োগ করে নিজের দায় দায়িত্ব পালনের নামে শিক্ষার্থীদের মাথা চিবিয়ে খান।

এইসব ঘটনা বিশ্লেষণ করে অভিভাবকদের সচেতন করার এবং তাঁদের ছেলেমেয়েদের অগ্রগতির বা উত্থান পতনের চিত্রটি তুলে ধরতে বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে শ্রেণি বা বিভাগ ভিত্তিক অভিভাবকসভা আহ্বান করা প্রয়োজন। এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদের নির্দেশনামা আছে। বছরে দুটি শ্রেণিভিত্তিক অভিভাবক সভা হবে এবং তৃতীয় একটি বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে প্রত্যেকটি অভিভাবককে আমন্ত্রণ জানিয়ে অভিভাবক সভা বা অভিভাবক সপ্তাহ পালন করতে হবে। আদেশনামা নং-১৬-১-২০০১ তারিখের এস ৬৪। অনেক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এইসব ঝামেলা এড়িয়ে চলতে চান। কিন্তু না, বিদ্যালয়ে অভিভাবক সভা নিয়মিতভাবে ডাকতেই হবে।

এখন অভিভাবক সভা কীভাবে হতে পারে তা দেখা যাক। শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠন ও অগ্রগতির মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম কিন্তু, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদের ১৬-১-২০০১ তারিখের এস ৬৪ সংখ্যক নির্দেশনামায় পরিষ্কার করে বলা আছে। তাই, এই অভিভাবক সভার প্রস্তুতি, অগ্রগতি এবং পর্যালোচনার যাবতীয় কাজ শিক্ষা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকেই করতে হবে। তাই, এই বিষয়ে সবার আগে প্রয়োজন উন্নত মানসিকতা, আইনের ফাঁক-ফোকর খুঁজে পলায়নের চেষ্টা নয়। মানসিক প্রস্তুতি থাকলে তখন তার কোনো কাজই অসম্ভব মনে হবে না।

অভিভাবক সভার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ চিত্র সহজেই অভিভাবকদের সামনে তুলে ধরা যায়। শুধু লেখাপড়া নয়, সামাজিকতা, দায়বদ্ধতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা সহ হাজারো বিষয় নিয়ে সরাসরি আলোচনার মূল মঞ্চ হল বিদ্যালয়ে অভিভাবক সভা। 'সাংস্কৃতিক প্রতিভা অন্বেষণ প্রকল্প' গড়ে তুলে শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির দিকটি তুলে ধরে অভিভাবকদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাদের পুত্রকন্যার সার্বিক বিকাশের দ্বার উন্মুক্ত হবে। যার সুফল একদিন না একদিন শিক্ষার্থী, তার পরিবার এবং সমাজ পাবে।

এছাড়াও, বর্তমানের মূল সমস্যা হল বিদ্যালয়ে না আসা, টিউশনকে বিদ্যালয়ের বিকল্প হিসেবে দেখা এবং শিক্ষকদের শিক্ষাদানকে গ্রহণ না করে ভুলপথে চলা। অভিভাবক সভা আহ্বানের মাধ্যমে এর সমাধান সহজতর হবে।

একটি শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হলে যেমন বিদ্যালয় শিক্ষার প্রয়োজন, ঠিক তেমনি প্রয়োজন সচেতন অভিভাবকের। বিদ্যালয় শিক্ষা মূলত নির্ভর করে তিনটি শক্তির ওপর। তার মধ্যে প্রথম শক্তি শিক্ষার্থী নিজে, দ্বিতীয় শক্তি বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে সাহায্যকারী এবং তৃতীয় শক্তি হল এই দুই শক্তির মধ্যে যাঁরা সমন্বয় সাধন করেন অর্থাৎ অভিভাবকবৃন্দ। বর্তমানে আরও একটি শক্তি অগোচরে নিজের স্থান তৃতীয় করে নিয়েছে। অর্থাৎ তাঁরাই তৃতীয় শক্তি হিসেবে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের পঙ্গু করে তুলছে। এই তৃতীয় শক্তি সম্বন্ধে এবং তাঁদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অভিভাবকরা মোটেই সচেতন নন। এই শক্তি আগের দিনেও ছিল, তবে তখন ছিল শিক্ষার্থীর ঘাটতি পূরণে বা অধিক জানানোর জন্য বিদ্যালয় শিক্ষকের সহায়ক হিসেবে। বর্তমানে এদের স্থান হয়েছে বিদ্যালয় শিক্ষকের বিকল্প হিসেবে। বর্তমানে এদের অবস্থান নিয়ে শিক্ষক সমাজ যথেষ্টই উদ্বিগ্ন। কিন্তু, অভিভাবক সমাজ কীভাবে যে তাঁদের ছেলেমেয়েরা বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে তাঁর খোঁজ খবরই রাখেন না। কেননা, এই শ্রেণির অভিভাবকেরা 'প্রাইভেট টিউটর' নামক এই তৃতীয় শক্তির ওপর প্রথম শক্তিকে নির্ভরশীল করে তুলেছেন । ফল হচ্ছে শূন্য। যে সকল শিক্ষার্থীর নিজস্ব সচেতন শক্তি আছে তারা নিজেকে কাজে লাগায়, বিদ্যালয় শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করে এবং অতিরিক্ত জ্ঞানের জন্য প্রাইভেট টিউটরকে ব্যবহার করে উত্তরোত্তর এগিয়ে যায়। এদের দেখে সমস্ত অভিভাবকই একটা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। সে প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য নয়, প্রাইভেট টিউটরের সংখ্যা বৃদ্ধি করে নিজের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির হাস্যকর অভিপ্রায়ের জন্য। এই শ্রেণির অভিভাবকরা কম বোঝেন এবং বোঝার চেষ্টাও করেন না। এদের দুর্বলতার সুযোগে কিছু কিছু প্রাইভেট টিউটর যাদের অনেকেরই আদৌ কোনো শিক্ষকোচিত যোগ্যতা নেই, যাঁরা নিছক রোজগার-এর জন্য ওৎপেতে থাকেন তাঁরা অভিভাবকদের প্রভাবিত করে 'বিদ্যালয়গুলোতে আজকাল আদৌ কোনো পড়াশোনা হচ্ছে না'-এই গুজব রটিয়ে তাঁদের ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলার দায়িত্ব নিয়ে প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত হন। এক্ষেত্রেও ফল শূন্য। কেননা, এরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বা একই বিদ্যালয়ের নানান

শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে টিউটোরিয়াল হোম খুলে ব্যস্ত থাকেন। পৃথকভাবে যত্ন নেওয়ার সুযোগ না থাকায় শিক্ষার্থীদের আদৌ কোনো লাভ হয় না। তাই সাধারণ মানের শিক্ষার্থীদের উন্নতি তো দূরের কথা বরং অতিমাত্রায় দ্রুত অবনতি হয়। এরা শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্ররোচিত করে যে বিদ্যালয় শিক্ষক সম্বন্ধে একটা অহেতুক বিরূপ ধারণা ছাত্রছাত্রীদের মনে সঞ্চারিত হতে থাকে। তাই, শিক্ষার্থীরা পাশাপাশি পৃথকভাবে চলা বিদ্যালয় শিক্ষা ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ না করে টিউটোরিয়াল হোম-এর শিক্ষা বা পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে। একজন শিক্ষার্থী পাশাপাশি দুটি বিদ্যালয়ে পড়লে যা হয় তা-ই হচ্ছে। পাঠ্যসূচি দ্রুত শেষ করে দিতে এরা ব্যস্ত হন। শিক্ষার্থীদের কাছে তাঁরা প্রমাণ করতে চান যে বিদ্যালয় শিক্ষকদের চেয়ে তাঁরা কত এগিয়ে চলেছেন। এরা শিক্ষার্থীদের নিজস্ব পড়ার সময়ে ভাগ বসিয়ে তাদের চিন্তা-চেতনাকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। তাই বিদ্যালয় পাঠের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে টিউশনের পাঠের ওপর গুরুত্ব দিয়ে দুটির একটিতেও শিক্ষার্থীরা সফল হচ্ছে না। এই শ্রেণির অভিভাবকদের সচেতন করা প্রয়োজন। সেই দায়িত্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিজেদের স্বার্থেই নিতে হবে। তা না হলে এমন একদিন আসবে যেদিন বিদ্যালয় শিক্ষার আর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হবে না। সেদিন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এখনই গুরুত্ব দিয়ে সবার আগে অভিভাবকদের সচেতন করা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ একটি শিক্ষাবর্ষে তিনবার অভিভাবক সভা আহ্বান করার নির্দেশ দিয়েছে। দুবার শ্রেণিভিত্তিক সভা, একবার বিদ্যালয়ের সমস্ত অভিভাবকদের নিয়ে বার্ষিক সভা। কিছু কিছু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এগিয়ে এসে অভিভাবক সভা করতে চাইলেও সফল হন না। কেননা, অভিভাবকদের অনেকেই এ সভায় উপস্থিত থাকা যে জরুরি তা ভাবেন না এবং যোগদান করতে চানও না। অথচ, অভিভাবকদের সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। আমাদের হতাশ হলে চলবে না। অভিভাবকদের সভা আহ্বান করা এবং তাতে উপস্থিতি লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি খাতা করতে হবে। ধরা যাক, দশম শ্রেণির অভিভাবকদের প্রথম সভা আহ্বান করা হবে। দশম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮০ জন। দুদিন সভা করবেন। প্রথম দিনে সভা করার জন্য ৪০জন শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের ডাকলেন। দ্বিতীয় দিনেও ৪০ জনকে ডাকলেন। প্রথমে দশম শ্রেণির ওই ৪০ জন অভিভাবকের নামওই খাতায় নিম্নরূপভাবে লিখে একটি রেজিস্টার তৈরি করলেন।

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক সংখ্যা | অভিভাবকের নাম | শিক্ষার্থীর নাম | তারিখ | তারিখ | তারিখ |
| | | | | | |
| | | | স্বাক্ষর | স্বাক্ষর | স্বাক্ষর |
| ১ | | | | | |
| ২ | | | | | |

প্রথম দিনের সভার তারিখ ৪ নং ঘরে তারিখের নীচে লিখলেন। স্বাক্ষরের নীচে পরপর উপস্থিত অভিভাবকদের স্বাক্ষর করানোর জন্য রাখলেন। এইভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ের যখন

সভা ডাকা হবে তখন ওই অভিভাবকদের ৫ নং ঘরে এবং তৃতীয় পর্যায়ের সভায় ৬ নং ঘরে স্বাক্ষর করানো হবে।

প্রথম দিনের সভার জন্য চিঠিগুলি সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে অভিভাবকদের কাছে পাঠাবেন। শনিবার দুপুর বারোটায় সভা ডাকা যেতে পারে। ওই চল্লিশজন শিক্ষার্থীর নামের তালিকা সম্পাদকের হাতে দিয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য অভিভাবক প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রচার করলে উপস্থিতি অবশ্যই বাড়বে। প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষক প্রতিনিধি, সম্পাদক বা অন্য কোনো সদস্য উপস্থিত থেকে উক্ত শিক্ষার্থীদের বিষয়ে অবহিত করলে ভালো ফল হবে। যাঁরা অনুপস্থিত রইলেন তাঁদের নামের তালিকা সম্পাদকেব হাতে দিয়ে পুনরায় ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এইভাবে অবশিষ্ট ৪০ জনের সভা ডাকা যেতে পারে। এরপর প্রতি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে প্রথম পর্যায়ের সভা শেষ হলে শুরু হবে দ্বিতীয় পর্যায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর অনুপাতে প্রতিসভার অভিভাবকদের সংখ্যা বাড়ানো কমানো যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ের সভার ফলাফল পরবর্তীপরিচালন সমিতির সভায় বিশ্লেষণ করে এর মাঝে গ্রামভিত্তিক বা প্রয়োজনে পাড়াভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে আলোচনায় বসতে পারেন। এক্ষেত্রে মায়েদেরও উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানালে ভালো ফল পাওয়া যাবে। এই সভায় অনুরূপভাবে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক প্রতিনিধি, সম্পাদক বা অন্যান্য আগ্রহী শিক্ষক-শিক্ষিকা বা সদস্য উপস্থিত থাকলে আলোচনা ফলপ্রসূ হবে। এর জন্য প্রয়োজন উদ্যোগ, উদ্যম এবং মানসিকতা। হয়তো কেউ কেউ বলবেন 'সময় কোথায়?' একবার ভেবে দেখুন—আশির দশকের আগে যখন বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে শিক্ষার্থী সংগ্রহ করতে হত তখন সময় পাওয়া যেত কী ভাবে? সত্যিই তো, এখন যে শিক্ষকদের মর্যাদা বেড়েছে। একইসঙ্গে 'মান' ও 'মানি' অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকেই কর্তব্যবোধ শূন্য হয়েছেন। তখন নিজেদের আর্থিক ঘাটতি পূরণের স্বার্থে পারিশ্রমিক বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সদলবলে বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন। এখন শিক্ষার্থীরস্বার্থে, সমাজের স্বার্থে আরও একবার পাড়ায় পাড়ায় বা গ্রামে গ্রামে ঘুরতে সঙ্কোচ কেন?

এই মুহূর্তে শিক্ষার মানোন্নয়নে, অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা নিয়মিত আলোচনার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। যে সমস্ত অভিভাবক কোনোমতেই দিনের দিকে উপস্থিত থাকতে সময় পান না তাঁরাও উপস্থিত থাকবেন। তাঁদের এবিষয়ে সচেতন করে তুললে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং পরবর্তী সভাগুলিতে তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে উপস্থিত থাকবেন। তাই, শিক্ষার প্রসারে অভিভাবক সভা যে আহ্বান করতেই হবে এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকার অবকাশ নেই।

# পাড়ায় পাড়ায় অভিভাবক সভা

শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার ও প্রতিটি ৫-১৪ বছর বয়সি ছেলেমেয়েকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে হলে যেমন শিক্ষক সমাজের বিরাট একটি ভূমিকা আছে ঠিক তেমনই, অভিভাবক সচেতনতার প্রয়োজনও আছে। অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবেই শিক্ষার মান নিম্নাভিমুখী, বিদ্যালয়ছুট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই কারণেই নিয়মিতভাবে অভিভাবক সভা আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা আছে। শুধু তাই নয়, মায়েদেরও সচেতন করতে হবে এবং মায়েদের নিয়ে সভা করে তাদের এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে হবে। এই কর্মযজ্ঞে মায়েদের সংযুক্ত করতে না পারলে উপায় নেই। অভিভাবক সভা ডেকে যদি সেখানে প্রত্যেককে উপস্থিত করতে না পারা যায় তাহলে প্রয়োজনে সন্ধেবেলা পাড়ায় পাড়ায় অভিভাবক সভা ডাকতে হবে। কথায় আছে, 'মহম্মদ পর্বতের কাছে না গেলে পর্বতকে মহম্মদের কাছে আসতে হবে।' প্রয়োজনে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে বিভিন্ন শ্রেণির ছেলেমেয়েদের অভিভাবকদের নিয়ে ও সাধারণ মানুষদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। অনেক অভিভাবক আছেন তাঁরা কোনও মতেই দিনের দিকে বা কাজের দিনে সভায় উপস্থিত হওয়ার সময় পান না। অথচ, তাঁদের আন্তরিকতা আছে। এক্ষেত্রে তাঁদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় সন্ধেবেলা সভা ডেকে সেই সভাতেও প্রধান শিক্ষক, সহ প্রধান শিক্ষক বা সেই এলাকায় বসবাসকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পরিচালন সমিতির সম্পাদক, সভাপতি বা তাঁদের মনোনীত কোনো সদস্য উপস্থিত থাকবেন। ঐ এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও এই সভায় উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানালে সভা আরও ফলপ্রসূ হবে। এই উদ্যোগ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে পাড়ায় পাড়ায় সমস্ত অভিভাবকদের নিয়ে আলোচনায় বসলে অভিভাবকরাও তাঁদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হবেন। তাঁরা যেভাবে উদাসীন থেকে শিক্ষার্থীদের ভাগ্যনির্ধারণের ভার প্রাইভেট টিউটরদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা 'দায়মুক্ত হয়ে গেছেন' একথা ভেবে বসে আছেন তাঁরাও তাদের ভুল বুঝতে পেরে আরও সতর্ক হবেন। সমস্ত উদ্যোগই কঠিন ও সমস্যা-সংকুল। নির্দিষ্ট বিদ্যালয় সময়সূচির বাইরে এক সেকেন্ডও খরচ করব না এমন মনোভাব নিলে কোনোদিনই কিছু হবে না। আপনার এলাকার উন্নয়নের ভার আপনাকেই নিতে হবে। তাহলে সামগ্রিক প্রচেষ্টায় সবারই উন্নতি হবে।

# বিদ্যালয় কর্তৃক মাতৃসচেতনতা সভা

শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে থাকে মাত্র ৫-৫ ১/২ ঘন্টা। বাকি সময় থাকে বাড়িতে, গৃহপরিবেশে। এই গৃহপরিবেশের মূল কর্ণধার হলেন শিক্ষার্থীর মা। তাই, একজন শিক্ষার্থী সবচেয়ে বেশি সময় থাকে তার মায়ের সান্নিধ্যে। এক্ষেত্রে মায়ের ভুমিকাই শিশুর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে, শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক গঠনে বেশি। মা শিক্ষিত হলে যেমন শিক্ষার্থীরা সরাসরি উপকৃত হয় তেমনি অশিক্ষিত মায়েদের কাছেও শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয় না। তাঁরা পঠন পাঠনের দিকটি সরাসরি না দেখলেও নানাভাবে নিজেদের ছেলেমেয়ের অগ্রগতির পথ পরিষ্কার করে থাকেন। তাই, সবার আগে মায়েদের সচেতন করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে অভিভাবক সভা আহ্বান করে যেখানে শিক্ষার্থীর বাবাকে খুব একটা পাওয়া যায় না, সেখানে মায়েদের ডেকে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেছে। আরও সফল হওয়া সম্ভব হয় যদি তাঁদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় সভা করে সামগ্রিকভাবে তাঁদের ছেলেমেয়েদের কথা তুলে ধরা যায়। অনেকে কেন, সবাই উৎসুক থাকেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের অগ্রগতি ও ভূত-ভবিষ্যত সম্বন্ধে কিছু জানতে। কিন্তু, প্রত্যক্ষভাবে তেমন একটা খোঁজ খবর নেবার সুযোগ না থাকায় তাঁরা বঞ্চিত হন। বিদ্যালয়ে যেতে কারও বাধা নেই। কিন্তু, বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বাড়ির কাজেই পুরো সময় তাঁদের ব্যয় করতে হয়। নিজের ছেলেমেয়েকে জিজ্ঞেস করে। তারা তাদের মতো করে যা বলে তা শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সব ঠিকভাবে চলছে ধরে নেন। আসলে সব যে ঠিক নেই সে কথাটি যেমন পুত্রকন্যারা জানে ঠিক তেমনি জানেন শিক্ষকমশাইরা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুত্রকন্যারা সব কিছু এড়িয়ে চলে। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে যত বেশি যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে ততই উপকৃত হবে একটি পরিবার। এই যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব ও উদ্যোগ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই গ্রহণ করতে হবে। পাড়ায় মাঝে মাঝে সভা করলে এবং সেই সভায় স্থানীয় মায়েদের ডাকলে এবং মাতৃস্থানীয়আগ্রহীদের ডেকে আলোচনা করলে সাফল্যের শতাংশ ক্রমবর্ধমান হবে। এবার প্রয়োজন উদ্যোগ ও মানসিকতার। মনে রাখতে হবে শিক্ষার অগ্রগতিতে কোনো একটি পথই শেষ নয়। হাজারো পদ্ধতির সংমিশ্রনেই একটি আদর্শ শিক্ষা পরিবেশ গঠিত হয়। তাই, পাশাপাশি শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতিতে মাতৃ সচেতনতা সভার গুরুত্ব অপরিসীম।

# গৃহে শিক্ষার্থীর পাঠ আয়ত্তীকরণ

পরিকল্পনা ভিন্ন কোন কাজই সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করা যায় না। শিক্ষার্থীর পাঠ তৈরির ক্ষেত্রেও পরিকল্পনা গ্রহণ অবশ্যই জরুরি। কখন পড়বে, কখন লিখবে, কোন বইটি কখন পড়বে তারও একটি সময়সূচি করে নিতে পারলে ভাল হয়। অনেকে আবার যখন যে বইটি খুশি বা ভালো লাগে তা পড়ে। তবে, কোনো একটি বিষয় বেশি ভালো লাগে বলে সেই বিষয়টি বার বার পড়ব যেটি ভালো লাগে না সেইটি তত গুরুত্ব দিয়ে পড়ব না তা কিন্তু হতে পারে না। কোনো একটি বিষয় কাউকে বেশি ভাল লাগতেই পারে। তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিয়েই তৈরি করতে হবে। সময় বন্টনের সময় দেখা গেছে প্রতিদিন বাড়িতে নিজ উদ্যোগে লেখাপড়া করার জন্য মোট সাত ঘন্টা সময় রাখা আছে। এই সময়ের মধ্যেই সব বই পড়তে এবং লিখতে হবে। অনেকে দু-একবার পড়েই বিষয়টি সংক্ষেপে বলে দিতে পারে। আবার কেউ কেউ বা মুখস্থ করে। যারা মুখস্থ করে তাদের জন্য পরামর্শ পরপ র তিনচারবার মন দিয়ে পড়ে নিয়ে তারপর এক দু'লাইন করে পড়ে বই বন্ধ করে তা স্মরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এইভাবে পুরো বিষয়টি আয়ত্ত হয়ে গেলে পুনরায় ভালো করে পড়ে বই বন্ধ করে পুরো বিষয়টি স্মরণে আনার চেষ্টা করলে এবং লিখে নিলে পড়া তৈরি অনেক সহজেই হয়।

তবে, যখনই পড়া তৈরি করা হোক না কেন ওই সাত ঘন্টা সময়ের মধ্যে ভোরের দিকে ঘন্টাদুয়েক সময় রাখতে পারলে খুব ভালো হয়। ভোরের দিকে দুঘন্টা সময় মানে অন্য সময় চার-পাঁচ ঘন্টার সমান। প্রাচীনকাল থেকেই মুনিঋষিরা ভোরের দিকে উঠে লেখাপড়া করার পরামর্শ দিয়েছেন। ভারতবর্ষ সংগীত সাধনার পীঠস্থান। আমাদের দেশের সংগীত শিক্ষকেরা ভোরবেলা উঠে আলাপ করার বা রেওয়াজ করার পরামর্শ দেন। ভোরবেলা সংগীত সাধনার জন্য যদি উপযুক্ত সময় হয় তাহলে লেখাপড়া করার জন্যও উপযুক্ত সময়। আমাদের দেশে বহু মনীষী ভোরবেলা উঠে লেখাপড়া করেছেন। তার মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডি ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা সকলেরই জানা আছে। এইভাবে পাঠ আয়ত্তীকরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে সুফল আসবেই আসবে।

# বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংবর্ধনা

বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকা বা অশিক্ষক কর্মীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার একটি প্রথা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। তবে, তা একেবারে অন্তিম পর্যায়ে। তাঁদের কার্যকালের একেবারে শেষদিনে বা তারও পরে সময় সুযোগ করে। সেদিন বিদ্যালয়ে সংবর্ধনার নামে চলে সারাদিনের পঠনপাঠন বন্ধ করে একটি মিলন সভা। যাতে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়গুলি থেকে আমন্ত্রিত বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি আসেন, থাকেন বিভিন্ন অতিথি, অভিভাবকদের কেউ কেউ, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের দু-চারজন, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বর্তমান পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের একাংশ। অনুষ্ঠানে বিদায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকার কর্মজীবনের ওপর আলোচনা চলে আর চলে কর্মদক্ষতার জন্য তাঁর গুণকীর্তন। উপস্থিত শিক্ষার্থীরা সেই বিদায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারে। কিন্তু, তখন তাদের আর কিছু করার থাকে না। তাঁর কাছে কিছু জানার ও শেখার সুযোগ আর তখন থাকে না। কেননা, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সেই শিক্ষক-শিক্ষিকার তো আর বিদ্যালয়ে এসে সরাসরি পঠন-পাঠনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকে না।

এ বিষয়ে কিছু পরিবর্তন আনার প্রয়োজন কেউ কেউ অনুভব করলেও বাস্তবে রূপায়িত করতে কাওকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। এখন, কীভাবে এই প্রচলিত সংবর্ধনা সভার পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন চিন্তা-ভাবনা নিয়ে এই ধরনের সংবর্ধনা সভা করা সম্ভব তার একটি রূপরেখা উপস্থাপন করা যেতে পারে।

আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেদের প্রচার চান না। অথচ, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে সমাজের স্বার্থে, প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে তাঁদের কাজের মূল্যায়ন ও উৎসাহদান প্রয়োজন। প্রতি বিদ্যালয়েই বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়। তাতে, সারাবছর ব্যাপী নানা কর্মকাণ্ডের ওপর যেমন, লেখাপড়া, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভালোব্যবহার, নিয়মিত উপস্থিতি-এমন কি বীরত্ব মূলক কর্মদক্ষতা প্রদর্শনের ওপর, সততা প্রদর্শনের ওপর শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। এর জন্য বহু সংস্থা, বহু উৎসাহী ব্যক্তি এগিয়ে আসেন, কেউ কেউ বা তাদের প্রিয়জনদের স্মৃতির উদ্দেশে শিক্ষার্থীদের জন্য ওই পুরস্কারগুলি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে সহযোগিতা করেন। পুরস্কারের কোনো অভাব হবে না। প্রয়োজন একটু উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার। এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তাঁদের কাজের মূল্যায়ন করে সংবর্ধনা দেওয়া যেতে পারে এবং যা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই উদ্যোগের বড়ো অভাব। কে কার অপ্রিয় হবেন এই মনোভাব অনেকেই ব্যক্ত করেন। শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের কর্মদক্ষতা ও শিক্ষার্থী-দরদি গুণের জন্য নির্বাচিত হবেন। প্রতিবছর সামর্থ অনুযায়ী একজন বা দু'জনকে

এইভাবে নির্বাচিত করে সংবর্ধনা দেওয়া যেতে পারে। ওই শিক্ষক শিক্ষিকা নবীনও হতে পারেন বা প্রবীণও হতে পারেন। বয়স নয়, কর্মজীবনের দীর্ঘতা নয়, কর্মদক্ষতা, জনপ্রিয়তা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নিবেদিতপ্রাণই হবে তাঁর যোগ্যতার মূল মাপকাঠি। এই নির্বাচন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির উদ্যোগে হবে। বিদ্যালয় অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল-এর সঙ্গে পরামর্শ করে, আরও গণতান্ত্রিক ও সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে গোপনে মতামত সংগ্রহ করে সংবর্ধনার জন্য শিক্ষক নির্বাচন করা যেতে পারে। এই উদ্যোগের ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকারাও উৎসাহিত হবেন এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছে শিক্ষক-শিক্ষিকার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হলে তাদেরও শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষালাভের পথ উন্মুক্ত হবে।

অনেকে হয়তো বলবেন বিদ্যালয় একটি প্রবহমান স্রোতধারা। প্রতিবছর নতুন নতুন শিক্ষার্থী আসে এবং শিক্ষা সমাপন করে মাঝপথে অনেকেই চলে যায়। আজ যাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হল আগামী দিনে অনেকের কাছেই তিনি অজ্ঞাত থেকে যাবেন। কথাটি সত্যি, কিন্তু, সত্য কখনও চাপা থাকে না। সেই শিক্ষক-শিক্ষিকার কথা ছাত্রছাত্রীর মুখে প্রচার হতে হতে প্রত্যেকের কাছেই শিক্ষার্থী পরম্পরায় পৌঁছে যাবে। তাছাড়া, প্রতিবছর সংবর্ধনা দেওয়ার সময় বিগত দিনে সংবর্ধনাপ্রাপ্ত এবং বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকার কথা সংক্ষেপে তুলে ধরলে এই সমস্যা আর থাকবে না।

এইভাবে প্রতিবছর সংবর্ধনা দিলেই যে আমরা একশো শতাংশ সফল হব এমন ধারণা সঠিক নাও হতে পারে। তবে, যা ছিল তার থেকে যদি এক শতাংশও বৃদ্ধি পায় তাহলে আমাদের সে উদ্যোগ নিতে আপত্তির কী আছে? একটা কথা ধরে নিতে হবে-'সেন্ট পারসেন্ট না হোক টেন পারসেন্ট' হবেই। আসলে, এসব কাজে ঝুঁকি নেওয়ার লোকের অভাব, মানসিকতার অভাব।

বর্তমানে প্রচলিত কর্মকালান্তিক সংবর্ধনা যাকে 'বিদায় অনুষ্ঠান' বা বিদায় সংবর্ধনা বলা হয় তা থাক না ক্ষতি কী? এর সঙ্গে নতুন করে কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে বার্ষিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংবর্ধনা সভা যোগ করতে বাধা কোথায়?

এছাড়াও এইসকল সফল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবর্ধনার তারিখ এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী বা কর্মদক্ষতার দিক বিদ্যালয় পত্রিকাগুলিতে প্রকাশের প্রয়োজনয়ীতা আছে। কেন না, মানুষের স্মৃতি খুব দুর্বল। আজকের ঘটনা দু-পাঁচ বছর মনে থাকে তারপর একসময় ফিকে হয়ে যায়। তখন কিন্তু, একটি স্মরণিকা বা পত্রিকায় লিপিবদ্ধ অংশ বিশ-পঁচিশ বা পঞ্চাশ একশো বছর পরেও জ্বলজ্বল করে। যা সেই মানুষকে জানতে সহায়তা করে। তাই, একদিকে যেমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, অপরদিকে সংকীর্ণতা বিসর্জন দিয়ে বিশাল এর কথা চিন্তা করলে সফলতা আসবেই আসবে।

## পরীক্ষায় ভালো ফল ঃ একটি উপায়

শিক্ষার্থীরা কেবল লেখাপড়াই করে। পরীক্ষা দেয়। মার্কসিট নিয়ে দেখে রেখে দেয়। অনেকেই ফলাফল নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা করে না, বিশ্লেষণ করে না। আগামী দিনে কীভাবে লেখাপড়া করলে আরও সুন্দরভাবে একটি জায়গায় যাওয়া যাবে সে বিষয়ে অনেকেরই মনে কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই।

খেলার মাঠে বল খেলাই হত না যদি দুদিকে গোল পোস্ট না থাকত। ওই গোল পোস্ট থাকার ফলে উভয় দলই বল নিয়ে নিয়ম মেনে অপরপক্ষের গোল পোস্ট -এর ভেতর বল পাঠিয়ে জেতার জন্য উদগ্রীব হয়। লক্ষ্য হল গোল দেওয়া। লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও একটা লক্ষ্য থাকতেই হয়। শিক্ষার্থীদের নম্বর বৃদ্ধিতে মানসিক জোর বাড়ানোর জন্য অনেকরকম পন্থা থাকতে পারে। তবে এই সহজতর পদ্ধতিটি যার মাধ্যমে নম্বর বাড়বেই তা অনুশীলন করে দেখা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন মাত্র এক সিট সাদা কাগজ। বাকিটা নিজের অন্তর এবং মানসিকতা।

এখন এই পদ্ধতিতে কীভাবে নম্বর বাড়ে তা বলা না গেলেও বাড়বেই এটা পরীক্ষিত সত্য। এখন কীভাবে তা দেখা যাক।

এক সিটের অর্ধেক অর্থাৎ আধ তা কাগজ নিয়ে তাতে নিম্নরূপভাবে ঘর কেটে বিগত পরীক্ষার বিষয় গুলি লিখতে হবে। এর পরে ডানদিকের ঘরে 'বিগত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর' লিখে এবং ডানদিকের শেষ ঘরে 'আগামী পরীক্ষায় কত পেতেই হবে' —লিখতে হবে। উদাহরণ—

| (ক) বিষয় | (খ) বিগত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর | (গ)আগামী পরীক্ষায় পেতেই হবে |
|---|---|---|
| বাংলা(১) পত্র | ৫০ | ৬০ |
| বাংলা(২) পত্র | ৬৫ | ৭৫ |
| ইংরেজি | ২০ | ৩৫ |
| গণিত | ৯০ | ৯৫ |
| পদার্থবিজ্ঞান | ৪০ | ৬০ |
| জীবনবিজ্ঞান | ৫৫ | ৭৫ |
| ইতিহাস | ৩০ | ৫০ |
| ভূগোল | ২২ | ৪৫ |

ধরা যাক এখানে কোনো একটি শিক্ষার্থীর নম্বর উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। 'ক' ঘরে 'বিষয়' 'খ' ঘরে 'বিগত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর' এবং 'গ' ঘরে 'আগামী পরীক্ষায় পেতেই

হবে' লিখে এইভাবে পাশেপাশে প্রাপ্ত নম্বর এবং যে নম্বর পাবার জন্য প্রতিজ্ঞা বা লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে তা লিখতে হবে। এই কাগজটি এবার শিক্ষার্থীকে তার বইপত্রগুলি যেখানে থাকে সেখানে দেওয়ালে সেঁটে দিতে হবে। প্রতিদিন পড়ার জন্য বই নিতে গিয়ে বার বার তা দেখলে এবং কী প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তা স্মরণ করলে একটা অজানা শক্তি প্রেরণা জোগাবে।

যার ফলে বিগত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের থেকে বেশি পাবেই এবং প্রতিজ্ঞা করা নম্বর ছাড়িয়েও যেতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর এইভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কী ভাবে নম্বর বাড়ে তার সঠিক কারণ বলা না গেলেও বাড়বেই একথা জোর দিয়ে বলা যায়। চেষ্টা করলে কী না হয়। প্রয়োজন উদ্যোগের। সুফল আসবেই আসবে।

## বিদ্যালয়ের উপেক্ষিত শ্রেণি পঞ্চম ঃ প্রথা পাল্টাতে হবে

বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে সব থেকে বেশি উপেক্ষিত হয় পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। আবার বেশি নজর পড়ে দশম বা দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওপর। কেননা, ওরাই এবছর চূড়ান্ত পরীক্ষা দেবে। ফল খারাপ হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের 'শো-কজ নোটিশ' পাবে। তাই, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, স্টাফ কাউন্সিল এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ওই শ্রেণি দুটির প্রতি স্বাভাবিকের থেকে একটু বেশি নজর দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু, ফল হয় উল্টো। গাছের গোড়া কেটে ডগায় জল ঢালা হয় মাত্র। এইজন্য পঞ্চম শ্রেণির কিছু কিছু পিরিয়ড বন্ধ রাখা হয়। ওদের প্রভিশন্যাল ক্লাসগুলিও অনেক সময় বন্ধ রাখা হয়। বেশির ভাগ কেন, প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই পঞ্চম বা ষষ্ঠ পিরিয়ডের পর পঞ্চম শ্রেণির ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষকদের 'ক্লাস লোড' কমাতেই নাকি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যদিও এই অসময়ে ছুটি অর্থাৎ পঞ্চম বা ষষ্ঠ পিরিয়ডের পরে ছুটি দেওয়ার কোনো বিভাগীয় নির্দেশনামা এখনও জারি হয়নি। বিদ্যালয়গুলি স্বঘোষিত নীতিতেই এই কাজ করে থাকে। অনেকে কারণ দেখান ওদের বয়স কম, ওরা প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী, ওদের বেশিক্ষণ আটক করে রাখলে 'শিশুমন'-এর ওপর নির্যাতন চালানো হয়। তাঁরা কিন্তু, খবর নিয়েও দেখেন না, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যেখানে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পড়ানো হয় সেখানকার সময় কত। কেননা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সংসদের নির্দেশ অনুসারে সকাল সাড়ে দশটা থেকে বিকেল সাড়ে তিনটে পর্যন্ত পাঁচ ঘন্টা সময় বিদ্যালয়ে থাকে। অথচ, পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই অজুহাত দেখিয়ে কিছু কিছু নেতিবাচক মনোভাবাপন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার পিছনে অবাস্তব যুক্তি দেখান। একটু বিবেচনা বোধ যাঁদের আছে তাঁরা কিন্তু, এই প্রথা বন্ধ করে বিদ্যালয়ের মধ্যে সব থেকে বেশি যত্ন পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের করে থাকেন। তাঁরা আজকের দশম শ্রেণি নয়, আগামী পাঁচ বছর পরের দশম শ্রেণিকেই বেশি গুরুত্ব দিতে চান। অর্থাৎ, কোনক্রমেই পঞ্চম শ্রেণির কোনো পিরিয়ড যাতে ফাঁকা না যায় তার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। সত্যিই, এটাই তো আদর্শ শিক্ষক তথা আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এইভাবে ভিত গড়ার দিকে নজর দিলে এবং প্রতিবছর সযত্নে তাদের এগিয়ে নিয়ে গেলে পাঁচবছর পরে দশম শ্রেণিতে গিয়ে আর বিশেষ যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে না। স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রতি যত্ন নেওয়ার কাজ চলতে থাকবে। এইভাবে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বেশি গুরুত্ব দিলে 'হারিয়ে যাওয়া' শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমবে। বিদ্যালয়ে এসেই যখন তারা দেখবে

শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ তাদের সব থেকে বেশি ভালোবাসছেন, গুরুত্ব দিচ্ছেন মনের কথাটি বুঝে নিচ্ছেন, উপলব্ধি করছেন, সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছেন তখন তাঁর বিদ্যালয়ের প্রতি অনীহা থাকবে না। বিদ্যালয়কে নিজের বাড়ি ভাবতে শিখবে। শিশুদের অনুভূতি শক্তি খুবই বেশি। তারা বিদ্যালয়ের পরিবেশকে নিজের পারিবারিক পরিবেশ ভাবতে শিখবে, সার্থক হবে 'সর্বশিক্ষা অভিযান' প্রকল্প এবং 'স্কুল চলো কর্মসূচি'। সার্থক হবে শিক্ষক জীবন।

# মাধ্যমিক ঃ শেষ মুহূর্তের পরামর্শ

প্রিয় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীবৃন্দ, পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে যাবার আগে এবং পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে কীভাবে তোমরা নিজেদের একজন আদর্শ পরীক্ষার্থী হিসাবে প্রতিপন্ন করতে পারো সে বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিচ্ছি।

১৯৭৬ সালে মাধ্যমিক শুরু। ওই বছর থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষার সঙ্গো ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছি। প্রথম কয়েক বছর শিক্ষক হিসেবে পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রে নজরদারের ভূমিকা পালন করেছি, তারপর বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে বিভিন্ন পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রের 'অফিসার ইন চার্জ' থেকে তোমাদের যেসব অসুবিধা প্রত্যক্ষ করেছি তার ওপর ভিত্তি করেই এই পরামর্শ।

★ মাধ্যমিক পরীক্ষা ছাত্রজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এই পরীক্ষা যাতে নির্বিঘ্নে দিতে পারো তার জন্যেই কিছু প্রয়োজনীয় কথা জেনে রাখা ভালো।

★ প্রথমেই একজন পরীক্ষার্থীকে মন থেকে পরীক্ষাভীতি দূর করতে হবে। অত্যন্ত শান্তভাবে মনে কোনরকম দুশ্চিন্তা না রেখে আত্মবিশ্বাসী হয়ে তৈরি হতে হবে।

★ পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই 'সময়' সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে নির্দিষ্ট সময়ে যেন পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে পৌছানো সম্ভব হয়।

★ পরীক্ষার সময় অর্থাৎ পরীক্ষা শুরুর দিন বা তারও আগে থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যে সময়, ওই সময় যাতে কোনো গুরুপাক খাবার খেয়ে অসুস্থ না হয়ে পড়ো সে বিষয়ে নজর রাখবে।

★ বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় অবশ্যই অরিজিন্যাল অ্যাডমিট কার্ড এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সঙ্গো নিতে হবে। অনেকে জেরক্স কপি নিয়ে যেতে চায়। না, তা চলবে না। জেরক্স কপি প্রত্যয়িত করিয়ে বাড়িতে রেখে দিতে পারো। তবে, পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে অরিজিন্যালই নিয়ে যেতে হবে।

★ কোন দিন কী পরীক্ষা আছে তা ভালভাবে দেখে নিয়ে সেইমতো প্রস্তুতি নিতে হবে।

★ পরীক্ষা চলাকালীন দিনগুলিতে অধিক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশোনা না করাই ভালো।

★ যেদিন যে বিষয়ের পরীক্ষা আছে সেদিন সেই পরীক্ষার জন্যে আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র যেমন -ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স, স্কেল, রং, তুলি ইত্যাদি সঙ্গো নিতে হবে। পরীক্ষার্থীদের সবসময় অতিরিক্ত কলম সঙ্গো রাখা প্রয়োজন।

★ যাঁরা নজরদারিতে থাকবেন তাঁদের প্রশ্নসংক্রান্ত কিছু জিজ্ঞেস না করে নিজে যা বুঝবে সেই মতো লিখবে। খেয়াল রাখা প্রয়োজন নজরদার শিক্ষক মানেই সেই বিষয়ে

অভিজ্ঞ শিক্ষক হবেন এর কোনো মানে নেই। তাছাড়া পরীক্ষা কক্ষে নীরবতা রক্ষা করাই পরীক্ষার্থীর বড়ো গুণ।

★ পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে ক্যালকুলেটর জাতীয় যন্ত্র নিয়ে যাওয়া চলে না। সঙ্গে ঘড়ি ব্যতীত মোবাইল প্রভৃতি অন্য কোনো ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র রাখা চলে না।

★ কোনো পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করার চেষ্টা আদৌ করা উচিত নয়। খেয়াল রাখতে হবে তাদের বলে দেওয়া উত্তর সঠিক নাও হতে পারে। তাছাড়া, সেও একজন পরীক্ষার্থী, তারও সময়ের মূল্য অনেক বেশি।

★ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষা চলাকলীন অনেকের পরীক্ষাকক্ষের বাইরে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। খেয়াল রাখতে হবে কোনো প্রাকৃতিক কর্ম ভিন্ন বাইরে যাওয়া উচিত নয়। কেননা, বাইরে গিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়।

★ প্রাকৃতিক কর্ম সম্পন্ন করতে বাইরে যেতে বাধ্য হলে অবশ্যই খাতা এবং প্রশ্ন পরীক্ষা কক্ষে রেখে নজরদার শিক্ষকের অনুমতি সাপেক্ষে বাইরে যাবে।

★ সঙ্গে হাতঘড়ি রাখলে ভালো হয়।

★ উত্তর লেখা সারা হলে এবং সময় থাকলে বার বার তা খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া ভালো।

★ প্রশ্নের সঠিক দাগ নম্বর দিয়ে উত্তর লিখতে হবে এবং খাতায় প্রয়োজন মতো মার্জিন দিতে হবে।

★ পরীক্ষার উত্তরপত্র জমা দেওয়ার আগে অতিরিক্ত কাগজ যদি নিয়ে থাকো তা উত্তরপত্রের সঙ্গে ভালোভাবে গেঁথে দেবে।

★ পরীক্ষা শেষে কক্ষত্যাগ করার আগে নিজের অ্যাডমিট কার্ড, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, প্রশ্নপত্র এবং কলম প্রভৃতি জিনিসপত্র অবশ্যই দেখে নিতে হবে।

★ পরীক্ষার কক্ষ থেকে বের হয়ে এসে সেই বিষয়ের ওপর আর আলোচনা না করে পরের দিনের বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করাই ভাল। কেন না, 'গতস্য শোচনা নাস্তি'।

# কর্মকালান্তিক বিদায় সংবর্ধনা সভা

শিক্ষক-শিক্ষিকা বা শিক্ষাকর্মীর কর্মকাল শেষ হলে তাঁদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়ার রীতি দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে চলে আসছে। যিনি এতদিন ধরে বিদ্যালয়ে কর্মরত থেকে কোনো কোনো না ভাবে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে সফল করে তুলেছেন হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রীকে প্রেরণা দিয়েছেন তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জানাতেই হয়।

এদিন বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বন্ধ রেখে প্রায় সারাদিন ধরে চলে বিদায় অনুষ্ঠান। এই সভাটি অন্য আর পাঁচটি সাধারণ অনুষ্ঠানের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একদিকে স্মৃতি রোমন্থন, শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অপরদিকে চলে উপহারপ্রদান এবং একটি নির্ভেজাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যে ভাবেই হোক না কেন, অনুষ্ঠানটি হবে ভাবগম্ভীর পরিবেশে এবং সকলের জন্য। বিদ্যালয়ের নিজস্ব সাংস্কৃতিক মঞ্চ থাকলে ভালো তা না হলে সম্পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে বা খোলা মাঠে মঞ্চ তৈরি করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা প্রয়োজন। কেন না, এই অনুষ্ঠানটি কেবল বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থী এবং কর্মরত শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই অনুষ্ঠানে বহু বহিরাগত আমন্ত্রিত ব্যক্তি ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকবেন।

এখন কীভাবে এই অনুষ্ঠান চলবে তা দেখা যাক। অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং সর্বোপরি অনুষ্ঠানের মধ্যমণি বিদায়ী শিক্ষক- শিক্ষিকা বা শিক্ষাকর্মীকে বরণ করে একটি সময়োপযোগী উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে সভার কাজ শুরু হবে। প্রথমেই থাকবে বিদ্যালয়ের প্রধান বা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার স্বাগত ভাষণ। এরপর শুরু হবে দিনোপযোগী আবৃত্তি গান এবং মাঝে মাঝে স্মৃতিচারণ বা আলোচনা। তারই পরে থাকবে উপহার প্রদান এবং বিদায়ী শিক্ষক- শিক্ষিকা বা শিক্ষাকর্মীর ভাষণ। শেষের দিকে থাকবে সভাপতির ভাষণ এবং একেবারে শেষে অনুষ্ঠান উপযোগী সমাপ্তি সংগীত।

এইরকম একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান যা প্রায় ৪/৫ ঘন্টা ধরে চলে তা অনেক সময় শিক্ষার্থীদের অন্যমনস্কতা বা অস্থিরতায় এমন কি ঘন ঘন বাইরে যাওয়ার তাগিদে ব্যাহত হয়। বড়োরা যদি প্রয়োজনে অনুষ্ঠান চলাকালীন বাইরে যেতে পারেন তাহলে ছোটোরা অন্তত প্রাকৃতিক কারণেই বা বাইরে যেতে পারবে না কেন? চার-পাঁচ ঘন্টা বসে থাকা সম্ভব নয়। তাই, ওদের বসার ব্যবস্থাটিও হবে অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে পরিকল্পনামাফিক। অনুষ্ঠান পরিচালনায় একদিকে যেমন থাকবে শিক্ষার্থীদের মুখ্য ভূমিকা অপর দিকে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকা বা শিক্ষাকর্মীদের ভূমিকাও কম নয়। শিক্ষার্থীদের সভাস্থলে বসানোর ব্যবস্থাটি হবে সম্পূর্ন

বিজ্ঞানভিত্তিক। শ্রেণি বা বিভাগভিত্তিক একদিকে ছাত্র অন্যদিকে ছাত্রীরা বসবে। এক একটি বিভাগের জন্য একজন মনিটর বা শ্রেণিকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে তাদের দেখাশোনা করার জন্য ছাত্রছাত্রীভেদে প্রতিটি বিভাগের কাছে একজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা বসবেন। অনুষ্ঠান শুরুর একঘন্টা পর থেকে পরিকল্পনামাফিক প্রথমে পঞ্চম শ্রেণির কোনো একটি বিভাগের ছাত্ররা তারপরে ওই বিভাগের ছাত্রীরা মাত্র দশ পনেরো মিনিটের জন্য বাইরে যাবে। তারা এতই নিঃশব্দে যাতায়াত করবে যে তাদের এই যাতায়াতের কোনো প্রভাবই অনুষ্ঠানে পড়বে না। শিক্ষক-শিক্ষিকা আলোচনার মাধ্যমে অনেক আগেই কোন শ্রেণির কোন বিভাগ কখন বাইরে যাবে তা ঠিক করে রাখবেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনায় বা সার্থকভাবে রূপায়িত করতে বহু আগে থেকেই শ্রেণিভিত্তিক কতকগুলি দল বা উপদল তৈরি করে তাদের ওপর নানান কাজের দায়িত্ব থাকবে। খেয়াল রাখতে হবে বিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটি শিক্ষার্থীকে কোনো না কোনোভাবে কিছু না কিছু দায়িত্ব পালন করতেই হবে। প্রতিটি কাজ তত্ত্বাবধানের জন্যও শ্রেণিভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী থাকবে। অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য নয়, সুষ্ঠু পরিকল্পনাগ্রহণই অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করে তুলবে।

# মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক
# পরীক্ষা গ্রহণ কী, কেন এবং কীভাবে

(রজত জয়ন্তী বর্ষ (১৯৭৬-২০০০) এর আলোয় মাধ্যমিক পরীক্ষা)

শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্রমাগত গবেষণা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে আসছে। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও সেই ধারা প্রবহমান। সেই সঙ্গে পরীক্ষা পদ্ধতিকে নিয়েও চিন্তা ভাবনার অন্ত নেই। কত বিচিত্র রকমের পরীক্ষা ব্যবস্থা! লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, অবিরত মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি কতভাবেই না পরীক্ষিত হতে হচ্ছে গিনিপিক শিক্ষার্থীদের।

বর্তমানে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়েও যেভাবে দিনদিন জটিলতা বাড়ছে তার সঙ্গে সমতা রাখতে পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থারও অনেক সংস্কার সাধন প্রয়োজন।

এই পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিমাপের মাধ্যমে তার মূল্য নির্ধারণের অন্যতম মাপকাঠি হল পরীক্ষা। তাই পরীক্ষা ব্যবস্থাকে যতটা নিখুঁত ও বিজ্ঞানসম্মত করা যায় বিচার ততই সূক্ষ্ম ও নির্ভেজাল হয়। এই দিকে লক্ষ রেখেই আজ চারদিকে নানান চিন্তাভাবনা ও গবেষণার সূত্রপাত।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সব থেকে বেশি সংখ্যাক পরীক্ষার্থী যারা জীবনে প্রথম সর্ববৃহৎ পরীক্ষার মুখোমুখি হচ্ছে তাদের নিয়ে যে পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয় তা হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে এবং পরীক্ষার ব্যাপকতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রথমেই এই পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং গ্রহণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার অবতারণা করা যেতে পারে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-কেন্দ্রগুলির জন্য সব থেকে বেশি সংখ্যক ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বা অফিসার- ইন-চার্জ প্রয়োজন হয়। পরীক্ষা গ্রহণের জন্য শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ অফিসার ইন চার্জ শিক্ষা বিভাগের বিদ্যালয় পরিদর্শকদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হয়। অন্য বিভাগ থেকে যাঁরা নিযুক্ত হন তাঁরাও তখন শিক্ষাবিভাগের দায়িত্ব-প্রাপ্ত কর্মী হিসেবে গণ্য হন। যিনি যে বিভাগ থেকেই আসুক না কেন প্রত্যেকের একটাই লক্ষ্য সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা। পরীক্ষার্থীরা যাতে সাবলীলভাবে লিখতে পারে তার পথ পরিষ্কার করা। এই পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি কীরকম হলে তবেই সমস্ত রকমের সমস্যাকে সহজেই অতিক্রম করা যায় সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য আমার সহকর্মী বন্ধু তথা শিক্ষাবিভাগের দরদি কর্মী

এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অধিকাংশ মানুষের কাছে পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করে আলোচ্য বিষয়টি উপস্থাপিত করতে চাই।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই ধরে নিতে হবে পরীক্ষাগ্রহণ একটি জাতীয় কর্তব্য এবং এবিষয়ে প্রত্যেকেরই দায়বদ্ধতা আছে। কর্তব্যে সামান্যতম অবহেলার জন্য একজন নিষ্পাপ শিক্ষার্থীর জীবন চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে এবং যায়ও—একথাটি সবসময় মনে রাখা প্রয়োজন। শিক্ষাবিভাগ বা জেলাপ্রশাসন যেখান থেকেই হোক না কেন যখন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হিসেবে নাম মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে পাঠানো হয় এবং সেই নামের ভিত্তিতে যখন সম্মতিপত্র পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয় তখন থেকেই পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তখন প্রকৃতপক্ষে কোনো অনিবার্য অসুবিধে না থাকলে উক্ত পত্র পাওয়ামাত্রই সম্মতিপত্র পাঠিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হয়। কোনো প্রকার অসুবিধে থাকলেও তা তৎক্ষণাৎ লিখিত ভাবে জানানো প্রয়োজন। তবে, পুত্র, কন্যা বা নিকট আত্মীয় পরীক্ষার্থী থাকলে পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকা আইনগতভাবেই অসিদ্ধ।

সম্মতিপত্র প্রেরণের পর ধরে নিতেই হবে তিনিই ওই কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। তাই, সময় বেশি না থাকলে তৎক্ষণাৎ ওই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই নিয়োগপত্র ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র হাতের কাছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে এসে যাবে। তখনই সেন্টার কমিটির সদস্যদের নিয়ে সভা করে একটি রূপরেখা তৈরি করা প্রয়োজন। কীভাবে বিভাগীয় আদেশনামাকে সামনে রেখে পরিবেশ-পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে অভিজ্ঞতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বকে সঙ্গী করে একটি উপযুক্ত পরীক্ষাগ্রহণ পরিকাঠামো তৈরি করা যায় সে বিষয়ে তৎপর হতে হবে।

এবার নির্দিষ্ট সূচি ও তারিখ অনুযায়ী পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলি যা নিকটবর্তী থানা, ট্রেজারি অথবা পর্ষদ নির্দিষ্ট স্থানে গচ্ছিত রাখা হয়েছে সেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে উক্ত প্রশ্নের প্যাকেটগুলি মিলিয়ে দেখে নিয়ে এমনভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে যাতে পরীক্ষার দিন ওই প্রশ্ন সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। যদি কোনো বিষয়ের প্রশ্নপত্র কম বা বেশি থাকে তাও তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট পর্ষদ কার্যালয়ে জানিয়ে দিতে হবে।

পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরের নিরাপত্তা দেখভাল করার জন্য পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সার্বিক সহযোগিতা চাইতে হবে। মনে রাখতে হবে পরীক্ষা ব্যবস্থা সার্বিকভাবে সফল করে তুলতে এদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসন কিছু নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ স্বেচ্ছাসেবকও নিয়োগের ব্যবস্থা করতে পারেন।

পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য পরিবহণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট সময়ে যাতে রাস্তায় গাড়ি থাকে তার ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আর্কষণ করে তাঁকে দিয়ে মহকুমার সমস্ত কেন্দ্রের অফিসার- ইন- চার্জ এবং

বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নিয়ে একটি সভা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এবং প্রত্যেককে অবহিত করলে অত্যন্ত সুফল পাওয়া যাবে।

পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের বসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে পর্ষদ নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে যেন সিট সাজানো হয়।

পানীয়জল এবং টয়োলেট ব্যবস্থা যেন ভালো থাকে সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে।

পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে মেডিকেল টিম অবশ্যই রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। কোনো কারণে পরীক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে আশু চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তোলা প্রয়োজন। অসুস্থ অবস্থায় পরীক্ষা দিলে তাকে পৃথকভাবে বসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বসন্ত প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগীরও পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে পর্ষদ-নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে সিট যেভাবে সাজানো হয় তার অনুলিপি বাইরে প্রথম দিনে অন্তত একঘন্টা আগে বোর্ডে অথবা কাগজে লিখে টাঙিয়ে দিতে হবে। তাতে কে কোন রুমে আছে তা সহজেই জানতে পারবে এবং ঠিক সময়ে আসন গ্রহণ করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট রুমের চিত্রটিও যেন সেই রুমের বোর্ডে লিখে দেওয়া হয় অথবা বোর্ড না থাকলে আর্ট পেপারে লিখে টাঙিয়ে দিতে পারলে ভালো হয়। তাতে সিট পরিবর্তনের প্রবণতা রোধ করা যায়।

পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে 'সময়' একটি সর্ববৃহৎ উপাদান। প্রত্যেকেরই 'সময়'-সচেতন হওয়া প্রয়োজন। পরীক্ষার দিনে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে প্রশ্নপত্রগুলি কক্ষ অনুপাতে সাজিয়ে নিয়ে যথাসময়ে এবং যথাস্থানে পরীক্ষার্থীদের হাতে দেওয়া প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে পরীক্ষাগ্রহণ পর্ব শুরুর এক/দেড় মিনিটের মধ্যে যেন প্রশ্নগুলি পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়। বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে তবেই প্রশ্নপত্র বিতরণ করতে হবে।

বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রধান শিক্ষক যিনি পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রের সম্পাদক, পর্যবেক্ষক বা সুপারভাইজার-এর সঙ্গে নিজের কর্মপদ্ধতি নিয়ে পৃথক আলোচনা করা প্রয়োজন। তাতে সুষ্ঠুভাবে কাজগুলি সম্পন্ন করার এবং নিজের স্বচ্ছ চিন্তাভাবনা কার্যকরী করার পথ ত্বরান্বিত হবে।

প্রথম পরীক্ষার দিনে পরীক্ষা শুরুর একঘন্টা আগে নজরদার শিক্ষক শিক্ষিকাসহ পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে নিয়ে একসভায় মিনিট দশেকের মতো আলোচনা করে পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে কিছু পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন। ফলে, আপনি কীভাবে পরীক্ষাটি চালাতে চাইছেন তা প্রত্যেকের কাছে পরিস্কার হবে। তা না হলে একই কেন্দ্রের বিভিন্ন কক্ষে ভিন্ন ভিন্ন নীতি অনুসৃত হয়ে একটি বিতর্ক শুরুর সূচনা হয়েই থাকতে পারে। একাধিক উপকেন্দ্র থাকলে তখন আগেই নজরদার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

মনে রাখতে হবে বাইরে অবাঞ্ছিত জনতার ভিড় ও পাড়াতুতো দাদাদের অত্যুৎসাহের জন্য ভেতরের ও বাইরের পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। সেজন্য পুলিশ প্রশাসনকে অগ্রিম সতর্ক করে রাখতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন তথা তাঁদের মনোনীত স্বেচ্ছাসেবকদেরও বাইরের দিকটার আইনশৃঙ্খলা দেখার ও সুস্থ পরিবেশ রচনার দায়িত্ব দিতে পারা যায়।

আরও মনে রাখতে হবে অফিসার-ইন-চার্জ পদটি খবরদারির পদ নয় বা চুপচাপ বসে থেকে খবরের কাগজ পড়ার পদ নয়। নিজে যেমন সক্রিয় থাকবেন এবং পরিশ্রম করবেন ঠিক তার হাজারো গুণ বেশি ফল তিনি তার সহযোগী বন্ধুদের কাছ থেকে পাবেন। অফিসার-ইন-চার্জ হলেন যৌথভাবে কর্ম-সম্পাদন প্রকল্পের একজন দায়িত্বশীল আহ্বায়ক তথা তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। এই ভাবনা যদি হৃদয়প্রসূত হয় তাহলে তাঁর আলোচনা এবং আবেদন প্রাসঙ্গিক হবে এবং ফলও হাতে হাতে পাওয়া যাবে। তবে মনে রাখতে হবে, সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি হলে তার কৈফিয়ত অফিসার-ইন-চার্জকেই দিতে হবে এবং ফলভোগ তাঁকেই করতে হবে।

আলোচনা বা আবেদন যে ভাবেই আপনি আপনার চিন্তাভাবনার কথা আপনার সহযোগী বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেন না কেন তা যেন অবশ্যই উৎসাহব্যঞ্জক হয় এবং যুক্তিগ্রাহ্য হয়। এমন কিছু বলা বা করা উচিত নয় যাতে কেউ সামান্যতম মানসিক আঘাত পান। অনেক সময় পর্যদ প্রদত্ত নির্দেশিকার পাশাপাশি আরও কিছু অনু নির্দেশিকার প্রয়োজন হয়। সেগুলি অফিসার-ইন-চার্জ এর অভিজ্ঞতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফসল হবে। আলোচনা বা আবেদনে এই বিষয়গুলি রাখা যেতেই পারে।

সাথি শিক্ষক-শিক্ষিকা বা কর্মী বন্ধুগণ, মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর প্রাক্ মুহূর্তে প্রত্যেককে জানাই শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন।

প্রত্যেকদিনের পরীক্ষা যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায় সেজন্য প্রত্যেকের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি। পরীক্ষা গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য আমরা আলোচ্য বিষয়গুলির প্রতি প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ও রূপায়িত করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি এবং আবেদন জানাচ্ছি।

পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা উত্তরপত্র লেখার জন্য অনেক সময় পিচ বোর্ড ব্যবহার করে। প্রতিদিন খাতায় স্বাক্ষর করার সময় লক্ষ রাখতে হবে তাতে যেন নিজের নাম ও রোল নম্বর ভিন্ন অন্য কিছু লেখা না থাকে। লেখা থাকলে তা জমা নিয়ে পরীক্ষার পর ফিরিয়ে দিতে হবে।

অনিবার্য কারণ ব্যতীত কোনো পরীক্ষার্থী প্রথম ও তৃতীয় ঘন্টায় বাইরে যেতে পারবে না। দ্বিতীয় ঘন্টায় বাইরে যাবার আগে তার প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র ঠিক আছে কী না দেখে নিতে হবে।

পরীক্ষাগ্রহণ কক্ষে কোনো একজন পরীক্ষার্থীর কাছে থেমে সে কেমন লিখছে তা দেখবেন না। এতে সেই পরীক্ষার্থী অস্বস্তি বোধ করবে। তাছাড়া, প্রশ্ন কেমন পড়েছে বা পরীক্ষা কেমন হচ্ছে তা জানতে চাইবেন না এবং প্রশ্নসংক্রান্ত কোনো মন্তব্য করবেন না। এককথায় পরীক্ষার্থীর সঙ্গে কোনরকম কথা বলবেন না।

সবসময় সদাসতর্ক থাকবেন এবং চেয়ারে চুপচাপ বসে না থেকে পায়চারির মাধ্যমে কক্ষের অভ্যন্তরে পর্যবেক্ষণ করবেন।

পরীক্ষা কক্ষে বই-খাতাপত্র থাকবে না। কোন নজরদার শিক্ষক-শিক্ষিকাও যেন বই বা খবরের কাগজ নিয়ে না যান বা সঙ্গে মোবাইল না রাখেন তা দেখতে হবে।

কক্ষে কর্তব্যরত শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনিবার্য কারণ ব্যতীত দ্বিতীয় ঘন্টায় কেউ বাইরে যাবেন না। কেননা, ওই সময়টাই পরীক্ষার্থীদের বাইরে যাবার সময় এবং ওই সময়েই কক্ষে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন হয়। তাই, প্রথম ঘন্টার শেষ কুড়ি মিনিট এবং তৃতীয় ঘন্টার প্রথম কুড়ি মিনিটে বাইরে যেতে পারেন।

একটি কক্ষ থেকে একই সময়ে একজনের বেশি দুজন পরীক্ষার্থী যাতে বাইরে না যায় সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে। তবে বড়ো কক্ষ বা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলে বিকল্প চিন্তা করতেই হবে।

পরীক্ষা শেষের চূড়ান্ত ঘন্টা বাজার আগে পনেরো মিনিট এবং পাঁচ মিনিট আগে একবার করে দু'বার ঘন্টা বাজবে। সমস্ত খাতা মিলিয়ে নেবার পরই তবে পরীক্ষার্থীদের কক্ষত্যাগ করার অনুমতি দেবেন।

পরীক্ষার্থীরা অনেকসময় অ্যাডমিট কার্ড বা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জেরক্স কপি নিয়ে আসে। তার জন্য অগ্রিম সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন যে তারা যেন অরিজিন্যাল কাগজপত্র নিয়ে আসে। অনেক সময় দেখা যায় পরীক্ষার্থীরা তাড়াহুড়ো করে আসতে গিয়ে অ্যাডমিট কার্ড বা রেজিস্ট্রেশন নম্বর আনতে ভুলে যায়। এক্ষেত্রে ডেসক্রিপটিভ রোল-এর সাহায্য না নিয়ে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকার স্বাক্ষর সম্বলিত প্রত্যেকের নাম, রোল নম্বর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বরযুক্ত একটি তালিকা আগেই নিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োজনে তার মাধ্যমে কাজ চালানো হবে এবং ওই পরীক্ষার্থীকে সনাক্তকরণ করবেন ওই দিনের বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা।

অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক একটি কক্ষের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। কোনো সমস্যা বা জটিলতা দেখা দিলে তাদের সুপরামর্শের জন্যই পরীক্ষা চলাকালীন তাঁদের নির্দিষ্ট স্থানে থাকা অবশ্যই কর্তব্য।

ইতিহাস ও ভূগোল পরীক্ষার দিনের মানচিত্র মূল খাতার সঙ্গে প্রথম পনেরো মিনিটের মধ্যেই গেঁথে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে তাতে যেন নাম, রোল নম্বর লেখা থাকে, নজরদার শিক্ষক-শিক্ষিকার স্বাক্ষর ও ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সিলমোহর থাকে।

পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষাকেন্দ্র সংলগ্ন জেরক্স কেন্দ্রগুলি পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

পরীক্ষা শেষ হলে প্রতিদিনের উত্তরপত্রগুলি যাতে নিরাপদে পর্ষদ নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানো যায় তার জন্য সমস্তরকম নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পরীক্ষা চলাকালীন বহিরাগত কেউ যাতে কক্ষে প্রবেশ না করে সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে। ঘন্টা পড়ার সঙ্গো সঙ্গো নিশ্চিত হতে হবে যে কক্ষে কোনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তি নেই—তারপর প্রশ্ন দিতে হবে। তা না হলে ভিড়ের মাঝে প্রশ্ন দিতে শুরু করলে এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তির হাতে প্রশ্ন পড়লে সে প্রশ্ন সঙ্গো সঙ্গো বাইরে বেরিয়ে যাবে।

পরীক্ষা চলাকালীন অনেক সময় কোনো কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকার পরীক্ষা কক্ষ ঘুরে নিজেদের ছাত্রছাত্রীরা কেমন লিখছে দেখার বা তাঁরা আছেন কী না তা জানানোর

ইচ্ছে প্রকাশ করেন। তবে, এবিষয়ে তাঁদের নিরুৎসাহিত করাই শ্রেয়। মনে রাখতে হবে পরীক্ষার্থীদের মনে ভীতি সঞ্চার করা বা তাঁদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি করা আপনার কাজ নয়। তারা যাতে নির্বিঘ্নে উত্তর লিখতে পারে তার পরিবেশ রচনার জন্যই আপনার প্রয়োজনীয়তা এবং আপনার গুরুত্ব।

পরীক্ষার চূড়ান্ত ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে অত্যুৎসাহিত জনতা যাতে পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে ঢুকে না পড়ে সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে এবং চূড়ান্ত ঘন্টা পড়ার আগে মূল প্রবেশপথগুলি বন্ধ রাখতে হবে। যেখানে প্রাচীর বা বেড়া নেই সেখানে পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে এলাকাটিকে ঘিরে রাখতে হবে। আরও সতর্ক থাকতে হবে যাতে শেষ পরীক্ষার দিনে অতিউৎসাহী শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে বেঞ্চ, দরজা, জানালার ক্ষতি না করে।

পরীক্ষা শেষে ইংরেজির প্রশ্ন কেমন হয়েছে তার নমুনা কপি বিদ্যালয়গুলির পক্ষ থেকে দেবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এক্ষেত্রে সমস্ত পরীক্ষা শেষে প্রশ্নপত্র দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষের কাছে মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ বিষয়ে প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পরীক্ষাগ্রহণকেন্দ্রের পক্ষ থেকে কিছু বিষয়ে আবেদন রাখতেই পারেন এবং পর্ষদ কর্তৃপক্ষ এই বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দিলে পরীক্ষাগ্রহণ ব্যবস্থা আরও সুন্দর ও সাবলীল হবে।

একটি কেন্দ্রের যাতে অধিক সংখ্যক উপকেন্দ্র না থাকে সে বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন। উপকেন্দ্রগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। যত দিন না করা সম্ভব হয় তত দিন ওই উপকেন্দ্রগুলির জন্য অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বা অফিসার-ইন -চার্জ নিয়োগ করা প্রয়োজন।

পরীক্ষাসংক্রান্ত কোন খবরাখবর আদান-প্রদান এবং উত্তরপত্র গ্রহণের জন্য প্রতি মহকুমাতে পর্ষদের অস্থায়ী কার্যালয় খুলে রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এখানে উপযুক্ত পুলিশি প্রহরায় খাতাপত্র থাকবে এবং এখান থেকেই পর্ষদ কর্তৃপক্ষ তাঁদের আঞ্চলিক কার্যালয়- গুলিতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন। ফলে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির ওপর আর্থিক চাপ যা নিরীহ শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি নিতে বাধ্য হয় তা বন্ধ করা যাবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আরও একটি সময় অপচয়মূলক দিক এবং বর্তমান পরিকাঠামোয় সব চেয়ে অপ্রয়োজনীয় হল, মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাটিতুলে দিয়ে ওই নম্বর লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে যোগ করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে বিষয়ের পরিবর্তে গ্রুপ-এ উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়টিও ভেবে দেখার সময় এসেছে।

পরিশেষে বলা যায়, পরীক্ষা পরীক্ষার মতো হলে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় অধিক মন দেবে, অসদ-উপায় অবলম্বনের প্রবণতা কমবে বা বন্ধ হবে এবং অকারণে সময় নষ্ট না করে সারা বছর ব্যাপী নিজেকে উপযুক্ত হিসেবে তৈরি করতে যত্নবান হবে।

এইভাবে সতকর্তার সঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণ করলে পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হবে না। প্রত্যেকের যথার্থ মূল্যায়ন হবে। মনে রাখতে হবে আমরা শিক্ষাবিভাগের কর্মী বা শিক্ষাবিভাগ নিযুক্ত কর্মী। তাই, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণে আমাদের দায়-দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি।

# এখনও কেন এত 'বিদ্যালয় ছুট'

শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে একটা অগ্রগতির জোয়ার এসেছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাদান করে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে রাজ্যটিকে যাতে মুক্ত করা যায় তার জন্য সরকারিভাবে নানান উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এখনও মাধ্যমিক স্তরে 'বিদ্যালয় ছুট' শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক অবস্থায় আছে। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমায় দীর্ঘ ছ'বছর ধরে সমীক্ষা চালিয়ে, প্রতিটি বিদ্যালয় কম করে তিনবার করে পরিদর্শন করে, প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে, স্থানীয় প্রশাসন, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এবং গ্রামেগ্রামে পাড়ায়পাড়ায় ঘুরে অভিভাবকদের সঙ্গে মত বিনিময় করে 'বিদ্যালয় ছুট'-এর সংখ্যা নির্ণয়, কারণ অনুসন্ধান এবং রোধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে একটা সাড়া জাগানো সাফল্য লাভ করা গেছে। তা সত্ত্বেও দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই এখনও প্রায় ৫০ শতাংশেরও বেশি ' বিদ্যালয় ছুট' বা 'হারিয়ে যাওয়া' শিক্ষার্থীর সংখ্যা শিক্ষা বিভাগকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

কী কারণে 'বিদ্যালয় ছুট' হচ্ছে সে বিষয়ে এক একটি ছ'বছরের শিক্ষাচক্রে সমীক্ষা চালিয়ে এবং রীতিমতো গবেষণা করে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা এখানে উল্লিখিত হল।

১) দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই রুজি-রোজগারের তাগিদে ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ছ'বছরের একটি শিক্ষাচক্রে প্রায় ৪ শতাংশ শিক্ষার্থী বাড়ির বাইরে এমন কী পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারতের বাইরেও চলে যায়।

২) সাধারণ বিভাগে লেখাপড়া করে চাকরি পাওয়া যাবে না এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে এবং চোখের সামনে হতাশাগ্রস্ত বেকার অগ্রজদের দেখে একটি শিক্ষাচক্রে প্রায় ৬ শতাংশ শিক্ষার্থীর বাড়িতে আর্থিক সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে না এসে পারিবারিক কাজে যুক্ত হয়।

৩) বেশ কিছু পরিবারে কন্যা সন্তানদের এখনও বাড়তি বোঝা হিসাবে দেখা হয়। তাদের প্রতি অকারণ নেতিবাচক মনোভাব এবং একটু বড়ো হলেই অর্থাৎ ১৪ বছর বয়সে পা রাখলেই কোনো আইনের তোয়াক্কা না করে তপশিল জাতি, তপশিল উপজাতি, কিছু অশিক্ষিত সংখ্যালঘুপরিবার এমনকী কখনও কখনও অন্যান্য সচ্ছল সাধারণ জাতির পরিবারগুলিতেও অপ্রাপ্ত বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে অভিভাবকরা দায়মুক্ত হতে চাওয়ায় একটি শিক্ষাচক্রে প্রায় ৫ শতাংশ ছাত্রী লেখাপড়ার প্রতি আন্তরিক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

৪) এক শ্রেণির শিক্ষক শিক্ষিকার দায়বদ্ধতার অভাবে এবং তাঁদের কাছ থেকে উপযুক্ত পরিচর্যা বা সহানুভূতি না পেয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে এমন কী অবজ্ঞাসূচক কথাবার্তায় বা তিরস্কারে জর্জরিত হয়ে এক একটি শিক্ষাচক্রে প্রায় ৪ শতাংশ শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দেয়।

৫) এখনও কিছু অভিভাবক অজ্ঞতাবশত ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান না। ফলে ৫ম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েও একটি শিক্ষাচক্রে প্রায় ৩ শতাংশ শিক্ষার্থী লেখাপড়া ছেড়ে দেয়।

৬) পিতামাতার আর্থিক দুরবস্থার কারণে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যেতে যেতেই বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে পাকাপাকিভাবে রোজগার করতে শুরু করে দেয়। ফলে একটি শিক্ষাচক্রে প্রায় ৪ শতাংশ শিক্ষার্থী হারিয়ে যায়।

৭) কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার ওপর নির্ভর না করে প্রায় ৯৮ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাইভেট টিউশন পড়ে। এদের মধ্যে প্রায় ৫ শতাংশ শিক্ষার্থী নিজের প্রচেষ্টায় বেশ এগিয়ে যায়। বাকিরা বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি না থাকা প্রাইভেট টিউশনের ওপর জোর দেওয়ায় বিদ্যালয়ের পাঠ তৈরির সময় পায় না। এদের মধ্যে এক একটি শিক্ষাচক্রে প্রায় ১০ শতাংশেরও বেশি শিক্ষার্থীর আদৌ কিছু হয় না। তারা বারবার অকৃতকার্য হয়ে এক সময় বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দেয়।

৮) পাঠ্যতালিকায় পাঠ্যপুস্তকের গুরুভারজনিত কারণ এবং পাশাপাশি বাজারি নোট বইএর প্রভাব শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করে। ফলে এক একটি শিক্ষাচক্রে প্রায় ৩ শতাংশ শিক্ষার্থী হারিয়ে যাচ্ছে।

৯) প্রাথমিক স্তরে সঠিকভাবে লালিত পালিত না হওয়ায় বেশ কিছু শিক্ষার্থী ৫ম শ্রেণিতে এসে নিজেকে অন্যান্যদের সমতুল্য করে নিতে না পেরে নিজেকে আড়াল করতে করতে এক সময় বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দেয়। এক একটি শিক্ষাচক্রে প্রায় ১২ শতাংশ শিক্ষার্থী এভাবে হারিয়ে যায়।

১০) কিছু বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র 'পড়াশোনা' ব্যতীত অন্যান্য সহপাঠক্রমিক বিষয়গুলিতে যেমন খেলাধুলা, অঙ্কন বা নৃত্যগীতাদি সাংস্কৃতিক চর্চায় আদৌ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে, যারা ওই বিষয়গুলিতে বেশি আগ্রহী তারা তাদের চাহিদাপূরণ না হওয়ায় বিদ্যালয়ে আসতেই চায় না। এক একটি শিক্ষাচক্রে এভাবে প্রায় ২ শতাংশ শিক্ষার্থী হারিয়ে যায়।

১১) বর্তমানে অনেক পিতামাতার একটি মাত্র সন্তান থাকায় তারা বেশ আদুরে হয়। অপরদিকে, মাত্রাতিরিক্ত আর্থিক সচ্ছলতা এবং তাদের বেপরোয়া জীবন যাপন সন্তানের ওপর ভীষণ প্রভাব বিস্তার করে। ফলে এরকম পরিবেশে এক একটি শিক্ষাচক্রে প্রায় ১ শতাংশ শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিয়ে বাড়িতেই ভোগবিলাসে মত্ত থাকে।

১২) মাদক দ্রব্যসহ নানান নেশার সামগ্রী নগ্ন নারীদেহ সহ টি.ভি বা ভি.ডি.ও-র পর্দায় দেখে এবং তার যথেচ্ছ ব্যবহার শিখে বেশ কিছু শিক্ষার্থী পড়াশোনাসহ ভবিষ্যৎ গঠনের কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে রাখে। গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে গভীর রাতে বড়োদের

পাশাপাশি 'নীল ছবি' দেখে বেশ কিছু শিক্ষার্থী নিজেদের বিপথগামী করে তোলে। এক একটি শিক্ষাচক্রে এভাবে প্রায় ২ শতাংশ শিক্ষার্থী হারিয়ে যায়।

১৩) বিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে কেবলমাত্র বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়া নির্ভর করে। কোনো কারণে সেই পরীক্ষার ফল খারাপ হলে তার আর সংশোধনের সুযোগ থাকে না। অপর পরীক্ষাগুলি থেকে প্রাপ্ত নম্বর নিয়ে চূড়ান্ত ফল তৈরির ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীরা অনেক সময় ভালোভাবে পড়াশোনা করেও বিফল হয় অর্থাৎ পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ পায় না। বিফল হওয়ার হতাশায় অনেক সময় তারা পড়াশোনার ওপর আস্থা হারিয়ে বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে। এভাবে এক-একটি শিক্ষাচক্রে প্রায় ৩ শতাংশ শিক্ষার্থী 'বিদ্যালয় ছুট' হয় বা হারিয়ে যায়।

১৪) 'শিখনের ন্যূনতম মান'- এ পৌঁছানোর উদ্যোগ না নিয়ে কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা পরীক্ষার সময় বূঢ়ভাবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতে বার বার আটক করায় একটি শিক্ষাচক্রে প্রায় ৩ শতাংশ শিক্ষার্থী হতাশায় 'বিদ্যালয় ছুট' হয়।

১৫) মাধ্যমিক স্তরের স্বল্পবয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যালয়ে এবং গৃহপরিবেশে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটার ফলে একটি শিক্ষাচক্রে প্রায় ১ শতাংশ শিক্ষার্থী নিজের অজ্ঞাতেই 'বিদ্যালয় ছুট' হয়ে যায়।

১৬) নিয়মিত বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শনের উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকায় বিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষার গুণগত মান তত্ত্বাবধান করার মতো সুযোগ বিদ্যালয় পরিদর্শকদের থাকে না। ফলে, বিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষার্থীদের গুণগত মানের সঠিকভাবে মূল্যায়ন না হওয়ায় তার সামগ্রিক প্রভাব প্রায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর ওপর পড়ে। তাই, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার সামগ্রিক প্রক্রিয়াগুলি ব্যাহত হয়।

কারণগুলি অত্যন্ত যত্নসহকারে অনুসন্ধানপূর্বক বিদ্যালয়গুলি বার বার সাধ্যাতীতভাবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পরিদর্শন করে এবং বিদ্যালয়গুচ্ছ গঠনের মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্যালয়ে একযোগে বিদ্যালয়গুচ্ছের মহকুমা স্তরে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি আঞ্চলিক স্তরে কার্যকর করা সহ প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান জোরদার করে 'বিদ্যালয় ছুট' শিক্ষার্থীর সংখ্যা কিছুটা হলেও হ্রাস করা সম্ভবপর হয়েছে।

তথ্যে প্রমাণিত হচ্ছে, এইভাবে প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে কেবলমাত্র শিক্ষাবিভাগের নিজস্ব পরিকাঠামোতেই আগামীদিনে 'বিদ্যালয় ছুট' রোধে প্রায় সম্পূর্ণভাবে সাফল্যলাভ করা যাবে।

# বিদ্যালয় শিক্ষাপ্রশাসনে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ

বিদ্যালয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হয় শিক্ষা বিভাগ অনুমোদিত বৈধ পরিচালন সমিতির মাধ্যমে। সম্পাদক সেই পরিচালন সমিতির মূল দায়িত্বে থাকেন। বিদ্যালয় শিক্ষা প্রশাসনের কার্যকরী প্রশাসক প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা। বিভাগীয় আনুষঙ্গিক কাজকর্মের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে শিক্ষা পরিচালনারও মূল দায়িত্ব প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাকেই পালন করতে হয় এবং বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির কাছে কৈফিয়ত প্রদান করতে হয়। প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সহায়তা করার জন্য সৃষ্ট হয়েছে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদটি। সহকারী প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা বিদ্যালয় অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সম্পাদকও। এই অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল বিদ্যালয়ের শিক্ষাসংক্রান্ত নানান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা কার্যকরী করার জন্য বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির কাছে সুপারিশ করে। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির অনুমোদন পেলেই তবে তা বিদ্যালয়ের নিজস্ব আইনে পরিণত হয়।

শিক্ষাবিষয়ক বা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাবগুলি বিদ্যালয়ে কার্যকর করতে প্রত্যেক সহ শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাদান সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্যই সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা। সুতরাং, শিক্ষার স্বার্থে প্রত্যক্ষ পঠন-পাঠন ছাড়াও শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নতি সংক্রান্ত কিছু দায়-দায়িত্ব এঁদের থেকেই যায়। কোথাও তাঁরা স্বতোপ্রণোদিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন, কোথাও বা আইনের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। অনেকেই নিজের কর্তব্য কী তা ভুলে গিয়ে আইন মেপে মেপে চলেন। এইভাবে চলতে থাকলে নিছক বেতন গ্রহণ করা হয়, শিক্ষাদান হয় না। হাজারো সমস্যা জর্জরিত বিদ্যালয়গুলিতে 'হচ্ছে না হচ্ছে না' ধ্বনি চারদিকে। কিন্তু, কিছু না করেই যদি এইরকম একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় তা সমাজের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক এবং চিন্তাশীলদের কাছে উদ্বেগজনক। এদের জন্য বিদ্যালয়ের নিজস্ব আইনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিছু করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হলে এবং প্রকৃতপক্ষে কিছু করতে হলে নিম্নরূপভাবে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই হবে। অনেক সময় প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রেখে প্রশাসন চালাতে চান। সেখানে খুব কম ক্ষেত্রেই সফল হওয়া যায়। তাই, শিক্ষাপরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় চিন্তাভাবনা পরিচালন সমিতিতে উপস্থাপিত করে তা অনুমোদন করিয়ে নিয়ে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের ওপর কার্যকরী করার দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল তা কার্যকরী করার জন্য স্টাফ কাউন্সিলের সভায় উপস্থাপিত করলে এবং রূপায়ণের পন্থা ঘোষণা করলে তবেই তা শিক্ষার্থী সমাজের উপকারে আসবে যা পরোক্ষভাবে একটি বিদ্যালয়ের রূপ বদলে দিতে পারবে।

অনেক অনেক কার্যসূচি একটি শিক্ষাবর্ষের বা একটি শিক্ষাচক্রের জন্য ঘোষণা করা যেতে পারে এবং তা সার্থকভাবে রূপায়িতও হতে পারে। তার মধ্যে কিছু প্রস্তাব আকারে তুলে ধরা হল।

(১) বিদ্যালয়ে প্রার্থনা সভা পরিচালনার জন্য নির্দিষ্টভাবে প্রতিটি শ্রেণি বা বিভাগের জন্য একজন করে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তাঁদের উদ্যোগেই অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(২) প্রতিটি শ্রেণি বা বিভাগের জন্য একজন বা দুজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকবেন। তাঁদের কাজগুলি হবে নিম্নরূপঃ-

(ক) বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিয়মিতকরণে প্রচেষ্টা গ্রহণ। বিদ্যালয় থেকে না অনুমতি নিয়ে চলে যাওয়া বন্ধ করতে শেষ পিরিয়ডে উপস্থিতি গ্রহণ করে তার ওপর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) শ্রেণিকক্ষে বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষার্থীর আসন বণ্টন এবং তার তদারকিকরণ।

(গ) দলনেতা বা মনিটর নিয়োগের মাধ্যমে শ্রেণির শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঘ) শিক্ষার্থীরা অনুপস্থিত থাকলে তা সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঙ) টিফিনের বিরতিতে কেউ বাড়ি যেতে চাইলে তার কারণ নথিভুক্তসহ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(চ) বছরে তিনবার অভিভাবক সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা নথিভুক্তকরণ।

(ছ) পরীক্ষার ফলাফলের হিসেব রাখা এবং মার্কসিট তৈরি, অভিভাবকের কাছে পাঠানো এবং পুনরায় তা ফেরত নিয়ে সংরক্ষণ এবং চূড়ান্ত পরীক্ষার পরে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) পরীক্ষা পরিচালনায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে দল গঠন করে এক একটি শ্রেণির পরীক্ষা নির্বিঘ্নে চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) বিদ্যালয়ের খেলাধুলা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে যাতে করা যায় এবং নবীনবরণ, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান, বিদায় অনুষ্ঠান, শিক্ষামূলক ভ্রমণসহ সমস্ত প্রকার অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য বা তদারকির জন্য শ্রেণিভিত্তিক একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকার ওপর দায়িত্ব প্রদান।

এইভাবে কাজগুলি ভাগ করে নিয়ে প্রয়োজনমতো শিক্ষক শিক্ষিকার ওপর দায়িত্বভার অর্পণ করলে বিদ্যালয় প্রশাসন ও অ্যাকাডেমিক দিক দুটিরই প্রভূত উন্নতি হবে।

এইভাবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করতে গিয়ে বাধা যে আসবে না তা নয়। একদিকে কোথাও কোথাও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্ষমতা ছাড়তে চাইবেন না, অপরদিকে সহ শিক্ষক-শিক্ষিকারাও আইনের কচকচানি দেখাবেন। উত্তর একটাই, ভালো কাজ করতে গেলে আইনের প্রয়োজন হয় না। কাজই আইন তৈরি করে নিতে পারে, প্রয়োজন মানসিকতার এবং শিক্ষার্থীদের স্বার্থে, শিক্ষার স্বার্থে কিছু করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়া। চেষ্টা করে দেখতে আপত্তির কী থাকতে পারে! আসুন না, আমরা সবাই হাত মেলাই।

# বিকল্প পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতির সন্ধানে

পরীক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ে দিনের পর দিন নানান আলোচনা-সমালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে দেশে-বিদেশে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বা সংস্থায় বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষা বিভিন্ন পদ্ধতিতে গৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় চলছে অবিরত মূল্যায়ন পদ্ধতি। সেখানে এখনও চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সংযোজন-বিয়োজন। প্রাথমিকস্তরের মূল্যায়ন পদ্ধতিকে নিয়ে একটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হলেও উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের অর্থাৎ পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষাগ্রহণকে নিয়ে এখনও মতান্তর আছে। যাঁরা যে মতবাদেই বিশ্বাসী হন না কেন প্রত্যেকেরই লক্ষ্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর সঠিকভাবে প্রকৃত মূল্যায়ন করা, নির্দিষ্ট সময়ে নির্ভুলভাবে ফল প্রকাশ করা, পরীক্ষা গ্রহণের জন্য কম সময় ব্যয় করে শ্রেণি পঠন পাঠনের ওপর বেশি করে গুরুত্ব দিয়ে বেশি কর্মদিবস বরাদ্দ করা। বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে কমপক্ষে ২০০দিন শ্রেণি পঠন-পাঠনের জন্য রাখার লক্ষ্যে ছুটির দিন কমানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও এখনও কিন্তু, বহু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বেশি সময় ব্যয় করে শ্রেণি পঠন-পাঠনের জন্য ২০০ দিনের কম সময় রাখছেন। শুধু তাই নয়, শিক্ষার্থীরাও সুযোগ বুঝে ষান্মাসিক পরীক্ষাগ্রহণের ৮/১০ দিন আগে থেকে এবং বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের ১৫/২০ দিন আগে থেকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে পঠন-পাঠন সম্পর্কে ছেদ টানছে। প্রত্যেকেই এই দৃশ্য নির্বিকার চিত্তে হজম করছেন। শিক্ষক শিক্ষিকাদের কেউ কেউ হাজির হওয়া দু-চারজন মাত্র ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে শ্রেণিকক্ষে গিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়েন। অনেক বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা মার্চের শেষ সপ্তাহে বা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে শেষ করে দিয়ে চলে দীর্ঘদিনের কর্মবিরতি। ফলে, শিক্ষাবর্ষের শেষ মাসটিতে পঠন-পাঠন আদৌ হয় না। যখন জানুয়ারিতে শিক্ষাবর্ষ শুরু হত তখন এ সমস্যা ডিসেম্বরে দেখা যেত। এছাড়াও অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক এই দুই বৃহৎ পরীক্ষার জন্য একসঙ্গে বহু উত্তরপত্র পরীক্ষা করতে হওয়ায় এক একজন পরীক্ষকের ওপর ভীষণভাবে চাপ পড়ে। তাই সকল সমস্যা সমাধানে কেউ কেউ চিন্তাভাবনা করলেও তা চিন্তাভাবনার স্তরেই থেকে গেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন পদ্ধতির প্রচলন করে সাফল্যলাভের দাবিদার হতে শিক্ষাবিভাগে কাউকে দেখা যায়নি। তাই, কর্মসূত্রে বিগত ছয় বছরের প্রচেষ্টাকে মূলধন করে সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে একগুচ্ছ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দকে সম্মত করিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যে সাফল্যলাভ করা সম্ভব হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করেই এই গবেষণামূলক নিবন্ধ এবং শিক্ষাবিভাগকে প্রস্তাবটি গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে তথ্য পেশ।

বর্তমান প্রচলিত পরীক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করে এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা করলে একই সঙ্গে অনেকগুলি উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

১। শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকটি পাঠ মন দিয়ে আয়ত্ত করতে অভ্যস্ত হতে হবে।

২। পরীক্ষার দিন ঘোষণার পর থেকে পরীক্ষা গ্রহণের আগের দিন পর্যন্ত বিদ্যালয়ে না এসে বাড়িতে থাকার প্রবণতা দূর হবে।

৩। প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী প্রতিটি পর্বের পরীক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শিখবে।

৪। পরীক্ষার জন্য একটি শিক্ষাবর্ষে মাত্র ১০টি দিন ব্যয় হবে। কেবলমাত্র শেষ মাসে ফলপ্রকাশের জন্য অতিরিক্ত ৫ দিন সময় প্রয়োজন হবে।

৫। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য একটি দিনও রাখতে হবে না।

৬। শ্রেণি পঠন-পাঠনের দিন সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

৭। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একসঙ্গে একরাশ উত্তরপত্র পরীক্ষা করার চাপ কমবে।

৮। কোনো পরীক্ষার্থী একটি পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য হলে বা একটি পরীক্ষার ফল খারাপ হলে পরবর্তী পরীক্ষাগুলিতে তা পুষিয়ে নিতে পারবে।

৯। প্রতিটি পরীক্ষার সমান গুরুত্ব থাকায় প্রত্যেকে বাধ্য হয়ে পঠন-পাঠনে গুরুত্ব দেবে।

১০। এপ্রিল মাসে অকারণে শ্রেণি পঠন-পাঠন বন্ধ রেখে কাজের দিনগুলিকে নষ্ট করার প্রবণতা রোধ করা সম্ভব হবে।

১১। পরীক্ষা গ্রহণের জন্য শ্রম, সময় ও অর্থ বাঁচবে।

১২। প্রাইভেট টিউশনের ওপর নির্ভরতা অনেকখানি কমবে এবং নোট মুখস্থ করা অপেক্ষা পাঠ্যপুস্তক পড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

## কীভাবে এই পরীক্ষা গৃহীত হবে

১। প্রতিটি শিক্ষার্থীর হাতে শিক্ষাবর্ষের সূচনাপর্বে পঠনপাঠন শুরুর প্রথম দিনেই 'দিনলিপি'র মাধ্যমে বিদ্যালয় ও পঠন-পাঠন সম্পর্কিত যে-সকল তথ্য ও নিয়মাবলি দেওয়া হবে তাতেই পরীক্ষার দিন ও সময়সূচি উল্লিখিত থাকবে এবং প্রতি মাসে প্রতি বিষয়ে কতদূর পড়ার ওপর প্রশ্নপত্র রচিত হবে তার বিশদ বিবরণ থাকবে।

২। বর্তমান মে থেকে প্রচলিত শিক্ষাবর্ষে জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল এই মাসগুলির প্রত্যেকটির শেষ কাজের দিনটি পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। শিক্ষাবর্ষ পরিবর্তিত হয়ে জানুয়ারি থেকে শুরু হলেও ছুটির মাস ছুটি বাদে অন্য ১০ মাসে পরীক্ষা হবে এবং সময় আরও বেশি পাওয়া যাবে। শিক্ষাবর্ষের শেষ মাসটিতে শেষ কাজের দিনের ৫ দিন আগে পরীক্ষা গৃহীত হবে। কেননা, ফল প্রকাশের জন্য ৫ দিন সময় রাখতেই হবে।

৩। বিভিন্ন শ্রেণির জন্য পরীক্ষার বিষয় ও নম্বরসূচি —

| পঞ্চম শ্রেণি | ষষ্ঠ শ্রেণি | সপ্তম/অষ্টম শ্রেণি | নবম/দশম শ্রেণি |
|---|---|---|---|
| বাংলা — ২০ | বাংলা — ২০ | বাংলা — ২০ | বাংলা (১ম) — ১০ |
| ইংরেজি — ২০ | ইংরেজি — ২০ | ইংরেজি — ১০ | বাংলা (২য়) — ১০ |
| গণিত — ২০ | গণিত — ২০ | গণিত — ১০ | ইংরেজি — ২০ |
| বিজ্ঞান — ১০ | বিজ্ঞান — ১০ | ভৌতবিজ্ঞান — ১০ | গণিত — ২০ |
| ইতিহাস — ১০ | ইতিহাস — ১০ | জীবনবিজ্ঞান — ১০ | ইতিহাস — ১০ |
| ভূগোল — ১০ | ভূগোল — ১০ | ইতিহাস — ১০ | ভূগোল — ১০ |
| *কর্মশিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান — ১০ | *কর্মশিক্ষা বা অন্যান্য — ১০ | ভূগোল — ১০ | জীবনবিজ্ঞান — ১০ |
| | | সংস্কৃত — ১০ | ভৌতবিজ্ঞান — ১০ |
| | | *কর্মশিক্ষা — ১০ | *অতিরিক্ত — ১০ |

কর্মশিক্ষা, কম্পিউটার প্রভৃতি বিষয়গুলির পরীক্ষা প্রতি মাসে যে কোনো একটি কার্যদিবসে শ্রেণিকক্ষেই গৃহীত হবে।

৪। বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ কক্ষের জন্য একজন বা দু'জন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকবেন। তাঁরাই পরীক্ষা গ্রহণ-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম করবেন।

৫। অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় যে পদ্ধতিতে একটি বেঞ্চে বিভিন্ন শ্রেণির পরীক্ষার্থীর আসন বণ্টন করে পরীক্ষা গৃহীত হয় সেভাবেই প্রতিটি কক্ষে আসন বণ্টন করা হবে।

৬। প্রতিটি পরীক্ষা গ্রহণ কক্ষের প্রতিটি পরীক্ষার্থীর বেঞ্চভিত্তিক একটি তালিকা স্থায়ীভাবে সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্বে থাকবে। পরের মাসে পরীক্ষা শুরুর আগে প্রতিটি কক্ষের জন্য নির্দিষ্ট তালিকার প্রতিলিপি টাঙিয়ে দিলে পরীক্ষার্থীরা সেইমতো বসবে। পরীক্ষা শুরুর ঠিক আগে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা তা মিলিয়ে দেখে নেবেন।

৭। এক এক মাসে এক একটি কক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা পরের মাসে অন্য কক্ষের দায়িত্বে যাবেন।

৮। পুরো পরীক্ষা ব্যবস্থাটি পরিচালনার জন্য 'অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের' সদস্যবৃন্দ মূল দায়িত্বে থাকবেন।

৯। এক-একটি বিষয়ের জন্য এক-একটি পৃথক প্রশ্নপত্র থাকবে। পরীক্ষার্থীদের হাতে একসঙ্গো সবকটি প্রশ্নপত্রই তুলে দেওয়া হবে। তিন ঘন্টা সময়ের মধ্যে যখন যার যেটি খুশি উত্তর লিখবে। প্রশ্নপত্রেই উত্তর লিখতে হবে।

১০। পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্রগুলি সংগ্রহ করে বিষয়ভিত্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক পৃথক করে নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে দেওয়া হবে। তাঁরা ওই উত্তরপত্রগুলি দেখে পনেরো দিনের মধ্যে ফলপ্রকাশ করবেন, প্রগতিপত্রে নম্বর তুলবেন এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণিভিত্তিক পরীক্ষার ফলাফলের খাতায় তা লিপিবদ্ধ করে দেবেন।

১১। উত্তরপত্রগুলি শিক্ষার্থীরা দেখেই সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে জমা দেবে।

১২। যে মাসে যতটুকু পড়া হবে তার ওপর ভিত্তি করেই প্রশ্নপত্র রচিত হবে। প্রশ্নপত্রগুলি ডি.টি.পি. করিয়ে নিয়ে প্রয়োজনমতো জেরক্স করিয়ে নিলে খরচ খুব কম পড়বে। খরচ খরচার বিষয়ে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

১৩। প্রতি তিন মাস অন্তর শ্রেণিভিত্তিক অভিভাবক সভা ডেকে পরীক্ষার ফলাফল অভিভাবকদের কাছে পেশ করতে হবে।

১৪। পঞ্চম শ্রেণিতে 'কর্মশিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান' এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে প্রতি মাসে যে কোনো একটি ক্লাসে পরীক্ষা নিয়ে নেওয়া হবে। উক্ত বিষয়ে নিম্নলিখিতভাবে নম্বর বণ্টন করা যেতে পারে। ক) নিয়মিত উপস্থিতি — ২০, (খ) পাঠ্যপুস্তকের যত্ন — ২০, (গ) ভালো ব্যবহার — ২০, (ঘ) ইউনিফর্ম — ২০, (ঙ) খেলাধুলা — ১০, (চ) সাংস্কৃতিক চর্চা — ১০।

১৫। শিক্ষাবর্ষ শেষে অর্থাৎ ১০টি পরীক্ষা গ্রহণ শেষ হলে ১০টি পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর যোগ করে মোট যে যোগফল হবে তার ভিত্তিতে পরবর্তী শ্রেণিকক্ষে তার স্থান নির্ধারিত হবে।

১৬। রচনাধর্মী প্রশ্নগুলি বিশেষ করে প্রবন্ধ রচনা বছরের শেষের দিকের মাসের পরীক্ষায় দিলে সুফল মিলবে।

১৭। বিদ্যালয়ে যেমন প্রতিটি পরীক্ষার নম্বর নথিভুক্ত থাকবে ঠিক তেমনি প্রগতিপত্রে প্রতিটি পরীক্ষার নম্বর নথিভুক্ত হবে।

১৮। পরীক্ষা-সংক্রান্ত কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করার জন্য শ্রেণি শিক্ষকের নেতৃত্বে আরও একজন বা দুজন করে সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকবেন।

১৯। একটি সার্থক 'প্রগতি পত্র' তৈরি করে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর প্রাপ্ত নম্বর নথিভুক্ত করতে হবে।

এতদিনের প্রচলিত অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষাগুলি তুলে দিয়ে অবিরত মূল্যায়ন পদ্ধতির মতো লিখিত পরীক্ষা প্রতি মাসে চালু করতে গেলে প্রথমে অনেক বাধাবিপত্তি ঘরে বাইরে সব ক্ষেত্রেই আসবে। কেননা, এই পরীক্ষাগুলো উৎসবের মতো হয়ে গেছে। মাসিক পরীক্ষাগুলির উপকারিতা এবং গুরুত্ব যে কত বেশি তা না বোধগম্য হওয়া পর্যন্ত বাধা আসতেই থাকবে। তবে, সেই বাধাকে অতিক্রম করতে বেশি সময় লাগবে না। দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যে সুফল লাভ হয়েছে তা একদিন প্রত্যেকের কাজে লাগবেই লাগবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিকতাই হবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সাফল্যের প্রধান হাতিয়ার। সেদিকে আমরা অনেকটাই এগিয়ে আছি।

# বিষ্ণুপুর মহকুমায় শিক্ষার সার্বিক সাফল্যে বিদ্যালয়গুচ্ছ ও বিদ্যালয় পরিদর্শনের প্রভাব

(২৩-০৬-২০০৫ তারিখে এস.সি.ই.আর.টি আয়োজিত কর্মশালায় আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে পেশ করা আলোচনার লিখিত রূপ)

বিদ্যালয় শিক্ষাকে প্রতিটি শিশুর কাছে পৌঁছে দেওয়ার কর্মকাণ্ডে সামিল হওয়ার অভিপ্রায়ে বিষ্ণুপুর মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক পদে ১৯৯৮ সালের ২৪ নভেম্বর যোগদান করার স্বল্প কিছুদিনের মধ্যেই ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু হয়েছে এই প্রতিবেদকের উদ্যোগে বিষ্ণুপুর মহকুমায় শিক্ষা ও পরিদর্শন বিষয়ক গবেষণার কাজ। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার ১২৪টি মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ের প্রায় দেড় লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর জন্য 'কিছু একটা করার' দায়িত্বভার এই প্রতিবেদকের ওপর স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাবিভাগ থেকে অর্পিত হয়েছে, উপলব্ধি করে যে শিক্ষা ও পরিদর্শন গবেষণার সূত্রপাত আজ তা প্রকৃত অর্থেই সফল — এ দাবি অবশ্যই করা যেতে পারে।

১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পরপর ছ'বছর (অর্থাৎ একটি ছ'বছরের মাধ্যমিক শিক্ষাচক্রে) তাদের অগ্রগতির ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা চালিয়ে কেবলমাত্র পরিদর্শনের জন্য ৩২৩টি দিন খরচ করে যেভাবে সাফল্যলাভ করা সম্ভব হয়েছে তা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ হাতিয়ার হবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস।

এই গবেষণার কাজে আরও বেশি মানুষকে যুক্ত করার অভিপ্রায়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগের তৎকালীন উপবিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা মাননীয় পূর্ণানন্দ প্রধান মহাশয় ও বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের মহকুমাস্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে ২০০০ সালের ৮ জানুয়ারি আহূত সভায় বিষ্ণুপুর মহকুমায় বিদ্যালয়গুচ্ছ গঠন করা হয়। বিষ্ণুপুর মহকুমার ৬টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ২টি পুরসভা এলাকায় অবস্থিত মোট ১২৪টি বিদ্যালয়কে অবস্থানগত কারণে ১০টি আঞ্চলিক বিদ্যালয়গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পদাধিকার বলে এই প্রতিবেদককে মহকুমা বিদ্যালয় গুচ্ছের সভাপতি এবং আঞ্চলিক বিদ্যালয় গুচ্ছগুলির কর্মকর্তাদের যৌথসভায় বিষ্ণুপুর কৃত্তিবাস মুখার্জি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা বিষ্ণুপুর শহর বিদ্যালয়গুচ্ছের যুগ্ম সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ পাত্রকে মহকুমা বিদ্যালয় গুচ্ছের সম্পাদক নির্বাচন করা হয়।

২০০৩ সালে বিষ্ণুপুর মহকুমা বিদ্যালয় গুচ্ছের মুখপত্র 'সূর্যোদয়'-এ বিভিন্ন কর্মসূচির সফল রূপায়ণের মাধ্যমে শিক্ষায় বিষ্ণুপুর মহকুমাকে রাজ্যের প্রথম স্থানে উন্নীতকরণের যে কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, পরপর ৬ বছরের প্রচেষ্টায় আজ তা সফল।

এই কর্মকাণ্ডের সাফল্যলাভের মূল উৎসগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক) বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠন

খ) নিয়মিত নিজ উদ্ভাবিত শিক্ষাবিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে বিদ্যালয় পরিদর্শন।

**এই দুটি পর্বেই যে বিষয়গুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তা হল ঃ**

১) পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করা।

২) প্রতিটি শিক্ষার্থীর গুণগত মান কীরকম তা নিরূপণ করে তাদের ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও ঘাটতি পূরণ করা।

৩) পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া প্রতিটি শিশুকে নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে আনা এবং ধরে রাখা।

৪) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত অভিভাবক সভা আহ্বান করে তাদের সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র রচনা করা। মাঝে মাঝে অভিভাবক সভাগুলিতে বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রত্যেককে উৎসাহ প্রদান।

৫) যতদূর সম্ভব শিক্ষার্থীদের মায়েদেরকে বিদ্যালয় শিক্ষার এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা এবং তাঁদের কাছে তাঁদের ছেলেমেয়েদের পঠন-পাঠনের প্রকৃত চিত্র নিয়মিতভাবে তুলে ধরা।

৬) নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রত্যেককে তৎপর রাখা। সাফল্যের অন্যতম কারণ হিসেবে বলা যায় ৬ বছরে বিষ্ণুপুর মহকুমার ১২৪টি বিদ্যালয়ের প্রতেকটিই তিনবার করে শিক্ষাবিজ্ঞানভিত্তিকভাবে পরিদর্শন করে শিক্ষার্থীদের উৎসাহদানের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

৭) আঞ্চলিক বিদ্যালয় গুচ্ছগুলিকে তৎপর রেখে প্রতি দু'মাস অন্তর সভা ডেকে প্রতিটি বিদ্যালয়ের অগ্রগতির পর্যালোচনা করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮) বিদ্যালয় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে এবং প্রাইভেট টিউশনকে কোনোমতেই বিদ্যালয়ের বিকল্প না করে প্রয়োজন হলে বিদ্যালয় শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পরামর্শ দান।

৯) খেলাধুলার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক প্রতিভার উন্মেষ ঘটিয়ে তাদের নিজ নিজ দক্ষতার বিষয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

১০) প্রতিটি পরীক্ষার পর শ্রেণিকক্ষে প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক ফল ব্লাকবোর্ডে বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত অবস্থা প্রত্যেকের কাছে তুলে ধরা।

১১) কোনো শিক্ষার্থীকে কোনোভাবে নিরুৎসাহিত বা হতাশ না করে কেবলমাত্র উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

১২) প্রতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত এবং ৭০০ বা তার বেশি নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মহকুমার পর্যায়ে সংবর্ধনা দিয়ে এবং সে খবর প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণির শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দিয়ে উৎসাহ প্রদান।

১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে যে সকল শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল তারাই ২০০৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। এদের ফলাফল বিশ্লেষণ করলেই আমরা যে কতটা সার্থক হতে পেরেছি তা প্রমাণিত হবে ঃ —

**বিষ্ণুপুর মহকুমার ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাচক্রের শিক্ষাচিত্র**

১। ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল — ১২,১৮০ জন।

২। পরপর ৬টি শিক্ষাবর্ষে অকৃতকার্যতার কারণে এখনও বিভিন্ন শ্রেণিতে পাঠরত — ৪,৭১৫ জন।

৩। বিদ্যালয় ছুট হয়েছিল, কিন্তু তাদের প্রত্যেককেই পুনরায় কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে — ৫০৯ জন।

৪। ২০০৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল — ৬,৯৫৬ জন।

**মাধ্যমিক - ২০০৫ এর ফলাফল ঃ**

| | | |
|---|---|---|
| প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ | — | ২,০৮৪ জন (এর মধ্যে স্টার ৯২৭জন) |
| দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ | — | ৩,২২২ জন। |
| তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ | — | ১,১৭০ জন। |
| অকৃতকার্য (আংশিক সহ) | — | ৪৮০ জন। |

মহকুমায় পাসের হার — ৯৩.১৮ শতাংশ।

**মহকুমার শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাজ্যে যারা উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করেছে ঃ**

| | | |
|---|---|---|
| রাজ্যে সম্ভাব্য প্রথম | — | অরিন্দম সাঁতরা (প্রাপ্ত নম্বর - ৭৮৫) |
| রাজ্যে সম্ভাব্য দশম | — | অঙ্কুর দাশগুপ্ত (প্রাপ্ত নম্বর - ৭৭৩) |
| রাজ্যে সম্ভাব্য চতুর্দশ | — | আফজল মিদ্যা (প্রাপ্ত নম্বর - ৭৬৬) |
| রাজ্যে সম্ভাব্য ষোড়শ | — | কৌশিক হাজরা (প্রাপ্ত নম্বর - ৭৬৪) |
| রাজ্যে সম্ভাব্য অষ্টাদশ | — | অদ্রীশ ঘোষ (প্রাপ্ত নম্বর - ৭৬২) |

উচ্চমাধ্যমিক - ২০০৫-এ রাজ্যে সম্ভাব্য নবম - অভিরূপ ঘোষ, (প্রাপ্ত নম্বর - ৯৬৪)

এছাড়াও ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় পরপর পাঁচবছর বিষ্ণুপুর মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয় জেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এছাড়া, রাজ্যেও তৃতীয় স্থান অর্জনের কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে।

অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলাতেও বিষ্ণুপুর মহকুমার ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে।

বিষ্ণুপুর মহকুমাসহ বাঁকুড়া জেলার এই অভূতপূর্ব সাফল্যকে দু-একটি সংবাদমাধ্যম শিক্ষাবিভাগকে হেয় প্রতিপন্ন করতে বিকৃত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছে।

তাই, শিক্ষাবিভাগের দায়িত্বশীল আধিকারিক হিসাবে ভ্রান্ত সংবাদের প্রতিবাদ করে প্রকৃত সত্য তুলে ধরা হল।

বিষ্ণুপুর মহকুমায় এই সাফল্যের পিছনে একদিকে যেমন আছে নিয়মিতভাবে নব উদ্ভাবিত শিক্ষা বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে বিদ্যালয় পরিদর্শন ও বিদ্যালয়গুচ্ছের তৎপরতা ও সক্রিয়তা, অপরদিকে আছে নিয়মিতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ফলস্বরূপ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রচেষ্টা ও অভিভাবকদের সদাসতর্ক দৃষ্টি।

বিষ্ণুপুর মহকুমার এই অগ্রগতির প্রভাব বাঁকুড়া জেলার অন্যান্য মহকুমাগুলিকেও প্রভাবিত করেছে। সাফল্যের এই প্রভাব কোনোদিনও যদি অন্যান্য জেলাগুলিকে প্রভাবিত করে তাহলে শ্রম, সময় ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

ঘ. দর্পণ

## শিক্ষা পরিদর্শন ও রূপায়ণ দর্পণ এবং বাস্তবতা

(সংবাদপত্রের পাতায় এবং বিশিষ্ট জনের কথায়)

মানুষের ইচ্ছাশক্তি হল সবচেয়ে বড়ো শক্তি। কোন কিছু ভালো কাজ করার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে গেলে সেই কাজ করাও যাবে এবং সাফল্যলাভও হবে একথা চিরন্তন সত্য। শুধু তাই নয়, এর জন্য অন্যান্যদের সহযোগিতাও পাওয়া যাবে। আবার ব্যতিক্রমও যে নাই তা নয়। তবে, সব কিছুই নির্ভর করছে আত্মবিশ্বাস ও প্রচেষ্টার ওপর। বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে যোগদান করার সময় থেকেই সরকারি আদেশনামাকে পুরোপুরি মান্য করে এবং সঠিকভাবে রূপায়ণ করতে গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে নতুন কিছু করার শপথ গ্রহণ করে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি তাতে একদিকে যেমন আকাঙ্ক্ষিত সাফল্যলাভ করেছি, ঠিক তেমনি পেয়েছি সর্বস্তরের মানুষের অকৃত্রিম সহযোগিতা। বিনিময়ে পেয়েছি অসংখ্য কচিকাঁচা শিক্ষার্থীর হাসিভরা মুখ, যা আমাদের প্রত্যেকেরই কাম্য। যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পরিবেশে সাফল্যলাভ করা সম্ভব হয়েছে তার সমর্থনে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ এবং কিছু প্রত্যক্ষদর্শী ও সহমর্মী মানুষের মতামত তুলে ধরা হল। সেই সঙ্গে তুলে ধরা হল অনেকের ভেতর থেকে মাত্র কয়েকজন কৃতী ছাত্রছাত্রীর চিত্র যারা এই মুহূর্তে প্রাসঙ্গিক ভাবেই সফল হওয়ার উজ্জ্বলতম উদাহরণ।

## জাঙ্গিপাড়ায় রবীন্দ্রজয়ন্তী

যুগান্তর ১৫ জুন ১৯৮৫, শনিবার ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২

জাঙ্গিপাড়া ও জাঙ্গিপাড়া পশ্চিমচক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্তের উদ্যোগে এবং সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের সহায়তায় দশ দিনব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয়। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আবৃত্তি, গান, নাটক, নৃত্য ও রবীন্দ্রজীবনী আলোচনার এক প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের প্রথম স্থানাধিকারীদের নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। নটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটিতে একদিন করে চলে নয়দিন অনুষ্ঠান। কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়।

# জাঙ্গিপাড়ায় বাইশে শ্রাবণ উদযাপন ও বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

চিন্তা ও চেতনা (হুগলি জিলা পরিষদের পাক্ষিক মুখপাত্র)
রেজিস্ট্রেশন নং....৪২০০১/৮১
২য় বর্ষ-৬৫তম সংখ্যা-১৬ই আগস্ট ১৯৮৫ (বাং ৩১ শে শ্রাবণ ১৩৯২)
সম্পাদক মণ্ডলির সভাপতি-শ্রী শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
সভাধিপতি, হুগলি জিলা পরিষদ, সম্পাদক -শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

জাঙ্গিপাড়া ও জাঙ্গিপাড়া পশ্চিম চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী আশিসবরণ সামন্তের উদ্যোগে ও সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় রবীন্দ্র রচনা অবলম্বনে প্রতিযোগিতা মূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্যায় ২২ শে শ্রাবণ রবীন্দ্র তিরোভাব দিবসে ভাবগম্ভীর পরিবেশে সকাল ছটায় জাঙ্গিপাড়া দ্বারকানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং দুপুর ২ টায় আঁটপুর দাসবাড়ি সংলগ্ন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে দুটি চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত বিভিন্ন বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী কৃতী ছাত্রছাত্রীগণ রবীন্দ্র সংগীত, রবীন্দ্রনৃত্য, কবিতা, নাটক ও বক্তব্যের মাধ্যমে কবি প্রণাম জানায়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান জেলার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) মাননীয় শ্রী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে দীর্ঘ ভাষণ দেন এবং এরূপ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করে আগামী দিনে জাঙ্গিপাড়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবহেলিত ছাত্রছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ এবং প্রাথমিক শিক্ষার যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার জন্য পশ্চিমবাংলার সমস্ত চক্রে এরূপ অনুষ্ঠান করার আহ্বান জানান হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অধ্যাপক সলিল ভট্টাচার্য মহাশয়। বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা ও হুগলি জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের সদস্য শ্রী নেপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় এরূপ অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককেই ধন্যবাদ জানান। তাছাড়া, জাঙ্গিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রী প্রণব সরকার মহাশয় এরূপ অনুষ্ঠান যাতে নিয়মিত ভাবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত চক্রে অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাংস্কৃতিক কমিটির পক্ষ থেকে শিক্ষক প্রতিনিধি শ্রী পান্নালাল নাড়ু মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রথমে বিদ্যালয় পরে গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ের অনুষ্ঠানে নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে চক্র ভিত্তিক

অনুষ্ঠান পশ্চিমবাংলার মধ্যে জাঙ্গিপাড়ায় প্রথম হওয়ায় ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক বৃন্দের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ লক্ষ করা যায়।

অনুষ্ঠানের কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে আগামী ১৪ ই নভেম্বর শিশু দিবস উপলক্ষে কামারপুকুরে এক শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করে সেখানেও অনুরূপ অনুষ্ঠান পরিবেশনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের চতুর্থ পর্যায় সমাপ্ত করার কথা সংশ্লিষ্ট অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয় ঘোষণা করেন।

# জাঙ্গিপাড়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

কালান্তর ২২শে আগস্ট ১৯৮৫, বৃহস্পতিবার, ৫ ভাদ্র ১৩৯২ (১৯ বর্ষ ৩০৯ সংখ্যা)

সংবাদদাতা; জাঙ্গিপাড়া (হুগলি), ২১ আগস্ট— জাঙ্গিপাড়া থানার পূর্ব ও পশ্চিম দুটি চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রছাত্রীদের রবীন্দ্রনাটক, সংগীত, কবিতা প্রভৃতি বিষয়ে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিতা গত ২২ শে শ্রাবণ রবীন্দ্র তিরোভাব দিবসে অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি পর্যায়ে অনুষ্ঠানটি হয়।

ঐ দিন সকাল ৬ টায় জাঙ্গিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ও দুপুর ২ টায় আঁটপুর দাসবাড়ি সংলগ্ন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া পূর্ব ও পশ্চিম চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্তের উদ্যোগে এই মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি হয়। একাজে শ্রী সামন্তকে সাহায্য করেন সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রাথমিক সংগঠন ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানগণ।

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়।

সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান জেলার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক নেতা নেপাল মুখোপাধ্যায়।

## জাঙ্গিপাড়ায় ২২ শে শ্রাবণ

বর্তমান বৃহস্পতিবার ২২ আগষ্ট ১৯৮৫, ৬ ভাদ্র ১৩৯২

জাঙ্গিপাড়া ও জাঙ্গিপাড়া পশ্চিমচক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্তর উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় রবীন্দ্ররচনা অবলম্বনে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্যায় ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্র তিরোভাব দিবসে ভাবগম্ভীর পরিবেশে সকাল ৬ টায় জাঙ্গিপাড়া দ্বারকানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং দুপুর ২ টায় আঁটপুর দাসবাড়ি সংলগ্ন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ২ টি চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারী কৃতী ছাত্রছাত্রীগণ রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রনৃত্য, আবৃত্তি, নাটক ও বক্তব্যের মাধ্যমে প্রণাম জানায়।

কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রথমে বিদ্যালয়ভিত্তিক, পরে গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক অনুষ্ঠানে নিবার্চিত ছাত্রছাত্রীদের চক্রভিত্তিক অনুষ্ঠান এতদ অঞ্চলে প্রথম হওয়ায় ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকবৃন্দের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ লক্ষ করা যায়।

অনুষ্ঠানের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আগামী ১৪ নভেম্বর শিশু দিবস উপলক্ষে কামারপুকুরে এক শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করে সেখানেও অনুরূপ অনুষ্ঠান পরিবেশনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের চতুর্থ পর্যায় সমাপ্ত করার কথা সংশ্লিষ্ট অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয় ঘোষণা করেন।

# জাঙ্গিপাড়ায় শিক্ষক সংগঠনের অনুষ্ঠান

গ্রাম শহর অক্টোবর ১৯৮৫ সংখ্যা/ একাদশ বর্ষ

হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া উভয় চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয়ের উদ্যোগে ও শিক্ষক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় রবীন্দ্ররচনা অবলম্বনে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্যায় ২২ শ্রাবণ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী দিবসে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে সকাল ৬ টায় জাঙ্গিপাড়া দ্বারকানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং দুপুর দুটোয় আঁটপুর দাসবাড়ি সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। সকালের অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন বর্ধমান জেলার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষাস্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রী সলিল ভট্টাচার্য মহাশয় এবং বিশেষ অতিথি প্রবীণতম হুগলি জেলার স্কুল বোর্ড (প্রাথমিক) সদস্য ও শিক্ষক নেতা শ্রী নেপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তাছাড়া দুপুরের সভায় বক্তব্য রাখেন উভয় চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মাননীয় শ্রী আশিসবরণ সামন্ত, জাঙ্গিপাড়া গ্রাম প্রধান মাননীয় শ্রী প্রণব সরকার এবং সাংস্কৃতিক কমিটির পক্ষ থেকেশিক্ষক প্রতিনিধি শ্রী পান্নালাল নাড়ু। অনুষ্ঠানে উভয়চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারী কৃতী ছাত্রছাত্রীগণ গান, নাচ, কবিতা, নাটক ও বক্তব্যের মাধ্যমে কবিপ্রণাম জানায়।

প্রথমে বিদ্যালয় ভিত্তিক, পরে গ্রাম পঞ্চায়েত ও চক্রভিত্তিক অনুষ্ঠান এতদঞ্চলে প্রথম হওয়ায় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকবৃন্দের মধ্যে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়।

# রণজিৎকুমার অধিকারী

## শংসাপত্র

(৩ ডিসেম্বর' ১৯৮৫)

জাঙ্গিপাড়া ও জাঙ্গিপাড়া পশ্চিমচক্রের অন্তর্গত প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণসূচির মধ্য দিয়ে একযোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী, শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন ও ভূপাল দিবসের তাৎপর্যকে অবলম্বন করে পুণ্যভূমি কামারপুকুরে ৩/১২/৮৫ তারিখে যে অনুষ্ঠান হয়ে গেল তাতে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

চমৎকার এই অনুষ্ঠানটি যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি আড়ম্বরপূর্ণ। এরূপ অনুষ্ঠান প্রতিবছরই হোক এবং প্রতি চক্রে চালু করা হোক এটাই মনেপ্রাণে চাইছি।

এর জন্য ধন্যবাদার্হ হলেন ঐ চক্রের শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ এবং বিশেষ করে চক্রদ্বয়ের বর্তমান অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী আশিসবরণ সামন্ত মহাশয়, যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে।

শ্রী রণজিৎ কুমার অধিকারী<br>
৩/১২/৮৫<br>
সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক<br>
জেলা বিদ্যালয় পর্ষদ<br>
হুগলি

RAMKRISHNA MISSION SCHOOL
KAMARPUKUR · Hoogly
Phone : Kamarpukur 54
Pin : 712 612

Ref No................ Date : 3/12/85

ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি
নন্দনের এনেছে সংবাদ
ইহাদের কর আশীর্বাদ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রিয় ভাইবোনেরা,

পুণ্যধাম কামারপুকুরে শিক্ষামূলক ভ্রমণে এসে বর্ষব্যাপী রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে গত ৩/১২/৮৫ তারিখে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিনে তোমরা কচিকাঁচারা যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি করলে, তা দেখে খু-উ-ব ভালো লাগল। নাচ, গান, আবৃত্তির নৈবেদ্য দিয়ে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তোমরা পূজা করলে বিরাটের। তোমাদের ভজন, পূজন, আরাধনা, আত্মপ্রকাশের পথে এগিয়ে দিক।

শ্রী রামকৃষ্ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—
"তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ দেখা দিল এ জগতে।"

শ্রী রামকৃষ্ণ, মা সারদামণি, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এঁরা কেবল ভারত সংস্কৃতি নয়, মানব সংস্কৃতির জীবন্ত বিগ্রহ। এঁদের বন্দনাই তো ঘটাবে আলোকিত চেতনার বলয়ে উত্তরণ।

জাঙ্গিপাড়া ও জাঙ্গিপাড়া পশ্চিমচক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী আশিসববণ সামন্তের উদ্যোগ ও উদ্যম প্রশংসনীয়। এমন একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে আমি আনন্দিত।

শ্রী শ্রীঠাকুরের শ্রী পাদপদ্মে প্রার্থনা-এই সমস্ত নিষ্কলঙ্ক কোরক স্বমহিমায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠুক।।

স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দ

# কামারপুকুরে ছাত্র জমায়েত

আজকাল ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৫

হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া ও জাঙ্গিপাড়া পশ্চিমচক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্তের উদ্যোগে এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের সহায়তায় প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে ৩ ডিসেম্বর তারিখে কামারপুকুর শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ সংলগ্ন প্রাঙ্গাণে অগ্নিশিশু শহিদ ক্ষুদিরামের জন্মদিন ও ভূপাল দিবস একযোগে পালিত হয়।

# কামারপুকুরে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন ও ভূপাল দিবস পালন

চিন্তাও চেতনা (হুগলি জিলা পরিষদের পাক্ষিক মুখপত্র)
রেজিস্ট্রেশন নং-R.No.42001/81
মূল্য -৩০পঃ ৭৩-৭৪ তম সংখ্যা-১৬ই ডিসেম্বর' ৮৫-১ লা জানুয়ারি ১৯৮৬
(বাং ১৬ই পৌষ ১৩৯২)
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি-শ্রী শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাধিপতি, হুগলি জিলা পরিষদ
সম্পাদক-শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া ও জাঙ্গিপাড়া পশ্চিমচক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী আশিসবরণ সামন্তের উদ্যোগে এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের সহায়তায় প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে ৩ রা ডিসেম্বর তারিখে কামারপুকুর শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে অগ্নিশিশু শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন ও ভূপাল দিবস একযোগে পালিত হয়।

রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বর্ষব্যাপী প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিদ্যালয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও চক্র এই তিনটি স্তরের যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরু ২৫ শে বৈশাখ হয়েছিল ২২ শে শ্রাবণ উদ্‌যাপনের পর এটিই ছিল তার চূড়ান্ত পর্যায়। বিভিন্ন স্তরের প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রী রবীন্দ্রকবিতা, নৃত্য, সংগীত, নাটকে, অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া ভূপাল দিবস, ক্ষুদিরাম বসু, শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রী শ্রীমাসারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় "এক জাতি এক প্রাণ" এই বিষয়ে আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতিত্ব করেন হুগলি জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী রনজিৎকুমার অধিকারী মহাশয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শ্রী মণীন্দ্রনাথ জানা মহাশয়। কামারপুকুর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অনুষ্ঠান পরিচালনায় বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন।

# কামারপুকুরে ক্ষুদিরামের জন্মদিন পালিত

**বর্তমান ১৬ জানুয়ারি ১৯৮৬, বৃহস্পতিবার, ২ মাঘ ১৩৯২**

কামারপুকুরে শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে অগ্নিশিশু শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন ও ভূপাল দিবস একযোগে পালিত হয়। হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া ও জাঙ্গিপাড়া পশ্চিমচক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্ত-এর উদ্যোগেই প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীরা এই মনোজ্ঞ অং. গানে অংশ নেয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন কামারপুকুর শ্রী রামকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দ। সভাপতিত্ব করেন রণজিৎ কুমার অধিকারী। প্রধান অতিথি ছিলেন মণীন্দ্রনাথ জানা।

## জাঙ্গিপাড়ায় কবিপ্রণাম

মহাজন্মের লগ্ন ১৯ আষাঢ়, শুক্রবার ১৩৯৩/৪ জুলাই ১৯৮৬ (বিংশ বর্ষ - ২৭ সংখ্যা)

জাঙ্গিপাড়া পঃ চক্র প্রাঃ বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫ তম জন্ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কবিতা, নৃত্য, সঙ্গীত, নাটিকা ও বক্তব্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কবিপ্রণাম জানায়।

জাঙ্গিপাড়া পঃ চক্রের প্রাক্তন এবং আরামবাগ মহকুমার মাধ্যমিক বিভাগের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্তের পরিকল্পনায় নটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য পৃথকভাবে একদিন করে এরূপ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক মহলে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে।

## জাঙ্গিপাড়ায় কবিপ্রণাম

পল্লিশ্রী বার্তা ৪র্থ বর্ষ, সংখ্যা-১২/১৫ জুলাই, শুক্রবার ১৯৮৬

জাঙ্গিপাড়া ও জাঙ্গিপাড়া পশ্চিমচক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫ তম জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীত, নাটিকা ও বক্তব্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কবিপ্রণাম জানায়।

জাঙ্গিপাড়া ও জাঙ্গিপাড়া পশ্চিমচক্রের প্রাক্তন ও আরামবাগ মহকুমার মাধ্যমিক বিভাগের বর্তমান অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিবরণ সামন্তের পরিকল্পনায় ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য পৃথকভাবে একদিন করে এরূপ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক মহলে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

# কামারপুকুরে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন ও ভূপাল দিবস পালন

শিক্ষক (৩৯ শ বর্ষ) জুলাই ১৯৮৬ (৭ম সংখ্যা)

হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া ও জাঙ্গিপাড়া পশ্চিমচক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী আশিসবরণ সামন্তের উদ্যোগে এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের সহায়তায় প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে ৩রা ডিসেম্বর তারিখে কামারপুকুরে শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে অগ্নিশিশু শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিনও ভূপাল দিবস একযোগে পালিত হয়।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বর্ষব্যাপী প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিদ্যালয়, গ্রাম-পঞ্চায়েত ও চক্র এই তিনটি স্তরের যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরু ২৫শে বৈশাখ হয়েছিল ২২ শে শ্রাবণ উদ্‌যাপনের পর এটিই ছিল তার চূড়ান্ত পর্যায়। বিভিন্ন স্তরের প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রী রবীন্দ্র কবিতা, রবীন্দ্র নাটক, রবীন্দ্র সংগীত, ভূপাল দিবস সম্বন্ধে আলোচনা এবং ক্ষুদিরাম বসু, রামকৃষ্ণদেব, সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় "একজাতি একপ্রাণ" এই বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন কামারপুকুর শ্রী রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দ। সভাপতিত্ব করেন হুগলি জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী রণজিৎ কুমার অধিকারী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের সদস্য ও বিধায়ক শ্রী মণীন্দ্রনাথ জানা।

কামারপুকুর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ অনুষ্ঠান পরিচালনায় বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এরূপ অনুষ্ঠান পালন করার জন্য উদ্‌যোগীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি

## বিষ্ণুপুরে কর্মযজ্ঞ ঃ সুবোধ চক্রবর্তী

(আরামবাগ পত্রিকা ১৯-১-২০০১)

আনন্দবর্ধন সাহানা ঃ বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগে যেভাবে পরিদর্শন চলছে তার খতিয়ান দিয়ে ১৪ জানুয়ারি এক সাক্ষাৎকারে জানালেন পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুবোধ চক্রবর্তী। মহকুমার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্ত-এর নেতৃত্বে তিনজন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ধ্রুবনারায়ণ বাগদি, বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও তরুণকুমার নন্দী অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে মহকুমার ২৮ টি নিম্ন মাধ্যমিক, ৫৭ টি মাধ্যমিক এবং ৩৩ টি উচ্চ মাধ্যমিক মোট ১১৮ টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পরিদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপশিক্ষা অধিকর্তা (প্রসাসন) পূর্ণানন্দ প্রধানের উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রী চক্রবর্তী জানালেন— 'ওরা প্রত্যেকটি বিদ্যালয়েই প্রার্থনাসভায় উপস্থিত থেকেছেন, প্রতিটি শ্রেণি পরিদর্শন করেছেন, শিক্ষার্থীদের সুবিধে-অসুবিধের কথা শুনেছেন, বাড়ির কাজ করেও কীভাবে ভোরবেলা উঠে পড়াশোনা করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তার পরামর্শ দিয়ে চলেছেন, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং প্রতিটি বিদ্যালয়েই পরিদর্শনের দিনে পঞ্চম পিরিয়ড থেকে ছুটির পর পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করিয়ে তাতে উপস্থিত থেকে এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে জনমানসে আলোড়ন তুলেছেন। তাছাড়া, মহকুমার ছটি ব্লক ও দুটি পৌরসভায় 'বিদ্যালয় গুচ্ছ' গঠন করে শিক্ষার ঘাটতি পূরণ এবং মানোন্নয়নে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। ওরা প্রায়ই বিভিন্ন বিদ্যালয় গুচ্ছের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে আলোচনা সভারও আয়োজন করেছেন। আরও উল্লেখযোগ্য বিষ্ণুপুর মহকুমার প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের নিজস্ব ইউনিফর্ম ওরা চালু করতে পেরেছেন। সব মিলিয়ে বিষ্ণুপুর মহকুমার মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ রাজ্যে নজির স্থাপন করতে পেরেছে। আমি ওদের বহু সভাতেই উপস্থিত থেকেছি।'

একজন প্রতিবেদক হিসেবে আমি নিজে যা উপলব্ধি করেছি তা হল— সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্ত শিক্ষার্থীদের আরও বেশি করে পঠন-পাঠন সহ বিভিন্ন দিকে মনোযোগী করে তুলতে পরিদর্শন করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিদ্যালয়গুচ্ছের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করার পরামর্শ দিয়ে এবং তা কার্যকর করে ভালো ফল পাচ্ছেন। যেমন—বছরে দুটি পরীক্ষার মধ্যে প্রথমটিতে প্রাপ্ত নম্বরের ৪০ শতাংশ এবং

দ্বিতীয়টিতে প্রাপ্ত নম্বরের ৬০ শতাংশ নিয়ে চূড়ান্ত ফল তৈরি করায় শিক্ষার্থীরা সারা বছরই পড়াশোনাতে সমান গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য পঞ্চম শ্রেণিতে 'কর্মশিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান' শীর্ষক ১০০ নম্বরের একটি বিষয় চালু করে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য-২০, পাঠ্যপুস্তকের প্রতি যত্ন-২০, ভালো ব্যবহার-২০, ইউনিফর্ম-২০, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ -১০ এবং খেলাধুলায় অংশগ্রহণের জন্য-১০ নম্বর দিয়ে ভালো ফল পেয়েছেন। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত কর্মশিক্ষার নম্বরগুলিকে উক্ত বিষয়গুলির ওপর আরও গুরুত্ব সহকারে প্রদানের ব্যবস্থা করেও ভালো ফল পাচ্ছেন। এবিষয়ে বিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি যৌথভাবে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছে। শ্রী সামন্তের কাছে আরও জানা গেল— প্রতিটি শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রতি সপ্তাহে দুটি দিন নির্ধারিত করে শ্রেণিভিত্তিক ১৫ থেকে ২৫ জন করে শিক্ষার্থীর অভিভাবককে চিঠি দিয়ে বিদ্যালয়ে হাজির করিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করিয়েছেন।

সমস্ত বিষয় তুলে ধরে শ্রী চক্রবর্তীর কাছ থেকে জানা গেল—'ওদের এই প্রচেষ্টার বিষয়টি সরকারিভাবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এর সভাপতি ও শিক্ষামন্ত্রীর নজরে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

(এপ্রিল-জুন ২০০১ * শিক্ষা বিদ্যালয় পরিদর্শকও প্রশাসন * পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি * পৃষ্ঠা-২৩ এর সৌজন্যে)

# মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস মহাশয়কে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি হরপ্রসাদ সমাদ্দার মহাশয়ের পত্র (১০-১০-২০০১)

ড. হরপ্রসাদ সমাদ্দার
সভাপতি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
☎ঃ ২২৬-৮৫৯৪/৯৫, ২২৯-৮৫৯৬/৯৭/৯৮
ফ্যাক্সঃ ২২৯৯৬৬০
নংঃ -২৫৯/প্রেস K ০১
তাঃ - ১০।১০।২০০১

মাননীয়
শ্রী কান্তি বিশ্বাস
শিক্ষামন্ত্রী (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা)
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

---

মাননীয় মহাশয়,

আমার কাছে একজন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (যাঁর নাম আশিসবরণ সামন্ত) একটি নিরীক্ষা করেন এবং তাকে কার্যে পরিণত করে একটি প্রতিবেদন আমার কাছে জমা দেন। তার কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে আমি খুব খুশি হয়েছি। তাই এটি আমি আপনার নিকট প্রেরণ করলাম আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে। ইনি নিজের উদ্যোগে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তা প্রশংসনীয় এবং আমি মনে করি এটি অন্যান্য জায়গায়ও করা যায়। যেমন উনি স্কুলগুচ্ছ করে যে বিষয়টির অবতারণা করেছেন তার ফলে স্কুলগুলির যেগুলি ছিল না তা বিদ্যালয়ে করা গেছে। যেমন ইউনিফর্ম ছিল না ইউনিফর্ম হয়েছে, স্কুলে ছাত্ররা আসত না কিন্তু এখন আসছে, উপস্থিতির হার কম ছিল এখন প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ আসছে।

এটি কেবলমাত্র ব্যক্তিনির্ভর না করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়া যায় কী করে এ বিয়য়ে আপনি যদি একটু ভাবেনএবং আমাকে পরামর্শ দেন তাহলে বাধিত হব।

শ্রদ্ধান্তে,
(হরপ্রসাদ সমাদ্দার)
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

<u>অনুলিপি সংযোজিত হল</u>
অবগতির জন্য অনুলিপি প্রদত্ত হল
১. আশিসবরণ সামন্ত (সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক, বিষ্ণুপুর মহকুমা)

# বিষ্ণুপুর ঃ ১১৮ স্কুল ঘুরে উদ্বিগ্ন পরিদর্শক

**গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ে ৯৮ শতাংশই**

আজকাল বর্ষ ২১ সংখ্যা ২১৮ মংগলবার

১৩ কার্তিক ১৪০৮ বঙ্গাব্দ ৩০ অক্টোবর ২০০১

সব্যসাচী সরকার ঃ ৯৮ শতাংশই পড়ুয়াই প্রাইভেট টিউশন নেয়। পঞ্চম শ্রেণিতে যে সমস্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হয়, শেষ পর্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষায় তারা আদৌ বসে না। ১৯৯৪-৯৫ থেকে ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাচক্রে শুধুমাত্র বিষ্ণুপুর মহকুমারই ৭৫১০জন শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেনি। রাজ্যের ক্ষেত্রে এই চিত্রটি আরও উদ্বেগজনক। সম্প্রতি একটি মহকুমার মোট ১১৮টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করে, মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি-সদিচ্ছা ও বহু অর্থ ব্যয় হলেও 'প্রকৃত শিক্ষার সুফল' যে আদৌ ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছয় না - বিষ্ণুপুর মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্ত গবেষণা করে তা জানিয়েছেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি হরপ্রসাদ সমাদ্দার তাঁর এই গবেষণার সম্পূর্ণ তথ্য বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমা আশিসবরণ সামন্তর কর্মক্ষেত্র হওয়ায় এই মহকুমার ২৮ টি নিম্ন-মাধ্যমিক, ৫৭ টি মাধ্যমিক, ৩৩ টি উচ্চ মাধ্যমিক, প্রত্যেকটি স্কুল তিনি একাধিকবার পরিদর্শন করেছেন। সমস্যা চিহ্নিত করে পরীক্ষামূলকভাবে তা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার পর দেখা গেল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া গেছে। ওই ১১৮ টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফল খারাপের কারণ হিসেবে তারা নিজেরাই জানিয়েছে-১) বাড়িতে কাজের চাপ, ২) অনেকেরই অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ, ৩) প্রাইভেট টিউশন ঠিকমতো পাওয়া যায়নি, ৪) কোনও কোনও ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে পড়াশোনা হচ্ছে না বলেও ব্যকিতগতভাবে জানিয়েছে। সমীক্ষায় আশিসবাবু জানতে পেরেছেন শতকরা ৯৮ জন শিক্ষার্থীই 'প্রাইভেট টিউশন' পড়ে। ওই সমীক্ষায় বিষ্ণুপুর মহকুমার শিক্ষার্থীরা বলেছে, টিউশনে পড়াটা নিছক 'ফ্যামিলি স্ট্যাটাস' দেখানোর জন্যই। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে প্রাইভেট টিউশন যারা পায়নি, শেষ পর্যন্ত মাধ্যমিকে তারা বসেনি। যদিও যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকারা আছেন। সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে ৫ম শ্রেণিতে ১০,৯৮৯ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। ২০০১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে ৫৯৬৫ জন। অর্থাৎ অধিকাংশ পড়া ছেড়ে দিয়েছে। এই অবস্থা কাটাতে বিষ্ণুপুর মহকুমায় ৬ টি থানায় ৬ টি ব্লক এবং ২ টি পুরসভা আছে। ৬টি ব্লকে ৬টি এবং ২ টি পুরসভায় ২ টি - মোট ৮টি বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠন করা হয়েছে। এক-একটি বিদ্যালয় গুচ্ছের নিজস্ব পরিকাঠামোতেই প্রশ্নপত্র তৈরি করে, সেই প্রশ্নে সমস্ত বিদ্যালয়ে অর্ধবার্ষিক এবং বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

একটি শিক্ষাবর্ষে ২০০ টি শিক্ষাদিবসকে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করার জন্য রাখার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ৪ জানুয়ারি থেকে ২২ ডিসেম্বর ২০০০ সময় পর্যন্ত আশিসবাবু ১১৮ টি স্কুলে ওই সমীক্ষা চালান। সমীক্ষার পর বিষ্ণুপুর মহকুমায় মোট ৮টি বিদ্যালয় গুচ্ছ গঠন করা হয়েছে। সেগুলি হল (১) বিষ্ণুপুর মহকুমা বিদ্যালয় গুচ্ছ, (২) বিষ্ণুপুর ব্লক উত্তর বিদ্যালয় গুচ্ছ, (৩) বিষ্ণুপুর ব্লক দক্ষিণ বিদ্যালয় গুচ্ছ, (৪) সোনামুখী পুরসভা বিদ্যালয় গুচ্ছ, (৫) সোনামুখী ব্লক বিদ্যালয় গুচ্ছ, (৬) জয়পুর ব্লক বিদ্যালয় গুচ্ছ, (৭) কোতুলপুর ব্লক বিদ্যালয় গুচ্ছ ও (৮) পাত্রসায়র ব্লক বিদ্যালয় গুচ্ছ। পুরো সমীক্ষা ও পরবর্তী ফলাফল জানিয়ে, রাজ্যের সর্বত্র আশিসবাবুর সমীক্ষার পথে সমস্ত বিদ্যালয়ে সমীক্ষা করানো যায় কি না, সে বিষয়ে বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পরামর্শ চেয়েছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি। একক প্রচেষ্টায় শিক্ষার মান বাড়ানোর এই প্রচেষ্টা অভাবনীয়।

# শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি

আরামবাগ পত্রিকা ৫২ বর্ষ

● ৮১ সংখ্যা ● মঙ্গলবার ১২ কার্তিক ১৪০৮ ● ৩০ অক্টোবর ২০০১ ●

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ২২ অক্টোবর তারিখের প্রেস কনফারেন্সে সভাপতি হরপ্রসাদ সমাদ্দারের আহ্বানে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর মহকুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্ত। পর্ষদ সভাপতি সাংবাদিকদের কাছে শ্রী সামন্তের পরিচয় দিয়ে বলেন—বর্তমান পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেও কীভাবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে আরও ফলপ্রসূ করা যায় সে বিষয়ে নিজ কর্মক্ষেত্রের ১১৮ টি বিদ্যালয়ে গবেষণা চালিয়ে এবং সুফল পেয়ে তার প্রস্তাব মধ্যশিক্ষা পর্ষদে জমা দিয়েছেন। তিনি প্রস্তাবের অনুলিপি সাংবাদিকদের হাতে তুলে দেন এবং পর্ষদের সমস্ত সদস্যের হাতেও দেবার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষামন্ত্রীকে এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য অনুরোধ করে ১০ অক্টোবর যে পত্র দিয়েছেন তার অনুলিপিও সাংবাদিকদের হাতে তুলে দিয়ে বলেন—এ ধরনের কর্মঠ এবং উদ্যোগী পরিদর্শক গুটি কয়েক থাকলে শিক্ষার আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে। তিনি শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস কে লিখেছেন—'শ্রী সামন্তের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে আমি খুব খুশি হয়েছি। উনি স্কুল গুচ্ছ করে যে বিষয়টির অবতারণা করেছেন তার ফলে স্কুলগুলির যেগুলি ছিল না তা বিদ্যালয়ে করা গেছে—এটি কেবলমাত্র ব্যক্তিনির্ভর না করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়া যায় কী করে এ বিষয়ে আপনি যদি একটু ভাবেন এবং আমাকে পরামর্শ দেন তাহলে বাধিত হব।'

## পরিদর্শককে প্রশ্ন

আরামবাগ পত্রিকা ২ ফাল্গুন ১৪০৮ • শুক্রবার • ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০২

বিদ্যালয় পরিদর্শন তথা বিভাগীয় কাজ কর্মে বিষ্ণুপুর মহকুমা রাজ্যের নজর কেড়েছে। যেখানে বিদ্যালয় পরিদর্শন হচ্ছে না বলে সারারাজ্যে চিৎকার শুরু হয়েছে সেখানে বিষ্ণুপুর মহকুমা একাই একশো। পরিদর্শনকে যেখানে খবরদারি বলে অপব্যাখ্যা করা হয়, শিক্ষক ও পরিদর্শকদের যেখানে চোর-পুলিশ পর্যায়ে ফেলা হয় সেখানে পরিদর্শক সমাজ যে শিক্ষক কুলের আপনজন, শিক্ষার্থীদের প্রাণের মানুষ, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির নিকটতম বন্ধু এবং অভিভাবকদের মনের বল তা বিষ্ণুপুর মহকুমায় না এলে স্পষ্ট হবে না। মহকুমার যে কোনো একটি বিদ্যালয়ে যে কেউ গিয়ে যদি খোঁজ খবর নেন তাহলে একই উত্তরের প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। বিদ্যালয় পরিদর্শকরা প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের প্রার্থনা সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন, শ্রেণি পঠন-পাঠন চলাকালীন শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দের পাঠদান প্রক্রিয়া লক্ষ করেছেন, শিক্ষার্থীদের সুবিধে অসুবিধের কথা শুনেছেন, তাদের বিগত পরীক্ষার ফল পর্যালোচনা করে কীভাবে আরও ভালো করা যায় তার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রাইভেট টিউশন পড়েই তারা গতবার পরীক্ষা দিয়েছিল তার ফলও যে কত খারাপ হয়েছে তা তুলে ধরে কীভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের কাছে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষেই সমস্ত পাঠ আয়ত্ত করা যায় তার পথ নির্দেশ করেছেন। টিফিনের বিরতির সময় শিক্ষক-শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মী ও পরিচালন সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে বর্তমান পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেও কীভাবে আরও ভালো করা যায় তার পরামর্শ দিয়ে চলেছেন। পরিদর্শনের দিনে পঞ্চম পিরিয়ড থেকে ছুটির সময় পর্যন্ত প্রতিটি বিদ্যালয়েই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করিয়ে কীভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করানো যায় তার অভিনব পন্থাও প্রদর্শন করে সহ পাঠক্রমিক দিকটিকে উজ্জ্বল করেছেন। বিদ্যালয়ে শেখানোর সুযোগ না থাকলেও কীভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে সংগীত, আবৃত্তি, নাটক, ছবিআঁকা, সুন্দর হাতের লেখা প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী করানো যায় তার পরামর্শ দিয়ে চলেছেন। খেলাধুলাতেও তাঁদের উৎসাহ দান প্রতিটি শিক্ষার্থী আজীবন মনে রাখবে। এখানেই থেমে নেই। কীভাবে শিক্ষার্থীদের সারাবছরব্যাপী পঠন-পাঠনে মগ্ন রাখা যায় তার জন্য বছরে গৃহীত পরীক্ষা দুটির প্রথমটির প্রাপ্ত নম্বরের ৪০ শতাংশ এবং দ্বিতীয়টির প্রাপ্ত নম্বরের ৬০ শতাংশ নিয়ে চূড়ান্ত ফল তৈরি করিয়ে তার সুফল বিদ্যালয়গুলিকে হাতে নাতে দেখিয়ে দিয়েছেন। যাদের বাড়িতে কাজ করতে হয় তাদের ভোরবেলা উঠে পড়া তৈরি করে নেবার ও পরামর্শ দিয়ে চলেছেন। মহকুমার দুটি পৌরসভা এবং ছটি ব্লকে বিদ্যালয়গুচ্ছ গঠন করে তার সুফল কী তাও দেখিয়ে দিয়েছেন। শিক্ষাপ্রসারে সাম্প্রতিককালে কোথাও যদি কোনো বিপ্লব হয়ে থাকে তা বিষ্ণুপুর

মহকুমাতেই। অথচ, কার্যালয়ের কোনো কাজকর্ম পড়ে নেই। কোনো শিক্ষক সংগঠনই ডেপুটেশন দেবার মতো কোনো পয়েন্ট খুঁজে পায়না। শিক্ষাবিভাগের কাছে এ নজির হয়ে থাকবে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের পিছনে যিনি আছেন তিনি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়কারী এবং প্রশাসনিক পদে দীর্ঘদিনের পোড় খাওয়া মানুষ বিষ্ণুপুর মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্ত। তিনি তাঁর কার্যালয়ের তিনজন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ও চারজন কর্মীবন্ধুর সক্রিয় সহযোগিতায় এতদূর আসতে সক্ষম হয়েছেন। সত্যিই সার্থক পরিদর্শন হচ্ছে কি না তা জানার জন্যে একটি দৃশ্যে চোখ রাখলেই স্পষ্ট হবে। বিদ্যালয় পরিদর্শন করে ফেরার পথে যখন চারদিক থেকে ঘিরে ধরে শতশত উৎসুক চোখ মুখ, বলে ওঠে 'স্যার, আমাদের স্কুলে আবার কবে আসবেন?'

সম্প্রতি, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি হরপ্রসাদ সমাদ্দার এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে এবং কাজকর্মের খতিয়ান ও গবেষণার সুফল তুলে ধরে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে পত্র দিয়ে কী ভাবে এই সুপারিশ সারা রাজ্যে কার্যকর করা যায় তার পরামর্শ চেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষ এখন সেই নির্দেশের অপেক্ষায়।

## শিক্ষাবিদ সাধনকুমার পাত্রের দুচার কথা

(বিষ্ণুপুর মহকুমা বিদ্যালয়গুচ্ছ-এর বার্ষিক মুখপত্র 'সূর্যোদয়' ২০০২-২০০৩ এর সৌজন্যে)

আজ ইংরেজি ১৪/১২/১৯৯৯ তারিখে আশিসবরণ সামন্ত সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা), বিষ্ণুপুর মহকুমা মহাশয় তিনজন সহকারী পরিবেষ্টিত হয়ে বিদ্যালয় শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে এই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। ১০টা ৪৫ মিনিটে প্রার্থনা সভায় যোগদান করেন এবং প্রার্থনা সংগীত উপভোগ করেন। প্রার্থনান্তে তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে শ্রেণিভিত্তক উচ্চতা অনুযায়ী উর্দ্ধক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর সুবিধা, স্কুল ড্রেস পরিধানের তাৎপর্য, প্রার্থনা সংগীত সমাপনান্তে মহাপুরুষদের বাণী পাঠের উপকারিতা ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে উচ্চতা অনুযায়ী উর্দ্ধক্রমে দাঁড়ালে ছাত্র-ছাত্রীদের কোন কিছু প্রদর্শিত বস্তু দেখতে ও বক্তব্য শুনতেও সুবিধে হয়। স্কুল ড্রেস পরলে ছাত্র-ছাত্রীদের মন থেকে আভিজাত্যের গরিমা মুছে যায় এবং তারা অন্যান্যদের সাথে একাত্মবোধ করতে পারে। আর মনীষীদের বাণী পাঠ ও শ্রবণ তাদেরকে এমন এক ভাবজগতে পৌঁছে দেয় যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এক কথায় প্রার্থনা সভাতেই তারা তাদের অন্তরে উপলব্ধি করবে সত্য ও সুন্দরের উপস্থিতি এবং তারা বুঝবে যে Cleanliness is next to Godliness. যার ফলে, তারা সারিবদ্ধভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করবে এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়ে শিক্ষকমহাশয়দের পাঠদান আত্মস্থ করতে সক্ষম হবে।

তারপর তিনি সপার্ষদ চতুর্থ পিরিয়ড পর্যন্ত একে একে সমস্ত শ্রেণিকক্ষে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠন চাক্ষুষ করেন। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিদ্যালয়ের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করা, স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি মেনে চলা, সহপাঠীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, পাঠ্যপুস্তকের যত্ন নেওয়ার উপদেশ দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে একমাত্র যত্নশীলরাই রত্নলাভের অধিকারী। চতুর্থ পিরিয়ডের পর ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচালনায় ও অংশগ্রহণে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করেন। ঘোষণা অনুযায়ী দুপুর দুটোয় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধে তিনিই সভাপতিত্ব করেন। তাঁরই নির্দেশে ছাত্র-ছাত্রীরা ঘোষক ও ঘোষিকা হয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। কম বেশি ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী সংগীত পরিবেশন করে ; ২০/২২ জন কবিতা আবৃত্তি করে। আশিসবাবুর নির্দেশনায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে লটারি ভিত্তিক 'তাৎক্ষণিক বক্তব্য' অনুষ্ঠানটি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে সভাপতির ভাষণে এই রকম অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ এবং ছাত্রাবস্থাতেই তারা সুনাগরিকের গুণাবলি অর্জন করবে এবং ছাত্রাবস্থাতেই সমাজসেবী হয়ে

গড়ে ওঠার এটাই সেরা সময়। আর এইরকম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তারা সুবক্তা ও নেতা হিসাবে গড়ে উঠবে। বিশেষ বিশেষ দিনে বিদ্যালয়ে এরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে তিনি উপদেশ দেন। অতঃপর বিকেল ৪টে ৩০ মিনিটে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষকমহাশয়দের নিয়ে একটি ছোটো খাটো অনুষ্ঠান করেন। এতে তিনি শিক্ষক মহাশয়দের আনন্দদায়ক পাঠদানের পক্ষপাতী হতে পরামর্শ দেন এবং পিছিয়ে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাড়তি শ্রম দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক বিকাশ ঘটানোর পরামর্শ দান করেন। তিনি ধৈর্য ধরে শিক্ষক মহাশয়দের সমস্যা তথা বিদ্যালয় পরিচালনার অসুবিধা -যেমন ছাত্রসংখ্যা অনুযায়ী শিক্ষক, করনিক, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী না থাকা, সহকারী প্রধান শিক্ষক না থাকা এবং সে কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠন এবং অফিস পরিচালনায় অসুবিধা ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হন এবং অসুবিধা দূরীকরণের পথ-নির্দেশ দেন। প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানোর ও প্রতিশ্রুতি দেন। বিদ্যালয়ের যে কোনো প্রয়োজনে তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে অঙ্গীকার করেন।

সন্ধ্যায় ছাত্রাবাসের (তপশিলী ও উপজাতি) ছাত্রদের সান্ধ্য প্রার্থনা সভায় তিনি উপস্থিত থাকেন। তারা অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও তারাও যে আজকের দিনে সমাজের পক্ষে অপরিহার্য তা বুঝিয়ে দেন এবং তাদেরকে সমাজ কল্যাণের অংশীদার হয়ে উঠতে এখান থেকেই রসদ গ্রহণ করতে হবে বলে মন্তব্য করেন। অবশেষে রাত্রি ৮ টার কিছু পূর্বে তিনি বিদ্যালয় ছেড়ে যান।

আমি নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের বাড়ি গিয়ে তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলি, পরামর্শ দিই। আমার এই কথা শুনে উনি খুবই খুশি হলেন। আমিও অনুপ্রাণিত হলাম।

আমরা এই বিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ তাঁর এই দিনভর পরিশ্রম ও সকলের সাথে অমায়িক ব্যবহারে স্তম্ভিত, মুগ্ধ। যেভাবে তিনি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেলামেশা করে এক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে গেলেন তাঁর জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কিছুদিন আগেও বিদ্যালয় পরিদর্শকের আগমনে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী বনাম বিদ্যালয় পরিদর্শকের মধ্যে যে চোর পুলিশ খেলার মহড়া চলত অন্তত তাঁর মধুর ব্যবহার তার অবসান ঘটাল। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তরে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে আমাদের দেশে প্রকৃত মানব সম্পদ গড়ে তোলার যে ব্যবস্থাপত্র তিনি দিয়ে গেলেন তা যদি প্রতি বিদ্যালয়ে অনুসৃত হয় তাহলে আমাদের রাজ্যের তথা দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি আর সুদূর পরাহত হবে না; অদূর ভবিষতেই আমরা বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারব। বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় যেখানে প্রতি মুহূর্তে ঘটছে মানব সম্পদের অবক্ষয় সেখানে শিক্ষার উন্নতি ঘটিয়ে প্রকৃত মানব সম্পদ তৈরির যে উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন তা ফলপ্রসূ হোক; তাঁর উপর পরম করুণাময়ের আশিস বর্ষিত হোক; তিনি দীর্ঘায়ু হয়ে এই দায়িত্বভার বহন করুন।

সাধন পাত্র
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক
মাগুরা উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ-মাগুরা, জেলা-বাঁকুড়া

তাং-১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৯

# মাধ্যমিক ২০০২ রাজ্যে অষ্টম স্থানাধিকারী ছাত্র কৌশিক পান-এর পত্র

প্রতি
মাননীয়,

শ্রী আশিসবরণ সামন্ত
সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক শিক্ষা, বিষ্ণুপুর মহকুমা
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

মহাশয়,

সবিনয়ে জানাই আমি বিষ্ণুপুর মহকুমার বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সদ্য মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র। আমি বর্তমান বছরের আমাদের বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল আপনার দৃষ্টিগোচরে আনা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করে কিছু কথা জানাতে আগ্রহী।

৭/১২/২০০০ তারিখে আপনি আপনার সহকর্মীবৃন্দসহ আমাদের বিদ্যালয় প্রথম পরিদর্শনে আসেন। দিনটির কথা বড়ো বেশি মনে পড়ে। তখন আমি নবম শ্রেণিতে পড়ি। প্রার্থনা সভা থেকে শুরু করে ছুটির পর পর্যন্ত দীর্ঘ সময় আপনারা আমাদের বিদ্যালয়ে থেকে যেভাবে বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন, তার সুফল অবশ্যই পেয়েছি। আপনি নিশ্চয়ই জেনে খুশি হয়েছেন যে, বর্তমান বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় আপনাদের আশীর্বাদে আমি রাজ্যে নবম হয়েছি। আমার বাবা, মা, আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের সঙ্গে আমার এই কৃতিত্বের অংশীদার আপনারাও। আপনাদের পরামর্শ মতো ভোরবেলা উঠে পড়াশোনা করে, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের কাছে নানান প্রশ্ন তুলে ধরে তার উত্তর জেনে নিয়ে, প্রতিটি বিষয় পড়ার পরে তা লিখে ও ভুল সংশোধন করিয়ে নিয়ে আমি অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি।

আপনার একটি কথা আজ আমার বেশি করে মনে পড়ছে—বিদ্যালয় পরিদর্শনের দিনে আমাদের দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়ে সেই সভার শেষে শিক্ষা বিষয়ক বক্তব্য রাখতে গিয়ে আপনি বলেছিলেন— 'পরীক্ষায় ভালো ফল কেবলমাত্র কলকাতা বা বড় বড় শহরের নামী দামি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই করবে এমন কোনো কথা নেই। আগ্রহ থাকলে ও প্রচেষ্টা নিলে গ্রামীন এলাকার বিদ্যালয় থেকেও ভালো ফল করা যায়। আমি তোমাদের মধ্য থেকে সেই ফল দেখার আশায় থাকছি।'

আপনার আশা আংশিক হলেও পূর্ণ করতে পেরে আজ আমি ধন্য। আপনার সুপরামর্শ ও প্রেরণার কথা আজ আমার সাফল্যের দিনে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

আশা করি, এইভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রেরণা দিয়ে তাদের মানুষ হতে সাহায্য করবেন। সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে শেষ করছি।

কৌশিক পান
(কৌশিক পান)
মাধ্যমিক ২০০২ নবম স্থান
বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

২৬/৫/০২

* পুনর্বিবেচিত ফলাফলে স্থান হয়েছে অষ্টম *

# জনৈক অভিভাবক রফিকুল হাসান-এর পত্র

প্রতি

মাননীয়,

শ্রী আশিসবরণ সামন্ত

অ্যাসিসট্যান্ট ইন্‌স্‌পেকটর অফ স্কুলস্‌

বিষ্ণুপুর সাব-ডিভিসন

মহাশয়,

পত্রের শুরুতেই আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। আশা করি ভালোই আছেন। আপনার ছাত্রদরদি এবং শিক্ষকদরদি মনের কথা শুনেছিলাম। মিলিয়ে দেখলাম আমার বোন সাহেদা আফরিনের ২০০১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাঁকুড়া জেলার মেয়েদের মধ্যে প্রথম হওয়ার ঘটনায়। কেননা, এর পিছনে ছিল আপনার প্রেরণা, যা বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের দিনে আপনার দেওয়া পরামর্শ আমার বোন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। আপনার শিক্ষকদরদি মনের কথা স্বচোখে দেখলাম, আমার বাবা যিনি রসুলপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন, তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর খবর পেয়ে ২১ জুন ২০০২ তারিখে আমাদের বাড়িতে ছুটে এসে, শোকে বিহ্বল আমার বোন তথা আপনার প্রিয় ছাত্রী সাহেদা আফরিনকে সান্ত্বনা দেওয়ার দৃশ্যে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে রোজগারহীন আমাদের পরিবারকে সাহায্য করতে আমার বাবার পাওনা টাকা, তড়িৎগতিতে দেবার ব্যবস্থা করে আমাদের প্রত্যেকের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন।

এছাড়াও, আমাদের বাড়িতে আপনার আগমন আমাদের প্রত্যেককে এই দুঃখের দিনে বাঁচার পথ খুঁজতে সাহায্য করেছে। আপনার প্রেরণা আমাদের পাথেয় হয়ে থাকবে। অনেক দেরিতে হলেও এই পত্র দিয়ে মনের কথা জানালাম। আশা করি, এই ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন।

নিবেদন ইতি

মহঃ রফিকুল হাসান

(মহম্মদ রফিকুল হাসান)

গ্রাম-বাগমারি

পোঃ-করিশুন্ডা

জেলাঃ-বাঁকুড়া

তাং-১/৭/০২

## শালবনী ব্লক বিদ্যালয় গুচ্ছের সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ পাড়ুই-এর পত্র

শালবনী ব্লক বিদ্যালয় গুচ্ছ
স্থাপিত - ১৯৯০
শালবনী, মেদিনীপুর

প্রতি
শ্রীযুক্ত আশিসবরণ সামন্ত
সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা)
বিষ্ণুপুর মহকুমা
মহাশয়,

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাই, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মাননীয় হরপ্রসাদ সমাদ্দার মহাশয় কর্তৃক আমাদের কাছে প্রেরিত বিষ্ণুপুর মহকুমায় গঠিত বিদ্যালয় গুচ্ছ সম্পর্কিত কাজকর্মের তথ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের শালবনী ব্লক বিদ্যালয় গুচ্ছের বার্ষিক সভায় আলোচনার জন্যে আপনাকে আহ্বান জানাই।

আশাকরি, যথাসময়ে উপস্থিত থেকে উৎসাহিত করবেন।

ধন্যবাদান্তে
ধীরেন্দ্রনাথ পাড়ুই
(ধীরেন্দ্রনাথ পাড়ুই)
২৬/৩/২০০২
সম্পাদক
শালবনী ব্লক বিদ্যালয় গুচ্ছ

## মদনমোহনপুর এস.কে.বি.ডি. উচ্চ বিদ্যালয়
## এর প্রধান শিক্ষকের পত্র

MODANMOHANPUR S.K.BD.HIGH SCHOOL
(Co-educational Govt. Aided
Estd. 1941 Index No. J2-046
Po. Madanmohanpur, Block - Katulpur, Dist. Bankura

Memo no. - Date - 4.10.2002
From :- Head master
To,
The A.I. of Schools (S.E)
Bishnupur Sub-Division
Bishnupur, Bankura

Ref : Your kind inspection on 23.8.02

Sir,

I, on behalf of this institution, convey my cordial thanks to you and your colleagues for your kind visit to this institution on 23.8.02. I feel pleasure to say that your act of inspection impressed the teaching and non-teaching staff as well as the students very much. On my opinion, such type of inspection will help the institution of its upliftment in all respect. We expect your kind visit off and on.

Thanking you,

Yours faithfully,
Sd / A.B. Nayek
Headmaster
Madanmohanpur S.K. BD.
High School

4.10.02

বিষ্ণুপুর মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক বিশিষ্ট শিক্ষা

গবেষক ও সাহিত্যিক আশিসবরণ সামন্ত মহাশয়কে

## ময়নাপুর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

হে শিক্ষা বিভাগের বিস্ময়,

দেশে যখন শিক্ষা নিয়ে নানান মতামতের চাপান-উতোর চলছে, কর্মবিমুখতা, স্বার্থসিদ্ধি, আত্মকেন্দ্রিকতা যেখানে কর্মীমহলের বিরাট অংশকে গ্রাস করে চলেছে, ঠিক তখনই একজন শিক্ষা-গবেষক, নিষ্ঠাবান বিদ্যালয় পরিদর্শক তথা একজন দরদি সরকারি কর্মীরূপে বিষ্ণুপুর মহকুমায় আপনার আগমন এবং নজিরবিহীন কর্মতৎপরতা শিক্ষাজগতে বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছে।

আপনি শিক্ষা-গবেষক, শিক্ষাপ্রসারে নিবেদিতপ্রাণ। আপনি শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শন শাখার গর্ব। নিয়মিত এবং যথাসময়ে কার্যালয়ে আপনার উপস্থিতিতে, দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনায়, সহকর্মীদের প্রতি সুমধুর ব্যবহারে আপনি এক নির্মল উদাহরণ।

বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে আপনি যে নজির স্থাপন করলেন তার উদাহরণ নেই। পরিদর্শনের দিনগুলিতে মহকুমার ১২৪ টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতেই প্রার্থনাসভায় আপনার উপস্থিতি, সারাদিন ধরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে থেকে তাদের পরামর্শদান, উন্নতির এবং মানুষ হওয়ার পথ প্রদর্শন, শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের উৎসাহদান, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতিকে প্রেরণা দান অকল্পনীয় বাস্তব এবং সত্য।

বিদ্যালয় পরিদর্শনের দিনে শেষ পর্বে প্রতিটি বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহদান এবং প্রতিভা অন্বেষণ বিদ্যালয় পরিদর্শনের এক নবতম সংযোজন। আপনার এই বিদ্যালয় পরিদর্শন পদ্ধতি আমাদের মতো সমাজকর্মীদের বিস্মিত, আপ্লুত করে তুলেছে।

আপনি শিক্ষককুলের বন্ধু। শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, অভিভাবকমহলের মনের মানুষ এবং পরিদর্শন শাখার বিস্ময়। আপনার আদর্শ, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা এবং সময়ানুবর্তিতা বিষ্ণুপুর মহকুমাবাসীর সঙ্গে আমাদের এই সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান চিরদিন স্মরণে রাখবে।

পাশাপাশি একজন সাহিত্যিক ও আকাশবাণীর গীতিকার রূপেও আপনি খ্যাত। আপনার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক, খ্যাতি সুদূর প্রসারিত হোক, কায়মনোবাক্যে কামনা করি।

একই সঙ্গে অভিনন্দন জানাই আপনার কার্যালয় সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সহকর্মী বন্ধুকে, যাঁরা প্রতিনিয়ত পাশে থেকে আপনাকে সুপরামর্শ ও উৎসাহদান করে চলেছেন।

আপনাকে সংবর্ধনা দিতে পেরে আজ আমরা ধন্য, গর্বিত এবং অনুপ্রাণিত।

অভিনন্দন সহ

(সামিদ জমাদার)
সম্পাদক

(সাধনকুমার পাত্র)
সভাপতি

২৪-০১-২০০২
ময়নাপুর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি
ময়নাপুর, থানা-জয়পুর, জেলা-বাঁকুড়া

# এ শুধু পরিদর্শন নয়, প্রগতির পথ প্রদর্শন

অজয়কুমার সাহা, প্রধান শিক্ষক, ভড়া ধনঞ্জয় দাস-কাঠিয়াবাবা হাইস্কুল

শিক্ষক জীবনে বিদ্যালয় পরিদর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ছাত্রাবস্থায় একবার মাত্র বিদ্যালয় পরিদর্শকের সামনা-সামনি আসার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু, সেই স্মৃতি আর আজকের স্মৃতি সম্পূর্ণ ভিন্নতর। অন্য একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করাকালীন বিদ্যালয় পরিদর্শনের দিনের অভিজ্ঞতায় ছিল ভয়, উদ্বেগ এবং একটু যেন নাস্তানাবুদ হওয়ার হাত থেকে সবার বাঁচার জন্য পথ খোঁজার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টা। কিন্তু আজকের এই বিদ্যালয় পরিদর্শন যে কতটা শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত তা মুখোমুখি না হলে উপলব্ধি করা যাবে না। প্রায় শতবর্ষ ছুঁতে চলা বিদ্যালয়ে হয়তো বা একাধিকবার পরিদর্শন হয়েছে ঠিকই তবে, এমনটা নিশ্চয়ই নয়। সহকর্মীদের কাছ থেকে শুনে বিগত দিনের পরিদর্শনের স্মৃতিকে সামনে রেখে তৈরি ছিলাম। কিন্তু, এবারের বিদ্যালয় পরিদর্শক মশাই সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে এলেন। খুব অল্পদিন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে এসেছি। পূর্বেকার বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় সহ শিক্ষক ছিলাম। তাই, দায়-দায়িত্ব আমার এতটা ছিল না। এই প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসেবে পরিদর্শকের মুখোমুখি হলাম। বিষ্ণুপুর মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক যিনি শুধু পরিদর্শকই নন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা শিক্ষা গবেষক সেই মাননীয় আশিসবরণ সামন্ত মহাশয় পূজাবকাশের আগেই পত্র দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ৯/১১/২০০০ তারিখে তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসছেন। আমাদের বিদ্যালয়টি জেলার একটি দুর্গমস্থানে অবস্থিত। যাতায়াত করা সহজসাধ্য নয়। সাম্প্রতিককালে দু-একটি বাস চলাচল করছে মাত্র। উনি কীভাবে আসবেন, কখন আসবেন তা জানতে পারিনি। তবে, স্বাভাবিকভাবে দেখেছি বিদ্যালয় পরিদর্শক মশাইরা ক্লাস চলাকালীন আসেন, দু-চারটে ক্লাসে যান, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করেন, উত্তর না দিতে পারলে 'যেন কিছুই হচ্ছে না' এমন মনোভাব ব্যক্ত করেন। আবার, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করে একটু 'কেমন যেন' চোখে তাকান। তারপর খাতাপত্র দেখতে দেখতে কিছুটা সময় করণিক ও প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে চলে বাক্য বিনিময়। তারপর 'আসছি মাস্টার মশাই' বলে গাড়িতে উঠে চলে যাওয়ার দৃশ্য।

আমরা সেই অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে তৈরি হতে থাকি। বিদ্যালয়ের আশ-পাশ পরিষ্কার করিয়ে, খাতা-পত্রের ধুলো ঝেড়ে সেরে রেখে, ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়ে এবং কে কে কীভাবে প্রশ্ন ক্যাচ করে নিয়ে তৎপরতার সঙ্গে উত্তর দেবে তার তালিম

দিই। কিন্তু, এ যে সম্পূর্ণ বিপরীত! বিদ্যালয় শুরুর আধঘন্টা আগেই সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক মশাই তাঁর দু-জন সহকর্মীকে নিয়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত। বিষ্ণুপুর থেকে বাসেই এসেছেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষার্থীরা যথাসময়ে উপস্থিত থাকায় সুবিধে হল। পরিদর্শক মশাইরা প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হলেন। কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে জাতীয় সংগীত গাইলেন। জাতীয় সংগীত গাওয়া শেষ হলে প্রত্যেকের সামনে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিই। আশিসবাবু, প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা সভার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলেন। জাতীয় সঙ্গীত ৫২ সেকেন্ড সময়েই গাওয়া হয়েছে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। সেই সঙ্গে প্রার্থনা সভায় শিক্ষার্থীদের দিয়ে মনীষীদের রচনা পাঠ করার পরামর্শ দিলেন। শুধু তাই নয়, নিজে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কথা শোনালেন- 'শ্রেণিভেদে সম্মান ও সম্পদের পরিবেশন সমান হয় না। সেখানে তাই ধনীকের সঙ্গে কর্মীকের অবস্থা যতই অসমান হয়ে উঠছে তত সমাজ টলমল করছে। এই অসাম্যের ভারে সেখানকার সমাজব্যবস্থা প্রত্যহই পীড়িত হচ্ছে। যদি সমাজে সাম্য স্থাপন করতে হয় তবেই রক্ষা, নইলে নিষ্কৃতি নেই। মানুষ যেখানে মানুষকে পীড়িত করবে সেখানে তার সমগ্র মনুষ্যত্ব আহত হবেই; সেই আঘাত মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যায়।' এই কথাটি শুনিয়ে 'রচনা পাঠ' এর শুভ উদ্বোধন করলেন।

প্রার্থনা সভা শেষে শুরু হল পঠন-পাঠন পর্ব। কোন কোন শ্রেণিতে কটি বিভাগ আছে তা জেনে নিয়ে ওঁরা কোন কোন ক্লাসে কে যাবেন তার একটি রুটিন তৈরি করলেন এবং ওঁদের এক একটি ক্লাসে পৌঁছে দেবার পরামর্শ দিলেন। আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র- ছাত্রীরা একটা চাপা কৌতূহলে প্রহর গুনতে লাগলাম। না জানি কী প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে! তবে, আশিসবাবুর কথা শুনে একটু আশ্বস্ত হয়েছিলাম। উনি প্রার্থনা সভায় ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন- 'আমরা আসা মানেই তোমাদের ভয় হয়, কী জানি কী প্রশ্ন করবে, যদি উত্তর দিতে না পারি? না আগেই বলে রাখি তোমাদের কোনো প্রশ্ন করব না। কি, খুশি তো?' শিক্ষার্থীদের ভেতরের আড়ষ্টতার পাথর যেন একটু সরে গেল। তার ভেতর থেকে আমরাও যেন কিছু আলো দেখতে পেলাম। পরিদর্শক মশাই ওই সময় আরও বলেছিলেন- 'আজ টিফিনের বিরতির পর তোমাদের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে দেখাতে হবে, সবাই তৈরি হয়ে নিও।'

আশিসবাবুর সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণিতে আমি গেলাম, প্রথমেই দশম শ্রেণিতে গেলেন। শিক্ষক মশাইদের পাঠদান মন দিয়ে কিছুক্ষন শুনলেন। তারপর শিক্ষক মশাই-এর কাছে একটু সময় চেয়ে নিয়ে শিক্ষার্থীদের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন— 'মাস্টার মশাই তো এতক্ষণ তোমাদের বেশ সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন—এবার তোমরা বলো তো-ভালো ফল কে কে চাও? শিক্ষার্থীরা সবাই হাত তুলল। তারপর উনি আরও বললেন- 'আরো ভালো ফল করার জন্য কে কে প্রাইভেট টিউশন পড়ছ?' দু-একজন বাদে প্রায় প্রত্যেকেই হাত তুলল। এবার উনি বললেন 'মাস্টার মশাই তো অঙ্কের ক্লাস নিচ্ছিলেন। এবার তোমরা বলো তো-আগের পরীক্ষায় কে কত নম্বর পেয়েছো? আশিসবাবু বোর্ডে লিখলেন ৯০-১০০ এর মধ্যে কজন, ৮০-৮৯ এর মধ্যে কজন এইভাবে ০-১৯এর মধ্যে কজন নম্বর পেয়েছে তা বোর্ডে লিখে দিলেন এবং নিজেও

একটি ছোট কাগজে লিখে নিলেন। এবার বললেন 'ফল দেখে মনে হচ্ছে অনেকেই প্রাইভেট টিউশন নিয়েও বুঝতে পারেনি। কে কে বুঝতে না পেরে স্যারকে প্রশ্ন করেছ কখনও তারা দাঁড়াও।' তাতেও মাত্র দুএকজন দাঁড়াল। বাকিরা প্রাইভেট টিউশন থেকেই জেনে নেয় বলে জানাল। এরপর তিনি আরও ১৫ মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে কীভাবে পড়াশোনা করলে ভালো ফল করা যায়, কীভাবে শিক্ষকমশাইদের কাছে পড়া বুঝে নিতে হয়এবং ভোরবেলা উঠে পড়া করলে যে অল্প সময়ে পড়া তৈরি হয়ে যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। আশ্চর্যের বিষয় মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ও তাদের প্রাপ্ত নম্বর এবং কী করে তারা পড়াশোনা করেছে তা বলে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে থাকেন।

প্রথম পিরিয়ড এইভাবে শেষ হল। দ্বিতীয় পিরিয়ডে গেলেন পঞ্চম শ্রেণিতে। সেখানেও ওই একইভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মনের কথা জেনে নিলেন। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সরকারি পাঠ্যপুস্তকগুলির যত্ন করার বিষয়ে তাঁর পরামর্শদান মন্ত্রের মতো কাজ করল। দু-তিন দিনের মধ্যে প্রত্যেকটি বই-এ মলাট দিয়ে শ্রেণি শিক্ষকমশাইকে প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রী দেখিয়েছে। এভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিদর্শক মশাইরা যে অনুপ্রাণিত করেন তা আমরা ভাবতেও পারিনি।

এইভাবে শ্রেণি পরিদর্শনের পর টিফিনের বিরতিতে খাতাপত্র তাঁরা সবাই মিলে দেখলেন। ভুলভ্রান্তি যা ছিল তা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংশোধন করে দিলেন।

পঞ্চম পিরিয়ড থেকে চলল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। খোলা মাঠে একসঙ্গে বসে যে এত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান করা যায় তা যেন কোনওদিন ভেবেও দেখিনি। উনি প্রতি শ্রেণি থেকে একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রীকে ডেকে নিলেন। তাঁদের ওপর দিলেন অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম সব মাটি হয়ে গেল। ওরা যে কোনও দিনও অনুষ্ঠান পরিচালনা করেনি। পারবে তো? সভার শুরুতেই আশিসবাবু নাচ, গান, আবৃত্তির সঙ্গে তাৎক্ষণিক বক্তৃতার বিষয় বলে দিয়েছিলেন। পঞ্চম শ্রেণির বিষয় ছিল 'আমার গ্রাম' ষষ্ঠ শ্রেণির 'আমার বিদ্যালয়', সপ্তম শ্রেণির 'আমার প্রাত্যহিক জীবন', অষ্টম শ্রেণির 'একটি স্মরণীয় ঘটনা', নবম শ্রেণির 'স্বাস্থ্যই সম্পদ', দশম শ্রেণির 'শিক্ষায় প্রাইভেট টিউশন', একাদশ শ্রেণির 'সম্প্রদায় নয়, মানুষ বড়' এবং দ্বাদশ শ্রেণির বিষয় ছিল 'শিক্ষায় মায়ের ভূমিকা'। অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে প্রত্যেককে নিজ নিজ শ্রেণির বিষয়গুলি ভেবে নিতে বললেন। তারপর লটারির মাধ্যমে একটি শ্রেণির জন্য রোল নম্বর তুললেন। তারপর ওই রোল নম্বরের ছাত্র-ছাত্রীকে বলার জন্য ডাকলেন। প্রতি শ্রেণিতে ৪/৫ জন করে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যেভাবে তাদের অংশগ্রহণ করালেন তা বর্ণনা করার ভাষা নেই। এরপর আশিসবাবু প্রধান অতিথিরূপে কিছু বলতে গিয়ে বলেন, বিষ্ণুপুর মহকুমার ১১৮ টি বিদ্যালয়ের মধ্যে তাদের বিদ্যালয়টিকে আজকে ১০৩তম বিদ্যালয় হিসাবে পরিদর্শন করলেন। আর মাত্র ১৫ টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে বাকি থাকছে যা অবশ্যই ডিসেম্বরের মধ্যে করবেন। ওঁর শিক্ষা বিষয়ক অনেক কথার মধ্যে যেটি মূল কথা ছিল তা হল — 'হবে না, হবে না নয়। আসুন না সবাই চেষ্টা করে দেখি।' শিক্ষার জন্য একজন বিদ্যালয় পরিদর্শকের এমন আকুতির কথা কোনওদিনই শুনিনি। অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষার্থীরা তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা

করল — 'স্যার আমাদের স্কুলে আবার কবে আসবেন।' আমার মনে হয় পরিদর্শক হিসেবে আশিসবাবুদের আর কিছু পেতে বাকি নেই। সব পাওয়া হয়ে গেছে।

ছুটির পরে ওই মাঠেই একসঙ্গো বসে শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও পরিচালন সমিতির সদস্যরা পরিদর্শক মশাই-এর সঙ্গো নানান বিষয়ে আলোচনা করেন।

আশিসবাবু পরিদর্শন নিয়ে যে গবেষণা চালান, তাতে উনি যে সার্থক একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এধরনের পরিদর্শনের আজ বড়ো প্রয়োজন। এই পরিদর্শন প্রত্যেকের অন্তরে চিরদিন জ্বলজ্বল করবে। আমরা সবাই তাঁর পুনরাগমনের আশায় থাকছি।

('বিষ্ণুপুর মহকুমা বিদ্যালয় গুচ্ছ'-এর বার্ষিক মুখপত্র 'সূর্যোদয়' এর সৌজন্যে)

# সফল পরিদর্শক

হুগলি জেলার কামারপুকুরের অনতিদূরে লস্করপুকুর গ্রামের এক সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারে জন্মেও শৈশব থেকেই চরম আর্থিক অনটনের বোঝা মাথায় নিয়ে নিয়মিতভাবে দৈনন্দিন সাংসারিক কাজকর্মের পাশাপাশি নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন কাজপাগল সহকর্মী শিক্ষাগবেষক আশিসবরণ সামন্ত। অপরদিকে একটি বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ১৯৭৫ সাল থেকে পরপর ছটি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পর ১৯৮২ সালের অক্টোবর মাসে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক পদে তার প্রথম যোগদান। ১৯৮১ সালের পে কমিশনে যখন বিদ্যালয় পরিদর্শকদের বেতনক্রমের ওপর নেমে এল কঠোর আঘাত তখন সব জেনেশুনেও নেহাৎ শিক্ষাপ্রশাসনকে ভালোবেসে শিক্ষকতা করার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের আহ্বান থাকা সত্বেও প্রত্যক্ষ শিক্ষকতা ছেড়ে স্বেচ্ছায় তাঁর এই পরিদর্শক ব্রত গ্রহণ। শিক্ষকতা জীবন থেকেই চিন্তা করেছেন একটি নির্দিষ্ট পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেও কীভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বাড়ানো যায়, পাঠে আগ্রহী করে তোলা যায় এবং সর্বোপরি তাদের মানুষ করে তোলা যায়। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রাথমিক স্তরে শ্রেণিভিত্তিক ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সফল হয়েছিলেন। এর পর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মতোই বিদ্যালয়, গ্রামপঞ্চায়েত, চক্র এবং চক্রোত্তর পর্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে একদিকে উপস্থিতি বৃদ্ধি অপরদিকে সাংস্কৃতিক দিকেও উৎসাহদান শিক্ষাবিভাগের নজর কেড়েছিল। ১৯৮৩ সালে হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া থানায় যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তার পরিকল্পনা ও রূপায়ণে ছিলেন আজকের সফল পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্ত। তৎকালীন বিভিন্ন শ্রেণির সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত চিত্র আজও উজ্জ্বল। তারপর বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা চেতনার ছাপ রাখতে রাখতে বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগে যে নজির স্থাপন করলেন তা সত্যিই প্রত্যেককে উৎসাহিত করবে এবং শিক্ষাবিভাগে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। আশিসবরণ সামন্তের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন সভা সমিতি, বিদ্যালয় এবং নিজের কার্যালয়ে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই উপস্থিত হওয়া যা অনেকের কাছেই আশ্চর্যের বিষয়। বর্তমান কর্মক্ষেত্র বিষ্ণুপুর মহকুমায় সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকহিসেবে যোগদান করে মাত্র দুবছর সময়ের মধ্যে মহকুমার ১১৮ টি বিদ্যালয়ের প্রত্যকটিতে প্রার্থনা সভা থেকে উপস্থিত হয়ে ছুটির পর পর্যন্ত থেকে কার্যালয়ের সহকর্মী অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের নিয়ে

দলগতভাবে পরিদর্শনকরতে সক্ষম হয়েছেন। বিদ্যালয় পরিদর্শনের প্রচলিত ধারা বদলে দিয়ে পরিদশর্নের নতুন পথ উন্মোচন করেছেন। প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থেকেছ্েন, শিক্ষার্থীদের কাছে প্রার্থনা সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন, শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রার্থনা সভায় মনীষীদের রচনা পাঠকে প্রার্থনা সভার অঙ্গা হিসাবে গণ্য করিয়েছেন। শ্রেণি পঠন-পাঠন চলাকালীন পাঠদান প্রক্রিয়া লক্ষ করেছেন, শিক্ষাথীদের সুবিধে অসুবিধের কথা শুনেছেন, তাদের প্রত্যেকের বিগত পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করে কীভাবে বর্তমান পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে আরও ভালো করা যায় তার ব্যবস্থা করেছেন। প্রতি শ্রেণিতে কতজন এবং কেন প্রাইভেট টিউশন পড়ে তার পরিসংখ্যান নিয়েছেন। প্রাইভেট টিউশন পড়ে তারা আগের পরীক্ষা দিয়েছে সেই ফলও কত খারাপ হয়েছে তা তাদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। কীভাবে শ্রেণিকক্ষের মধ্যেই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে পাঠ আয়ত্ত করা যায় তার পথ নির্দেশ করে বাস্তবায়িত করেছেন। যাদের বাড়িতে কাজ করতে হয় তাদের ভোরবেলা উঠে পড়া তৈরি করে নেবার জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং কতজন সেভাবে পড়াশোনা তৈরি করছে জানার জন্যে সুযোগ পেলেই বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে খোঁজ খবরও নিচ্ছেন। বিদ্যালয় পরিদর্শনের দিনে টিফিনের বিরতির সময় শিক্ষক-শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মী ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বর্তমান পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেও কীভাবে আরও ভালো করা যায় তার পথ খুঁজছেন এবং তা রূপায়িত করিয়েছেন। পঞ্চম পিরিয়ড থেকে ছুটির পর পর্যন্ত থেকে প্রতিটি বিদ্যালয়েই ছাত্র ছাত্রীদের দিয়েই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং উপস্থাপন করিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক দিকটিরও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। খেলাধুলাতেও উৎসাহদান শিক্ষার্থীরা আজীবন মনে রাখবে। সারা বছর ব্যাপী পড়াশোনায় নিবিষ্ট রাখতে দুটি পরীক্ষার প্রথমটির প্রাপ্ত নম্বরের ৪০ শতাংশ এবং দ্বিতীয়টির প্রাপ্ত নম্বরের ৬০ শতাংশ নিয়ে চূড়ান্ত ফল তৈরির চিন্তাভাবনা এবং বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যবস্থা করেছেন। এই সমস্ত বিষয়গুলির প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে সঠিকভাবে রূপায়িত করতে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল মহকুমার প্রতিটি ব্লকে এবং পুরসভায় 'বিদ্যালয় গুচ্ছ' গঠন এবং প্রত্যেকটি বিদ্যালয়কে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় গুচ্ছে র অধীনে এনে তাঁর প্রদর্শিত শিক্ষা পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা। এধরনের পদক্ষেপ শিক্ষাবিভাগে নজির হয়ে থাকবে। অথচ, কার্যালয়ে কোনো কাজকর্ম পড়ে নেই। কোনো শিক্ষক সংগঠন ডেপুটেশন দেবার মতো পয়েন্ট খুঁজে পায় না। এসমস্ত কাজে তাঁর কার্যালয়ের প্রতিটি সহকর্মীর আপ্রাণ সহযোগিতা তিনি পেয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে সঠিক পরিদর্শন হচ্ছে কি না তা তখনই নিশ্চিত হওয়া যায় যখন পরিদর্শন সেরে তাঁরা বিদ্যালয় থেকে চলে আসছেন তখনই চারদিক থেকে শিক্ষার্থীরা ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করে "স্যার আমাদের স্কুলে আবার কবে আসবেন?" তাঁর আরও একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল (১) এক একটি শিক্ষাচক্রে অর্থাৎ ৬ টি বছরে বিভিন্ন শ্রেণিতে কতজন শিক্ষার্থী

ভর্তি হয়েছিল এবং তার মধ্যে কতজন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে এবং পরীক্ষার ফলাফল কী হয়েছে তা তুলে ধরে একটি মহকুমার চিত্র পরিস্কার করে দেখানো।

(২) প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর সাংস্কৃতিক যোগ্যতা নির্ধারণ করে তাদের নিজ নিজ যোগ্যতা মতো সেই পথে চালিত করার জন্য "শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকশিত করণ প্রকল্প গ্রহণ।"

(৩) বিদ্যালয় গুচ্ছের মাধ্যমে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়ে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আনার এবং ধরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ।

তাঁর আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল—নির্ধারিত দিনে এবং নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয় পরিদর্শন, অন্যান্য তদন্তের কাজ ও সভাসমিতিতে উপস্থিত থাকতে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ এক কিলোমিটার পথও সরকারি গাড়িতে ভ্রমণ করেননি।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাননীয় সভাপতি হরপ্রসাদ সমাদ্দার মহাশয় তাঁর এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে এবং কাজকর্ম ও গবেষণার সুফল তুলে ধরে তাঁর গবেষণা পত্রের অনুলিপি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করে কীভাবে এই সুপারিশ সারা রাজ্যে কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে তাঁর পরামর্শ চেয়েছেন। এছাড়াও মধ্য শিক্ষাপর্ষদের প্রতিটি সদস্যকে এই গবেষণা পত্রের জেরক্স কপি দিয়ে অবহিত করেছেন। আরও, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি আয়োজিত দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখা ব্যবস্থাপিত ২০০২ সালের ১৬ এবং ১৭ মার্চ এই দুদিনের শিক্ষা শিবিরের শেষ দিনে মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত থেকে শ্রী সমাদ্দার মহাশয় আশিসবরণ সামন্তের কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরে এইভাবে যাতে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রচেষ্টা চালানো যায় তার পরামর্শ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পুরুলিয়ায় এ বি টি এ-র রাজ্য সম্মেলন মঞ্চে তিনি এই চিত্র তুলে ধরেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতির প্রতিটি সদস্যের কাছে এই সংবাদ খুবই গর্বের ও উৎসাহের বলে মনে করি।

শ্রী বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়
সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি
পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি

(জুলাই ২০০২— জুন - ২০০৩ 'শিক্ষা-বিদ্যালয় পরিদর্শক ও প্রশাসন' এর সৌজন্যে)

# বিদ্যালয় পরিদর্শনে নব দিগন্তের উন্মোচন

আরামবাগ টাইমস্, দ্বিতীয় বর্ষ * চতুর্থ সংখ্যা * ১ মে ২০০২

* ১৭ বৈশাখ ১৪০৯ * বুধবার

বিদ্যালয় পরিদর্শনের গতানুগতিক পদ্ধতির উর্ধ্বে গিয়ে পরিদর্শনে পশ্চিমবঙ্গে নতুন পথ দেখালেন বিষ্ণুপুর মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্ত। মহকুমার ১১৮ টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে প্রার্থনা সভা থেকে উপস্থিত হয়ে ছুটির পর পর্যন্ত থেকে পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করেছেন, তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা শুনেছেন, বর্তমান পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেই কীভাবে আরও সুন্দর ভাবে পাঠ আয়ত্ত করা যায় তার পথ দেখিয়ে চলেছেন। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং সমাধান সূত্র বের করেছেন। টিফিনের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করে চলেছেন। তাঁর বড় সাফল্য হল 'বিদ্যালয় গুচ্ছ' গঠন করে তার সুফল প্রতিটি বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি হরপ্রসাদ সমাদ্দার তাঁর এই প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করে শিক্ষামন্ত্রীকে পত্র দিয়ে অবহিত করেছেন এবং কী ভাবে শ্রী সামন্তের পদ্ধতিকে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া যায় সে বিষয়ে উদ্যোগী হতে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নামখানাতে সম্প্রতি আয়োজিত এক শিক্ষা শিবিরে রাজ্যের বিদ্যালয় পরিদর্শকদের পরামর্শ দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতিও শ্রী সামন্তের এই উদ্যোগকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষা শিবির করে পৌঁছে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে সমিতি সূত্রে জানা গেল।

## স্কুল পালানো রুখতে

বাঁকুড়া দর্শন, ৩৬ বর্ষ * ২৪শ সংখ্যা * ২১ শে আগস্ট * ২০০৩

প্রধান শিক্ষকের অনুমতি ছাড়াই বিদ্যালয় চলাকালীন শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার প্রবণতা ব্যাপক হারে সংক্রামক ব্যাধির মতো বেড়ে যাওয়ায় শিক্ষাবিভাগ উদ্বিগ্ন। এবিষয়ে বিষ্ণুপুর মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্ত অভিনব পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি তাঁর রুটিন মাফিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের পাশাপাশি টিফিনের বিরতির পর আকস্মিকভাবে মহকুমার কোনো না কোনো একটি বিদ্যালয়ে হাজির হয়ে শিক্ষার্থীদের হাজিরা খাতা নিয়ে দু চারটি শ্রেণিকক্ষে যাচ্ছেন। পুনরায় উপস্থিতি নিয়ে স্কুল পালানো শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করছেন এবং প্রধান শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছেন। বিদ্যালয় পরিদর্শকের এই আকস্মিক হানায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা দারুণ খুশি হলেও প্রাইভেট টিউটরেরা ভীষণ ক্ষুব্ধ। কেননা, স্কুল পালানো শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই স্কুল পালিয়ে টিউটোরিয়াল হোমে যায়।

## মাদ্রাসার ক্লাস শুরু ঃ নির্ধারিত সময়ের ১৫ দিন আগে

এবং পৌষালী, ১৮ মে ২০০৪ * মঙ্গলবার * ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১১

বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার আটপটি আমতলা জুনিয়র হাই মাদ্রাসার ২০০৪-০৫ শিক্ষা বর্ষের পঠন-পাঠন শুরু হল নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ দিন আগে ১৬ এপ্রিল ২০০৪ থেকে। বিষ্ণুপুর মহকুমার পিছিয়ে পড়া এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মানোন্নয়ন করার জন্য বিষ্ণুপুর মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্ত যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তাতে সাড়া দিয়ে উক্ত মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সন্তোষ প্রকাশ করে শিক্ষকদের সত্বর ক্লাস শুরু করার পরামর্শ দেন। শিক্ষকবৃন্দ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ফল প্রকাশ করে ১৬ এপ্রিল থেকে ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণির পঠন পাঠন শুরু করে দেন। এই সংবাদ প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সচিব জি. এইচ.ওবাইদুর রহমান এর কাছে পৌঁছালে ২২ এপ্রিল সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন 'একজন বিদ্যালয় পরিদর্শকের এই উদ্যোগ মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'

আশিসবাবু ২৩ শে এপ্রিল সকাল ৬ টা থেকে বেলা ১০টা ৩০ পর্যন্ত থেকে মাদ্রাসাটি পরিদর্শন করে এবং স্থানীয় অভিভাবকদের নিয়ে সভা করে পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেন তার পরামর্শ দেন। মাদ্রাসার উন্নতির জন্য একজন শিক্ষা আধিকারিকের এই উদ্যোগকে প্রত্যেকে স্বাগত জানিয়েছেন।

# বিদ্যালয় পরিদর্শন এক প্রযুক্তিগত কৌশল
# এর জন্য চাই বিশেষ দক্ষতা

জুলাই '০৩ জুন' -০৪ * শিক্ষা বিদ্যালয় পরিদর্শক ও প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখা, পুরুলিয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প ও সর্বশিক্ষা অভিযান এর যৌথ স্তরের ৬১ জন বিদ্যালয় পরিদর্শকের দুদিনের এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় পুরুলিয়া জেলা স্কুলের সভাকক্ষে। ১৬ নভেম্বর সকাল ১০ টায় উদ্বোধন করেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি স্বপন রায়চৌধুরী। পৌরোহিত্য করেন সমিতির জেলা শাখার সভাপতি ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) বসন্ত কুমার বকসী। মুখ্য প্রশিক্ষক তথা আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক তথা বিশিষ্ট শিক্ষা ও পরিদর্শন গবেষক আশিসবরণ সামন্ত। শিক্ষাস্বার্থে বিদ্যালয় পরিদর্শন অত্যন্ত জরুরি, বিদ্যালয় পরিদর্শন খবরদারি নয়, সহযোগিতা এবং এই পরিদর্শন এক প্রযুক্তিগত কৌশল। এর জন্য চাই বিশেষ দক্ষতা প্রভৃতি এজাতীয় গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে যুক্তি দেখিয়ে সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করেন। ১৭ নভেম্বর বিভিন্ন দল গঠন করে উক্ত আলোচনার ওপর লিখিত মতামত গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেকটি দলই আলোচনাকে সময়োপযোগী এবং পরিদর্শকের পাথেয় বলে বর্ণনা করেন। পরিদর্শন বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ১৮ নভেম্বর একটি পরিদর্শক দল নিয়ে আশিসবাবু পুরুলিয়া শহর থেকে ৮ কিমি দূরে লাগদা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং পরিদর্শক দলের প্রতিটি সদস্যই এই বিদ্যালয় পরিদর্শন পদ্ধতি শিক্ষাস্বার্থে উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি বলে জানান। শিক্ষার্থীরা মুগ্ধ হয়ে 'আবার কবে স্কুলে আসবেন' বলে জানতে চায়। উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদের প্রাক্তন সভাপতি ডঃ হরপ্রসাদ সমাদ্দারের পরামর্শক্রমে শিক্ষাবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ বিদালয় পরিদর্শক সমিতির যৌথ উদ্যোগে আশিসবরণ সামন্তকে জেলায় জেলায় আলোচনার জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

# পুরুলিয়ায় পরিদর্শক প্রশিক্ষণ শিবির ও বার্ষিক সাধারণ সভা

জুলাই '০৩ জুন' -০৪ * শিক্ষাবিদ্যালয় পরিদর্শক ও প্রশাসন

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতির উদ্যোগে, সর্বশিক্ষা অভিযান ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় জেলার সমস্ত বিদ্যালয় পরিদর্শকদের নিয়ে ১৬ এবং ১৭ নভেম্বর '০৩ পুরুলিয়া জেলা স্কুলের সভাকক্ষে (জেলার বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয় পরিদর্শকদের নিয়ে) দু-দিনের এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। ১৬ নভেম্বর সকাল ১০ টায় শিবিরের উদ্বোধন করেন পুরুলিয়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি শ্রীযুক্ত স্বপন রায়চৌধুরী। পৌরোহিত্য করেন সমিতির জেলা শাখার সভাপতি তথা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাঃ শিঃ) শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার বকসী মহাশয়। বিদ্যালয় পরিদর্শন কী এবং এর প্রযুক্তিগত কৌশল নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন মুখ্য আলোচক বিষ্ণুপুর মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক বিশিষ্ট শিক্ষাগবেষক শ্রী আশিসবরণ সামন্ত। অনুষ্ঠানে এ ডি পি ও শ্রী বংশীধর ধীবর এবং ডি-ডি-পি-ও শ্রী বাসব মুখোপাধ্যায় S.I/s & A-I/s গণের capacity building or C.R.C & C.I.R.C বিষয়ক আলোচনা করেন।

১৭ নভেম্বর '০৩ বিভিন্ন দলগঠন করে উক্ত আলোচনার ওপর লিখিত মতামত গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেকটি দলই আলোচনাকে সময়োপযোগী এবং পরিদর্শকদের চলার পথের মূল পাথেয় বলে বর্ণনা করেন। ১৭ নভেম্বর দ্বিতীয় ধাপে জেলা শাখার ৪৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমিতি ও পরিদর্শকদের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন সমিতির রাজ্যস্তরের সহ-সভাপতি শ্রী অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়। দুদিনের এই পরিদর্শন শিবির পরিচালনা করেন জেলাসম্পাদক শ্রী বিপ্লব ঘোষ।

১৮ নভেম্বর জেলার একটি পরিদর্শক দল পুরুলিয়া থেকে ৮ কিমি দূরে লাগদা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। নেতৃত্ব দেন শ্রী আশিসবরণ সামন্ত। শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ ও বিদ্যালয় পরিচালন কর্তৃপক্ষ শিক্ষাস্বার্থে এই নতুন পদ্ধতির বিদ্যালয় পরিদর্শন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করেন। এই প্রচেস্টা যাতে রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া যায় তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত বলেও তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন।

# ২০০ ৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৫৮ নম্বর প্রাপ্ত রাজ্যে সম্ভাব্য পঞ্চম স্থানাধিকারী ছাত্র সৌরভ অধিকারীর একটি পত্র

প্রতি,

মাননীয় শ্রী আশিসবরণ সামন্ত,
সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক শিক্ষা, বিষ্ণুপুর মহকুমা

মহাশয়,

সবিনয়ে জানাই, আমি শাশপুর ডি.এন.এস ইনসস্টিটিউশন থেকে ২০০৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক শিক্ষার্থী। আমার পরীক্ষার ফলাফল আপনাকে জানানো কর্তব্য মনে করে আমি এই পত্র লিখছি।

আপনি যতবারই আমাদের বিদ্যালয়ে এসেছেন ততবারই প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করেছেন। আমাদের বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দের শিক্ষাদান, বাবা-মা সহ গুরুজনদের আশীর্বাদ এবং সেই সঙ্গো আপনার প্রেরণা দান আমাকে বর্তমান বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৫৮ নম্বর পেয়ে সম্ভাব্য পঞ্চম স্থান অধিকার করতে প্রয়াসী করেছে।

পরিদর্শনের দিন আপনি প্রার্থনাসভায় উপস্থিত থেকে, শ্রেণিকক্ষে গিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিগত পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে তাদের এগিয়ে যাবার পথ দেখিয়ে এবং টিফিনের বিরতির পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়ে শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক চেতনা বৃদ্ধিতে জোয়ার এনেছেন।

২০০২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭৪৭ নম্বর পেয়ে যখন খুব অল্পের জন্য কৃতী দশ -এর মধ্যে আসতে পারিনি, এজন্য সাময়িক দুঃখ পেলেও আপনার প্রেরণা আমাকে হতাশ হতে দেয়নি। তাই আজ আমার এই সাফল্য। মহকুমার প্রতিটি বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে গিয়ে আমার প্রচেস্টার কথা দীর্ঘ দুই বছর ধরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরেছেন একথা আমি মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের কাছ থেকে শুনেছি। এজন্য আমি গর্বিত, আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত। আমারই মতো হাজার হাজার অত্যন্ত নিম্ন আয় সম্পন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েরা যে আপনার পরামর্শে ও প্রেরণায় এগিয়ে যাবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আপনার আশা পূরণ করতে পেরে আজ আমি মানসিকভাবে তৃপ্ত এবং ধন্য। সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে শেষ করছি।

আপনার স্নেহের,
সৌরভ অধিকারী
(সৌরভ অধিকারী)

২৮-০৭-২০০৪

গ্রাম-শাশপুর-পোস্ট -শাশপুর
জেলা-বাঁকুড়া

## মায়েদের জন্য

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলকাতা ২৪ কার্তিক ১৪১১ বুধবার ১০ নভেম্বর ২০০৪

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর :** সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর মহকুমার প্রতিটি বিদ্যালয়ে মাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত এবং উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্য পর্যায়ে জেলার দুই কৃতী ছাত্রকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিষ্ণুপুর সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক করণ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয় তাদের মায়েদেরও। 'শিক্ষায় মায়েদের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনাও হয় ওই অনুষ্ঠানে। সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্ত বলেন, "শিক্ষায় মায়েদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সে কথা মাথায় রেখেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।"

# ছাত্ররা সংবর্ধিত বিষ্ণুপুরে

সংবাদ বর্ধমান ৩০ কার্তিক ১৪১১ মঙ্গলবার ১৬ নভেম্বর ২০০৪

**সংবাদদাতা, পাত্রসায়ের, ১৫ নভেম্বর :** সম্প্রতি বিষ্ণুপুর কৃত্তিবাস মুখার্জি হাইস্কুলে 'ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে মায়েদের ভূমিকা' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিষ্ণুপুর মহকুমা বিদ্যালয়গুচ্ছের পরিচালনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা হলেন মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) আশিসবরণ সামন্ত।

এদিনের অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী ১০৭ জন ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জানান হয়। শিক্ষাপ্রসারে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি তাদের মায়েদেরও যে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন আশিসবাবু। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক প্রদীপ সরকার, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ পাত্র, দেবব্রত মুখার্জি সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। আশিসবাবু তার মাইনের টাকা থেকে দুস্থ, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তার এই মহৎ উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃতী ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের মায়েরা।

রাঢ় অঞ্চলের সংবাদ ও সাহিত্যপাক্ষিক পত্রিকা

মন্দির নগরীর সংবাদ প্রথম বর্ষ চতুর্দশ সংখ্যা ১২ জানুয়ারি ২০০৫ ২৭ পৌষ ১৪১১

# রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন পর্ষদের কর্মশালা

কলকাতা ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ সংলগ্ন রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন পর্ষদের বিদ্যাসাগর ভবনে ২১-২৩ ডিসেম্বর ২০০৪, এক কর্মশালা হয়ে গেল। আলোচ্য বিষয় ছিল 'শিক্ষার মানোন্নয়নে বিদ্যালয় পরিদর্শন ও বিদ্যালয়গুচ্ছের ভূমিকা'। উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিভাগের প্রধান সচিব দেবাদিত্য চক্রবর্তী, শিক্ষাবিদ রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ভবেশ মৈত্র, দিব্যেন্দু হোতা, আবদুস সাত্তার, বিমান মুখোপাধ্যায়, মানিক দোলুই, দিব্যগোপাল ঘটক প্রমুখ।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক বিশিষ্ট শিক্ষা ও পরিদর্শন গবেষক আশিসবরণ সামন্ত প্রতিনিধি হিসাবে ওই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ওই বিষয়ে তাঁর কাজকর্ম তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কর্মশালার আয়োজক রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন পর্ষদের ডিরেক্টর ড. রথীন্দ্রনাথ দে শ্রী সামন্তের কাজকর্মের যাবতীয় নথিসংস্থার গবেষণাগারে সংগ্রহ করে রাখেন এবং ভবিষ্যতে আরও গবেষণা করার আহ্বান জানান।

## ২০০৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭৮৫ নম্বর প্রাপ্ত রাজ্যে সম্ভাব্য প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্র অরিন্দম সাঁতরার পত্র

শ্রদ্ধেয়
শ্রী আশিসবরণ সামন্ত,
সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক,
বিষ্ণুপুর মহকুমা,
মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

পত্রে আমার প্রণাম জানাই। আজ ২০০৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এই পরীক্ষায় ৭৮৫ নম্বর পেয়েছি এবং সম্ভবত প্রথম স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছি।

আমাদের বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় আপনার উপদেশ ও প্রেরণা আমার সাফল্যে যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে। সেজন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পুনরায় প্রণাম জানিয়ে শেষ করছি।

সোনামুখী,
৩১/৫/০৫

আপনার অনুগত
অরিন্দম সাঁতরা
(অরিন্দম সাঁতরা)

Govt of West Bengal

**STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH & TRAINING, W.B.**

25/3, Ballygunge Circular Rd., Calcutta-700 019
Phone : 2475-4377 (O), 2476-5114 (D)
Fax : (033) 2476-5114

No. 545/SCERT Date 15.06.05

To
Sri Ashis Baran Samanta
Asstt. Inspector of Schools
Bankura, (S.E.)
Bishnupur Subdivision
Bankura.

**Sub : Workshop on 23rd June 2005 at SCERT (W.B)**

Sir/Madam,

SCERT (WB) is going to organize a workshop titled "Action Research in the context of UEE : Role of DIETs/PTTIs" on 23rd June, 2005. It is expected that eminent educationists, teachers, teacher-educators and other key functionaries will take part in the deliberation of the workshop. The workshop will aim explaining the need for conducting Action Research, describing the way an Action Research problem is perceived by the Practitioner, explaining the salient features of Action Research and enumerating steps involved in conducting Action Research.

I cordially invite you as a speaker in the Business Session-I commencing from 10.30 a.m. on 23.06.05. We hope you will realize our time constraints and you will present your speech within ten minutes, which will be followed by an interactive session. The topic for your speech is *school complex in the context of UEE.*

Yours faithfully,

Rathindranath De

(Rathindranath De)
Director, SCERT (WB)

Enclo : Programme Schedule

# স্কুলছুট ৫০৯ পড়ুয়াই ফের ফিরল স্কুলে

আজকাল, বর্ষ ২৫ সংখ্যা ১০২ বুধবার ২১ আষাঢ় ১৪১২ বঙ্গাব্দ
৬ জুলাই ২০০৫ কলকাতা

**সব্যসাচী সরকার :** পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল ৫০৯ জন। স্কুল-কর্তৃপক্ষ এবং পড়াশোনা ছেড়ে-দেওয়া ছাত্রছাত্রীদের পরিবারের লোকজনদের সাহায্যে সেই ৫০৯ জনকেই স্কুলে ফেরানো হল। রাজ্যে প্রথম বিষ্ণুপুর মহকুমায় অভাবনীয় এই ঘটনা ঘটেছে। স্কুলের পড়া ভালো না লাগায় তারা পড়া ছেড়ে দেয়। ১৯৯৯-২০০০ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে ওই ৫০৯জন ভর্তি হয়েছিল। সে-বছর বিষ্ণুপুর মহকুমার বিভিন্ন স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয় ১২ হাজার ১৮০ জন। ৪ হাজার ৭১৫ জন ষষ্ঠ শ্রেণিতে ফেল করে। কিন্তু পড়া চালিয়ে যায়। মহুকমার বিদ্যালয় পরিদর্শক সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন, সেই সময়ে ভর্তি-হওয়া ওই সংখ্যক পড়ুয়া স্কুলে আসছে না। পড়ুয়াদের ঠিকানা খুঁজে তাদের বাড়ি গিয়ে পরিদর্শকের পাঠানো লোকেরা তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন। বিষ্ণুপুর মহকুমা থেকে এ বছর মাধ্যমিকে প্রথম হয় অরিন্দম সাঁতরা, দশম হয় অঙ্কুর দাশগুপ্ত এবং উচ্চমাধ্যমিকে নবম হয় অভিরূপ ঘোষ। এই ফলাফলের পিছনে একটিই রসায়ন। তা হল, কয়েকটি বিদ্যালয় নিয়ে সার্কেল তৈরি করে পড়ানো। বিষ্ণুপুর মহকুমার ১২৪টি মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়কে ১০টি আঞ্চলিক বিদ্যালয়গুচ্ছের আওতায় আনা হয়। এই স্কুলগুলোর শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিচালন সমিতি ও অভিভাবকদের একসঙ্গে কাজে লাগিয়েই সুফল মিলেছে। প্রতি দু'মাস অন্তর বিদ্যালয়গুচ্ছ (ক্লাস্টার অফ স্কুল্‌স) নিয়ে সভাও করা হয়েছে। কেন পড়ুয়ারা আরও বেশি মনোযোগী হচ্ছে না, তার জন্য অভিভাবকদের মতামত চাওয়া হয়েছে। ভালো পড়ুয়াদের আলাদাভাবে ক্লাসেই নজর দেওয়া হয়েছে এবং যতটা সম্ভব তাদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকেরা। কীভাবে পঞ্চম শ্রেণিতে প্রথমবার ভর্তি হওয়া এবং তারপরেই স্কুলছুটদের ফিরিয়ে আনা হল? এ ব্যাপারে বিষ্ণুপুর মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্ত জানিয়েছেন, 'আমরা অভিভাবকদের স্কুলে তাঁর সন্তানকে পাঠানোর কথা বলেছিলাম। তাঁরা উদ্যোগ নিয়েছেন। স্কুলে আসার জন্য পড়ুয়াদেরও বোঝানো হয়েছে।'

# লেখাপড়া ঃ টুকরো স্মৃতি নিটোল ছবি

আমাদের দেশে শিক্ষার সুফল প্রতিটি মানুষের কাছে যাতে সহজেই পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য প্রায় সব সময়ই নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। অনেকেই উৎসাহিত হচ্ছেন, আবার কেউ কেউ বা নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে 'কিস্‌সু হবে না' বলে বসে থাকছেন। ঠিক সেই সময় যদি কিছু হওয়ার দৃষ্টান্ত এনে হাজির করা যায় তাহলে, আবার নতুন করে দুর্বল মনে উৎসাহ উদ্দীপনার জোয়ার আসতে শুরু করবে। ফল 'কিছু হবেই'।

আমার পরিদর্শক জীবনের একেবারে সাম্প্রতিককালে বহু ছাত্রছাত্রীকে একটু একটু করে চেষ্টা করে অনেকখানি সফল হতে দেখার ঘটনা ঠিক এই মুহূর্তে চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। দেখা গেছে চেষ্টা থাকলে, আগ্রহ থাকলে কিছু করে দেখাতেই হবে, আমাকে অনেক বড়ো হতে হবে এই রকম সব চিন্তা-ভাবনা থাকলে এবং সেই সঙ্গো সহমর্মী মানুষজনের কাছ থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা পেলে পারিপার্শ্বিক বাধা, পারিবারিক সমস্যা, আর্থিক অস্বচ্ছলতা প্রভৃতি কোনো বাধা বাধা-ই নয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাশাপাশি বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে পরিদর্শনে গিয়ে শিক্ষার্থীদের মনের গোপন অব্যক্ত কথাটি জানার চেষ্টা করে এবং জেনে তাদের কাছে কিছু বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরে মনোবল বৃদ্ধি করার ফলে তাদের জীবনের মোড় সম্পূর্ণভাবে ঘুরে যেতে দেখেছি। সেই সঙ্গো দেখেছি আশ্চর্যজনকভাবে সাফল্য লাভ করতে।

বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে তখন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমায় কাজ করছি। ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাস থেকে ২০০৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে যাদের উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হতে দেখেছি তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের কথাই এখানে উদাহরণ হিসেবে উত্থাপন করছি।

প্রতিটি বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে প্রার্থনাসভায় উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার প্রচেষ্টা আছে কিনা যেমন লক্ষ করি ঠিক তেমনি, শ্রেণিকক্ষে গিয়ে সামগ্রিক চিত্র গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষা-বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে তাদের প্রত্যেকের ভেতরের অব্যক্ত কথাটি জেনে নিয়ে সেই ক্ষতস্থানটিকে সারিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। অনেক কৃতী ছাত্রছাত্রী যারা নিজেদের প্রচেষ্টা এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে সংগ্রাম করে খুব সাধারণ অবস্থা থেকে অনেকখানি 'অসাধারণ' হয়ে উঠেছে তাদের কথা তুলে ধরে নতুন করে এগিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়ে এবং পথ দেখিয়ে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে সুফল পেতে দেখেছি। প্রত্যেককে আপন করে নিতে পারলে এবং প্রত্যেকের মনের কথাটি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারলে তারা অবশ্যই আপন হবে। শুধু তাই নয়, যাদের 'কিস্‌সু হবেনা' বলে একসময় কেউ

দূরে সরিয়ে রেখেছিল তাদেরও যে 'কিছু হবেই' একথা বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলা যায়। আজ, অসংখ্য প্রমাণের ভেতর থেকে মাত্র কয়েকজনের কথা এখানে তুলে ধরছি।

২০০৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে প্রথম হয়েছে অরিন্দম সাঁতরা। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী বিন্দুবাসিনী জুবিলি হাইস্কুলের ছাত্র। পেয়েছে ৭৮৫ নম্বর। ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষ থেকে মহকুমা জুড়ে একটানা 'পরিদর্শন অভিযান' চালিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং 'বিদ্যালয় ছুট' রোধের সংকল্প নিয়ে শিক্ষা-বিজ্ঞান-ভিত্তিক ভাবে নিজ উদ্ভাবিত পরিদর্শন পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি ছেলে মেয়েকে উৎসাহিত করতে গিয়ে ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলাম পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওপর। মহকুমায় ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে ১২১৮০ জন ছাত্রছাত্রী। চেষ্টা করেছি তাদের প্রত্যেককে বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে। দীর্ঘ ৬ বছরের প্রচেষ্টায় ১০০০ শতাংশ সফল হয়েছি। মাত্র ৫০৯ জন শিক্ষার্থী 'বিদ্যালয় ছুট' হলেও তাদের পুনরায় কোনো না কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো সম্ভব হয়েছে। অরিন্দম যখন ১৯৯৯ সালের মে মাসে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয় তখন থেকে অনেকের সঙ্গে ওকেও চিনি। শুধু তাই নয়, ওর সহপাঠী বন্ধু আফজল মিদ্যাকেও জানি। ওদের বিদ্যালয়ে অনেক অনেকবার গিয়ে অন্যান্য কৃতী ছাত্রছাত্রীরা কে কীভাবে বড়ো হয়েছে তা বিভিন্ন সময়ে বিশদভাবে জানিয়েছি। ওরাও উৎসাহিত হয়ে চুপচাপ শুনেছে, মন স্থির করেছে, পথ খুঁজছে, তাই পথও পেয়েছে। এই ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাচক্রে এই মহকুমায় রাজ্যস্তরের একগুচ্ছ কৃতী ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এখন মাত্র দু-তিন জনের কথাই উল্লেখ করছি।

৩১ মে ২০০৫ সাল। অরিন্দম সাঁতরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে প্রথম হয়েছে খবর শুনে ওকে অভিনন্দন জানানোর জন্য বিকেলে সোনামুখী গিয়ে হাজির হই। উল্লেখ করার মতো যে অরিন্দম তার ফল জানার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে পত্র লিখে জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, মাধ্যমিকের ফল বের হওয়ার পর ওই পত্রটিই তার ফলাফল জানানো বিষয়ক প্রথম পত্র। অরিন্দমের বাড়ি যাবার জন্য আমি ঠিক সন্ধ্যার সময় সোনামুখীতে গিয়ে হাজির হই। পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ধনসিমলা বিদ্যাভবনের প্রধান শিক্ষক নজরুল হক এবং রামপুর উচ্চবিদ্যালয়ের সহশিক্ষক বংশীমোহন দে-র সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই ওনাদের প্রশ্ন — 'আপনি নিশ্চয়ই অরিন্দমের বাড়ি যাবেন?' 'হ্যাঁ, তাই তো এলাম। তবে, তার আগে বলুন আফজলের খবর কী?' বংশীবাবু বললেন, 'জানেন স্যার, আফজল ৭৬৬ নম্বর পেয়েছে। ওর খুব মন খারাপ।' কথাটি শুনেই বলি, 'আমি আফজলের বাড়ি আগে যাবো।' এই বলে ওনাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। দুই বন্ধু ওরা। দুজনে বিপরীত পরিবেশে বড়ো হয়েছে। আফজল মিদ্যার বাড়ি সোনামুখী থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে মহেশপুর গ্রামে। অরিন্দমের বাড়ি সোনামুখী শহরেই। অরিন্দমের বাবা অধ্যাপক, মা ওই বিদ্যালয়েরই শিক্ষিকা, দিদি শাশ্বতী ভালোভাবে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছে। চারজনের সংসার। বেশ সচ্ছল পরিবার। অপরদিকে আফজলের বাবা ক্ষুদ্র চাষি। মাত্র বিঘে দুয়েক জমি। চাষবাস করে কোনোরকমে খেয়ে বা না খেয়ে বেঁচে থাকা তাদের।

প্রত্যেক পরীক্ষাতেই ওরা দুজনে কখনো প্রথম কখনো দ্বিতীয় স্থান ভাগাভাগি করে দখল করে। দুটি পৃথক অর্থনৈতিক, পৃথক ধর্মীয় পরিবার থেকে এলেও লেখাপড়াতে পরস্পরের সহযোগী, পরিপূরক এবং অভিন্নহৃদয় বন্ধু ওরা দুজনে। কোনো হিংসা বা বিদ্বেষ ওদের মন স্পর্শ করতে পারেনি।

সেদিন সন্ধেবেলা আফজলের বাড়িতে গিয়ে দেখি, বাড়ির বারান্দার একদিকে হাঁস-মুরগি, গোরু-ছাগল বাঁধা আছে, অপরদিকে একটি ছোট্ট ঘরে ছেঁড়া মাদুর পেতে আফজল বই-এর পাতায় চোখ বুলাচ্ছে। আমরা যেতেই বের হয়ে এল আফজল। চোখ দুটি ছল ছল করছে। হয়তো বা রাজ্যে দ্বিতীয় হতে পারেনি বলে। এখানেও কিন্তু নম্বর ওরা আগের মতোই ভাগাভাগি করে নিয়েছে। মার্কসিট হাতে নিয়ে দেখি কোনো অংশে অরিন্দমের চেয়ে কম নয় আফজল। অরিন্দম ইংরেজিতে পেয়েছে ৮৭ আফজল ৯২, অরিন্দম গণিতে পেয়েছে ৯৮ আফজল ৯৯ এবং ভৌত বিজ্ঞানে অরিন্দম ৯৯ আফজল ১০০ এর মধ্যে ১০০ই পেয়েছে। অবাক বিস্ময়ে আফজলকে বুকে জড়িয়ে ধরি। আফজলের মধ্যে সৌরভের পুরো ছবি ভেসে ওঠে। দারিদ্র্য যে কোনো বাধাই নয় তা ২০০৪ সালে সৌরভ অধিকারী উচ্চমাধ্যমিকে পঞ্চম স্থান অর্জন করে যেমন প্রমাণ করেছিল ঠিক তেমনি আফজলও। রাজ্যে সম্ভাব্য কৃতী তালিকায় ওর স্থান চতুর্দশ। আফজলের অনেক না-বলা কথা শুনতে শুনতে যখন বাড়ি থেকে বের হই তখন রাত সাড়ে আটটা। ওই দিন রাত নটার সময় সোনামুখীতে অরিন্দমের বাড়িতে গিয়ে দেখি যেন মেলা বসেছে। আমি যেতেই অরিন্দম এগিয়ে এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তার পাশে বসায়। সেদিনের সেই প্রথম দেখা ৯ বছরের ফুটফুটে শিশুটি আজকের ১৫ বছরের কিশোর অরিন্দম রাজ্য জয় করেছে। আমিও ওর পাশে বসে নিজেকে খুব পুণ্যবান বলে ভাবতে শুরু করছি।

অরিন্দমের আনন্দের ভাগ নিয়ে যখন বের হয়ে আসি তখন রাত পৌনে দশটা। অন্যান্যদের সঙ্গে এই দুই বন্ধুর আরও অনেক অনেক উন্নতি কামনা করি।

পরের দিন সকালেই গিয়েছিলাম সোনামুখী থানার রামপুর গ্রামে হতদরিদ্র পরিবারের সংগ্রামী ছাত্র পিন্টু ভঞ্জের বাড়ি। রামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের এই ছাত্রটি চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে ২০০৫-এর মাধ্যমিকে ৭৩২ নম্বর পেয়েছে। ভাঙা টালির ঘর। বর্ষায় সব জলটুকু ঘরের মেঝেতে পড়ে। সবদিন খেতে পায় না। মা লোকের বাড়িতে মুড়ি ভাজেন, বাবা সময়ে সুযোগে রাঁধুনিগিরি করেন, ভাই থ্যালাসেমিয়া রোগী। দীর্ঘ ৬ বছর ধরে ওর পাশে থেকে ওকে প্রেরণা দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। নিকটবর্তী বড় চাতরা রামকানাই উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পিন্টুর উচ্চ মাধ্যমিকের সব দায়-দায়িত্ব নিয়েছেন জেনে আনন্দিত।

এবার মনে পড়ছে ইন্দাস থানার গুরুধাম শান্তাশ্রম ব্রহ্মানন্দ বিদ্যাভবনের ছাত্রী সাহেদা আফরিনের কথা। বর্তমানে, প্রাইভেট টিউশন না পড়লে বুঝি বা কিছুই হবেনা এমন ধারণা প্রায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর এবং তাদের অভিভাবকদের মনে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। সাহেদা ওই থানারই বাগমারি গ্রামের বাসিন্দা, যে গ্রামে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ইলেকট্রিক আসে নি, লন্ঠন-হারিকেনের আলোয় লেখাপড়া করতে হয়েছে। পথঘাটও তেমন উল্লেখযোগ্য

ছিলনা। সেই গ্রামের অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের 'অসাধারণ' মেয়ে সাহেদা আফরিন। এর কথা বেশি করে মনে দাগ কেটে রেখেছে কেননা, প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত কোনোদিনই প্রাইভেট টিউশন পড়েনি। সবকিছু শ্রেণিকক্ষেই আয়ত্ত করেছে। সামান্য অসুবিধে থাকলে সেইদিনই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে বুঝে নিয়েছে। এই সাহেদা আফরিন ২০০১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাঁকুড়া জেলার মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। পেয়েছে ৭৩৬ নম্বর।

ওর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০০১ সালের ১০ জুলাই বিদ্যালয়ে ওকে সংবর্ধনা দেবার আয়োজন করে। ওই দিনই সকালে বাড়িতে সাহেদার টেলিফোন পাই। সে বলে — 'স্যার, আজ আমাকে স্কুল থেকে সংবর্ধনা দেবার আয়োজন করেছে। হেডস্যার আপনার অফিসে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন। আজ বেলা ১১ টায় অনুষ্ঠান। ওই অনুষ্ঠানে আপনাকে আসতেই হবে।' 'অনেক কাজ, আজ অবশ্যই অফিস যেতে হবে' বলতেই সাহেদার চটপট জবাব - 'আপনি তাহলে অফিস নিয়েই থাকুন। আমাদের সঙ্গো আপনার আর কোনো সম্পর্কই নেই।' সাহেদার এই কথাটিই বৃষ্টির দিনে দ্বারকেশ্বর নদী পার হয়ে দীর্ঘপথ মোটরসাইকেলে পাড়ি দিয়ে আমাকে যেতে বাধ্য করেছিল ওর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। খুশি হয়েছিল সাহেদা, খুশি করেছিল আমাদের সবাইকে। আমারই পরামর্শমতো নিয়মিত ভোরবেলা উঠে পড়ত এবং লিখতও সমানভাবে। এই কথাটি ওর বক্তব্যে বারবার সেদিন উল্লেখ করেছে সাহেদা।

সেদিন বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সাহেদা। বলেছিলাম — 'উচ্চ মাধ্যমিকে আরও ভালো ফল কর, সেদিন তোর বাড়িতে গিয়ে তোকে সংবর্ধনা দেবো।' ওর বাড়ি গিয়েছিলাম। যেতে বাধ্য হয়েছিলাম প্রাণের টানে, মানবিক কারণে,কর্তব্যের খাতিরে। ভাবতে পারিনি যে, এই পরিস্থিতিতে সাহেদার বাড়ি আমাকে যেতে হবে। ২০০২ সালের ২১ জুন। ইন্দাস থানা পশ্চিম বিদ্যালয় গুচ্ছ' এর সভায় গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে শুনি কৃতী ছাত্রী সাহেদার বাবা আকস্মিক সর্পদংশনে মারা গেছেন। কথাটি শুনেই দুজন শিক্ষকমশাইকে সঙ্গো নিয়ে সাহেদার বাড়িতে গিয়ে হাজির হই। সেই পরিবেশে ওর পাশে দাঁড়াই, সান্ত্বনা দিই।

সেই সাহেদার প্রিয় বিষয় ইংরেজি সাহিত্য। সে এখন ইংরেজি অনার্স নিয়ে পড়ছে বর্ধমানের বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে।

সাহেদা আফরিনের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে বিষ্ণুপুর থানার রাধানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের মৌমিতা ঘোষের কথা। ২০০০ সালের ৩ জানুয়ারি যখন ওদের বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাই মৌমিতা তখন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। কীভাবে একজন আদর্শ শিক্ষার্থী হওয়া যায় এবং কীভাবে শিক্ষক মশাইদের পাঠদান অনুসরণ করে ভালো ফল করা যায় এবং এই মহকুমারই অনেক ছাত্রছাত্রী কীভাবে ভালো ফল করেছে তার নানান উদাহরণ শেষের দিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দিয়েছিলাম। মৌমিতা শুনেছিল। তাই, একদিনও প্রাইভেট টিউশন না পড়ে কেবলমাত্র বিদ্যালয় শিক্ষকদের পাঠদান অনুসরণ করে নিজের প্রচেষ্টায় এবং অধ্যবসায়ে ২০০৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭৩৫ নম্বর পেয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোনোরকমে ধার-দেনা করে খেয়ে পরে বেঁচে থাকা পরিবারের মেয়ে একটি জীর্ণ কুঁড়েঘরের একটিমাত্র কক্ষে মা, বাবা ও তিন

বোন কোনোরকমে মাথা গুঁজে থেকে সংগ্রাম করে চলেছে। রাধানগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০০৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক দেবে মৌমিতা। আমরা তার স্বপ্ন সার্থক হওয়ার আশায় দিন গুনছি।

২০০১ সালের ১৫ ডিসেম্বর গিয়েছিলাম পাত্রসায়ের থানার পাটিত উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শনে। শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শনের পর পঞ্চম পিরিয়ড থেকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করিয়েছিলাম। ছাত্রছাত্রীরাই পরিচালনা করে। আমরা এবং শিক্ষকমশাইরা সবাই দর্শক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শিক্ষামূলক আলোচনা করতে গিয়ে আমি যে শৈশব থেকেই ভোরবেলা উঠে লেখাপড়া করতাম এবং এখনও প্রতিদিন ভোর ৪ টেয় উঠি সেকথা বলেছিলাম। এই রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক চেতনা বৃদ্ধি করে, অপরদিকে পারস্পরিক দূরত্ব অনেক কমিয়ে দেয়। প্রায় প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীই খুব কাছাকাছি চলে আসে। এখানেও এসেছিল। নবম শ্রেণির একটি ছাত্রী অনুষ্ঠান শেষে তার একটি খাতা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'স্যার, আপনার টেলিফোন নম্বরটা লিখে দেবেন?' লিখে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম — 'তোর নম্বরটা তাহলে দে'। সে বলেছিল — 'আমাদের বাড়িতে এখনও ফোন আসে নি। ফোন পাওয়া গেলে জানাব।' মাসখানেক বাদে সম্ভবত ২০০১ সালের ১৭ জানুয়ারি। প্রতিদিনের মতো ভোর চারটেয় উঠে লেখালেখি করছি। এমন সময় টেলিফোন বেজে ওঠে। এত ভোর অর্থাৎ ৪ টের সময় টেলিফোন বেজে ওঠায় ভয় হয়। কোথাও কারও বিপদ আপদ হল না কি? সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তুলে বলি, 'হ্যাঁ বলুন'। ওপার থেকে ভেসে আসে একটি কিশোরীর কণ্ঠস্বর — 'কে? স্যার? আমি পাটিত হাইস্কুলের ছাত্রী সানন্দা মণ্ডল বলছি। মনে করতে পারছেন?' 'হ্যাঁ বল, এতো রাত্রে?' বলতেই সানন্দা বলে — 'আমাদের স্কুলে এসে আপনি স্যার, বলেছিলেন প্রতিদিন ভোর চারটেয় উঠে পড়েন — লেখেন। তাই ফোন করে দেখলাম আপনি উঠেছেন কিনা?' তার দৃঢ় মনোবল এবং প্রতিটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার কৌতূহল দেখে আমি মুগ্ধ হই। পরক্ষণেই জিজ্ঞেস করি — 'তোর কী মনে হল?' এই প্রশ্নের উত্তরে সে নির্দ্বিধায় বলে — 'আপনি উঠেছেন, কেননা একটি রিং বাজতেই তো আপনি টেলিফোনের রিসিভার তুলেছেন, ঘুমালে হয়তো অনেক রিং বাজার পরে আপনি উঠতেন বা কেউ তুলে দিতেন।' মেয়েটির বুদ্ধিমত্তায় বিস্মিত হই। আবার বলি, 'তুই তাহলে কী করবি?' সে বলে, 'আমি আজ থেকেই পড়ব।' সানন্দা সেদিন থেকেই নিয়মিত ভোর চারটেয় উঠে পড়তে বসত। আমিও সময়ে সুযোগে টেলিফোনে খোঁজ নিতাম। অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় সে পেয়েছিল ৬৫ শতাংশ নম্বর। মাত্র একবছর দু তিন মাসের প্রচেষ্টায় ২০০২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় তার নম্বর হল ৭১৩ অর্থাৎ প্রায় ৯০ শতাংশ। সানন্দার বাবা মা অত্যন্ত খুশি হয়ে আমার বাড়িতে এসে হাজির। বলেন, 'আপনার প্রেরণায় আজ আমার মেয়ের এই উন্নতি। সানন্দা শুধু আমাদের মেয়ে নয়, আপনারও মেয়ে। আপনি ওর উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব নিন।' 'আমি থাকি আরামবাগ শহরে, আপনারা থাকেন আমার বাড়ি থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে। আমি কীভাবে সেই দায়িত্ব নেব?' একথা বললেও তার বাবা মায়ের অনুরোধে আরামবাগ গার্লস হাই স্কুলে তাকে ভর্তি করে দিই। নিজে বিশেষভাবে নজর রাখি। হোস্টেলে থাকে। পরে একসময়

বলে — 'হোস্টেলে থেকে সায়েন্স নিয়ে পড়ার অনেক অসুবিধা হচ্ছে'। আমিও বক্তব্যের বাস্তবতা উপলব্ধি করে আমার বাড়িতে এনে রাখি। আমার শিশুপুত্র অভিনন্দন এবং মেয়ে সংহিতার সঙ্গে সানন্দা মেয়ের মতোই থেকে একসঙ্গে লেখাপড়া করে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এখন সে তার প্রিয় বিষয় কেমিস্ট্রি নিয়ে বর্ধমান উইমেন্স কলেজে পড়ছে। লক্ষ্য তার গবেষণা করা।

ইন্দাস থানার শাসপুর ডি. এন. এস. ইনস্টিটিউশনের কৃতী ছাত্র সৌরভ অধিকারীর কথা এই সুযোগে বলতেই হয়। সৌরভ যখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র তখন থেকেই ওদের স্কুলে ছিল আমার যাতায়াত। কখনো গিয়েছি বিভাগীয় প্রতিনিধি হিসেবে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভায় যোগ দিতে, কখনো বা পরিদর্শন করতে। ওদেরও একগুচ্ছ ছেলেমেয়েকে পারস্পরিক বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে পাঠ আয়ত্ত করতে দেখেছি। নন্দন রুদ্র, সৌরভ অধিকারী, কৌশিক রায় খুব প্রাণচঞ্চল ছিল। ওদের স্কুলে গেলেই ওরা ক্লাসে যাবার জন্য খুব অনুরোধ করত। আমিও 'না' বলতে পারতাম না। জীবনে সাফল্য লাভের নানান পথ ওদের দেখিয়েছি, কৃতী পরিশ্রমী ছাত্রছাত্রীর সফল হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছি। ওরাও আগ্রহের সঙ্গে হজম করেছে। ২০০২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সৌরভ ৭৪৭ নম্বর পেয়েও 'কৃতী দশ'-এর মধ্যে আসতে পারে নি। খুবই দুঃখ পেয়েছিল। ওর মার্কসিট হাতে নিয়ে বলেছিলাম–এইবছর রাজ্যে যে প্রথম হয়েছে সেই সৌভাগ্য বিশ্বাসের থেকে তোর নম্বর কোনো অংশে কম নেই। তুই গণিতে পেয়েছিস ১০০ এর মধ্যে ১০০, ভৌত বিজ্ঞানে ৯৯, ইংরেজিতে ৮৬ নম্বর। নাই বা 'দশ'-এর মধ্যে স্থান হল; ওদের সঙ্গে পাঞ্জা কষার মতো যোগ্যতা তোর আছে। একটু চেষ্টা কর। হতাশা নয়, এগিয়ে চলাই জীবন, এগিয়ে চলাই সাফল্যের উৎস। মাত্র একবছর ন-মাসের প্রচেষ্টাতেই সৌরভ ২০০৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে পঞ্চম স্থান দখল করেছে। মাধ্যমিকে যার স্থান 'কৃতী দশ'-এর মধ্যে থাকেনি উচ্চ মাধ্যমিকে তার পঞ্চম স্থান অর্জন বিরল ঘটনা।

সৌরভের বাবার পারিবারিক আয় ছিল দিনে বড়ো জোর ৩৫ থেকে ৪০ টাকা। অত্যন্ত নিম্ন আয়সম্পন্ন পরিবারের সৌরভ নিজের উদ্যোগে, মনের জোরে, বড়োদের প্রেরণায় ও নিজের অধ্যবসায়ে আজ প্রকৃতই সফল। ছোটোবেলা থেকেই সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার লক্ষ্যে অবিচল সৌরভ বর্তমানে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে এম. বি. বি. এস. পড়ছে। তার পড়ার খরচ চালাতে এগিয়ে এসেছে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং বিদগ্ধ মানুষ। সৌরভের 'সৌরভ' চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক — এ কামনা আজ সকলের।

বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকারও যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে বা তার মাধ্যমেও যে খুবই সাধারণ ছেলেমেয়ে নিজের অজান্তে খুবই অসাধারণ হয়ে ওঠে তা প্রমাণ করেছে কোতুলপুর থানার কোতুলপুর সরোজবাসিনী গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী তনুপা মাসান্ত। পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সে এই স্কুলেই পড়েছে। দীর্ঘ চার বছরে সে একদিনের জন্যও স্কুল আসা বন্ধ করেনি। তার এই নজিরবিহীন উপস্থিতির জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেমন তাকে

বারবার পুরস্কৃত করেছেন আমিও ব্যক্তিগতভাবে তাকে উৎসাহ দেবার জন্য এবং প্রচেষ্টার স্বীকৃতি দেবার জন্য পুরস্কৃত করেছি। ১৯৯৯ সাল থেকে ওদের স্কুলে আমার যাতায়াত। নবম-দশম শ্রেণি পড়েছে ওই একই থানার মির্জাপুর হাইস্কুলে। ওই স্কুলেও সে পরপর দু বছর প্রতিদিনই উপস্থিত ছিল। শৈশব থেকেই তনুপার জীবনের লক্ষ্য প্রাথমিক শিক্ষক হওয়া। সে অনুভব করেছিল একটি মানুষের জীবনের ভিত প্রাথমিক শিক্ষকের হাতেই গঠিত হয়। মানুষ গড়ার কারিগর হওয়ার স্বপ্নে বিভোর তনুপা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পিছনের সারিতে থাকলেও নিজের প্রচেষ্টায় ২০০২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সুযোগ গ্রহণ না করে বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার ছান্দার বেসিক ট্রেনিং কলেজে প্রশিক্ষণরত। সাধারণ বিভাগের ছাত্রীদের জন্য ২০০৫ সালের নির্বাচিত তালিকায় তনুপার স্থান প্রথম। অত্যন্ত সাধারণ মাপের সেদিনের সেই মেয়েটি আজ তার স্বপ্নপূরণের পথে।

সোনামুখী গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী সুচেতা গঙ্গোপাধ্যায় তখন নবম শ্রেণিতে পড়ত। ১৯-৮-৯৯ তারিখে ওদের বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সুচেতার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলাম — 'সুচেতা, তোকে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হিসেবে দেখতে চাই'। ওইদিন পর্যন্ত যার জীবনের লক্ষ্য ছিল ডাক্তার হওয়া, জানি না, এই কথাটি ওর মনে সেদিন কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত গানের চর্চা চালাতে থাকে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত ভাবে চিঠি দিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগও রাখে। ২০০০ সালের অক্টোবর মাসের ১০ তারিখে সুচেতার একটি চিঠি পাই। তার কিছু অংশ — 'আমার কোনো দাদা নেই। আপনি আমার দাদা হবেন? না না, দাদাকে কেউ আপনি বলে না।' পরের অংশে দেখি — 'দাদা আগামী ২৯ অক্টোবর ভাইফোঁটার দিনে তুমি আমাদের বাড়িতে এসো। ভাইফোঁটা দেবো। ওই দিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। হ্যাঁ, তারও আগে একটি কথা শোনো—আগামী ১৮ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় কলকাতা ক-কেন্দ্রে আমার গান আছে। শুনবে, কেমন হয়েছে জানাবে। আশা করি, তুমি খুশি হবে।'

২০০১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং ২০০৩ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ভালো ভালো কলেজে পড়ার সুযোগ ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে কলকাতার সংগীত রিসার্চ আকাদেমিতে আবাসিক ছাত্রী হিসাবে রিসার্চ করছে। বর্তমানে সুচেতা প্রকৃতই একজন উচ্চমার্গের উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী।

সেদিনের সেই কিশোরমনের প্রতিক্রিয়ার কথা আজও ভেবে বিস্মিত হই। সোনামুখী গেলেই ওদের বাড়িতে একবার যেতেই হয়। সত্যিই সে যে আজ আমার ছোট্ট বোন!

ইন্দাস থানার গুরুধাম শান্তাশ্রম ব্রহ্মানন্দ বিদ্যাভবনের আর এক ছাত্রীকেও কথা রাখতে দেখেছি। ৩-২-২০০০ তারিখের পরিদর্শনের দিনের ঘটনা। শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন কালে অন্যান্য শ্রেণিগুলোর সাথে একাদশ শ্রেণিতে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেছিলাম। কেননা, ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষেই ওই বিদ্যালয়ে প্রথম উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে। শেষ

পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে যখন চলে আসছি তখন অনেকের সাথে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে বলে — 'স্যার, আপনি তো বললেন শিক্ষার স্বার্থে প্রত্যেকের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে এসেছেন, আমিও হাত বাড়িয়ে দিলাম।' আমি কোনো রকম ইতস্তত না করে হাতে হাত মিলিয়ে বলি — 'কী নাম?' তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, 'প্রগতি দে, আমি একাদশ শ্রেণি কলা বিভাগের ছাত্রী। এতক্ষণ তো অনুষ্ঠান পরিচালনা করলাম, কেমন হয়েছে?' আমিও উত্তর দিই, 'সুন্দর'। আবার বলি, 'প্রকৃষ্ট গতি যার সেই তো প্রগতি। গতি অব্যাহত রাখতে হবে।' সংকোচ না করেই উত্তর দেয়, 'অবশ্যই চেষ্টা করবো।'

২০০১ সালে সাফল্যের সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে বাংলা অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. (বাংলা) শেষ বর্ষের ছাত্রী। সেদিন জানতে চেয়েছিলাম তার জীবনের লক্ষ্য কী? প্রগতি বলেছিল —আপাতত গতি অব্যাহত রাখা এবং ভবিষ্যতে অধ্যাপিকা হওয়া।

অত্যন্ত দরিদ্র কৃষক পরিবারের মেয়েটি পারিবারিক চাপে নার্সিং ট্রেনিং-এর জন্য আবেদন করে সুযোগ পেয়েও যায় নি। সে বলেছে, 'আমার যে গতি অব্যাহত রাখার কথা আমাদের পরিদর্শক মশাই বলেছেন, আমি গতি অব্যাহত রেখে দেখাতে চাই।' আমরাও আশাবাদী।

আমার এই নতুন পদ্ধতির বিদ্যালয় পরিদর্শন এইভাবে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে প্রভাবিত করেছে। মহকুমার ১২৪টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি থেকে কম করে ১০/১৫ জন করে এখনই এই রকম ছাত্রছাত্রীর নাম বলে দিতে পারব যারা পরামর্শমতো নিজেদের তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এরা সবাই 'লেখাপড়া' করতে এসেছে 'পড়াশোনা' নয়। এদের কেউ কেউ টিউশন পড়লেও বিদ্যালয়ের বিকল্প হিসেবে প্রাইভেট টিউশনকে ব্যবহার করেনি। ব্যবহার করেছে বিদ্যালয় শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে। এছাড়াও প্রতিদিনের পড়া এবং লিখিত হোমটাস্ক প্রতিদিন নিয়ম মেনে করেছে। প্রতিটি শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা এ বিষয়ে একটু গুরুত্ব দিলে প্রতি বিদ্যালয় থেকে অসংখ্য অরিন্দম সাঁতরা পাওয়া যাবে না ঠিকই, তবে আফজল মিদ্যা, সাহেদা আফরিন, সৌরভ অধিকারী, সানন্দা মণ্ডল পাওয়া যাবেই।



আশিসবরণ সামন্তের জন্ম হুগলি জেলার কামারপুকুরের অনতিদূরে লস্করপুকুর গ্রামে। দীর্ঘদিন শিক্ষকতার সঙ্গো যুক্ত থাকার পর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গা সরকারের শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিক। ঘর-সংসারের সঙ্গো কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আড্ডা দেওয়া তাঁর নেশা। দীর্ঘদিন ধরেই নিয়মিত প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া, উপন্যাস, গল্প লিখে চলেছেন। ভালোবাসেন বই পড়তে। তাঁর লেখা শিক্ষা বিষয়ক সমীক্ষা ও গবেষণাধর্মী বেশ কিছু রচনা পাঠক মহলে তথা শিক্ষা বিভাগে যথেষ্ট উচ্চ-প্রশংসিত হওয়ায় তিনি এখন অনেক বেশি উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত।

ISBN : 81-7572-199-9